# প্রসঙ্গ শিক্ষা এবং সাহিত্য

সুব্রত কুমার দাস

# প্রসঙ্গ
# শিক্ষা এবং সাহিত্য

www.pathagar.com

# প্রসঙ্গ
# শিক্ষা এবং সাহিত্য

সুব্রত কুমার দাস

সূচীপত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক ➡ সাঈদ বারী
*প্রধান নির্বাহী,* সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৩৮৭১, ৮১১০৬৮০

প্রসঙ্গ : শিক্ষা এবং সাহিত্য
সুব্রত কুমার দাস

স্বত্ব ➡ লেখক
প্রথম প্রকাশ ➡ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
প্রচ্ছদ ➡ মাসুদ কবির
মুদ্রণ ➡ সালমানী প্রিন্টিং প্রেস নয়াবাজার ঢাকা
বর্ণবিন্যাস ➡ মাইক্রোটেক কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক ➡ মুক্তধারা
জাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ➡ সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Prosongo : Shiksha ebong Sahityo
By Subrata Kumar Das

Published by Saeed Bari. *Chief Executive,* Sucheepatra
38/2ka Banglabazar Dhaka 1100 Bangladesh
Phone : 7113871, 8110680
e-mail : saeedbari@dhaka.net
Price : BDT. 125.00 Only US $ 05.00

মূল্য ➡ ৳ ১২৫.০০ মাত্র

ISBN ➡ 984-8557-40-7

www.pathagar.com

উ|ৎ|স|র্গ

রুবী চৌধুরী

এবং

কাজী ফিরোজ

প্রিয়তম দু'জনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিবেদন

শিক্ষা এবং সাহিত্য উভয়েই আমার জীবিকা এবং জীবনদর্শনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রসঙ্গ দু'টি সম্পর্কিত উচ্চকিত ও অভিনব ভাবনা থেকেই বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর সৃষ্টি।

শিক্ষা বিষয়ক রচনাগুলোতে ইংরেজি শিক্ষার সংশ্লেষ খুব বেশি করে লক্ষিত: কেননা ইংরেজি শিক্ষার অনুষঙ্গটি আমাকে অধিকতর উৎসুক এবং আগ্রহী করে। তবে 'ইংরেজি শিক্ষা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে পদ্ধতি প্রসঙ্গ' এবং ' একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন ইংরেজি বই' প্রবন্ধ দু'টি পাঠকালে সমকালীন প্রেক্ষাপট স্মতর্ব্য। অন্যদিকে সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে বলা যায়: সাহিত্য বিষয়ক আমার যে রচনাগুলোতে কাজী নজরুল ইসলাম,যাদুবাস্তবতা এবং বাংলাদেশের উপন্যাস প্রাসঙ্গিক নয় সেগুলোকেই সন্নদ্ধ করা হয়েছে এখানে।

শিক্ষা এবং সাহিত্য প্রসঙ্গের সংযোগ ঘটলেই আকারগত প্রশ্নে প্রবন্ধগুলো গ্রন্থরূপ পেতে পারে মনে হতেই বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা।

অধিকাংশ প্রবন্ধের চূড়ান্ত বা প্রথম খসড়া পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য তাঁরা হলেন দৈনিক *সংবাদ*-এর প্রাক্তন সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত (বর্তমানে মাসিক *কালি ও কলম*-এর সম্পাদক); মাসিক *শিক্ষাবার্তা*-র সম্পাদক আফরোজান নাহার রাশেদা এবং বাংলা একাডেমীর সহকারী পরিচালক লেখক-বন্ধু জালাল আহমেদ। আমার কর্মস্থল বাংলাদেশ রাইফেল্‌স কলেজের বাংলা বিভাগের সুপ্রিয় দুই সহকর্মী আব্দুল আউয়াল মুছুল্লী এবং কে এম আকমল হোসেনের পরামর্শ বিভিন্ন সময়ে আমাকে উৎসাহিত ও ঋদ্ধ করেছে।

সূচীপত্রের নির্বাহী পরিচালক জনাব সাঈদ বারী গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আর সবশেষ যাঁর ঋণ গ্রহণই আমার দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের শর্ত তিনি নীলিমা দত্ত। লেখালেখির শুরু থেকে বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের শেষ পর্যায় পর্যন্ত, এমনকি বাংলাবাজারেও, বৌদ্ধিক সহযোগিতা এবং মানসিক সহপ্রীতি দিয়ে তিনিই আমাকে উজ্জীবিত রেখেছেন।

সুব্রত কুমার দাস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ | চী

**বিষয় : শিক্ষা**


১১ বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে মাতৃভাষা ও ইংরেজি প্রসঙ্গ
১৯ ইংরেজি শিক্ষা : রবীন্দ্র পদ্ধতি
২৭ শিক্ষক জীবনানন্দ দাশের শিক্ষাচিন্তা
৩৬ ইংরেজি শিক্ষা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে পদ্ধতি প্রসঙ্গ
৪৮ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন ইংরেজি বই
৫২ শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ


**বিষয় : সাহিত্য**


৫৬ সতীনাথ ভাদুড়ী ও *জাগরী*
৬০ বিস্মৃত কথাকার সাবিত্রী রায়
৮২ মিরজা আবদুল হাই ও *যমনিশ সংবাদ*
৮৬ উপন্যাসের কথক প্রসঙ্গ : *কাঁদো নদী কাঁদো* এবং *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*
১০৬ লোকনাথ ভট্টাচার্য ও তাঁর উপন্যাস
১১০ সুলেখা সান্যালের কথাসাহিত্য
১২২ আহমদ ছফার *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী*
১২৬ *জার্নি টু দি ইস্ট* : একটি বাংলাদেশী ইংরেজি উপন্যাস
১২৯ আমাদের সাহিত্যের ইংরেজি উপস্থাপন
১৩৩ *বাংলা সাহিত্যকোষ* : একটি পর্যালোচনা
১৩৭ ইন্টারনেট ও আমাদের সাহিত্যের দুরবস্থা


www.pathagar.com

www.pathagar.com

# বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষা কার্যক্রমে মাতৃভাষা ও ইংরেজি প্রসঙ্গ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) আধুনিক বাঙালির ইতিহাসে এক প্রাতঃস্মরণীয় নাম। সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি সমাজকে আধুনিক চেতনায় ঋদ্ধ করতে এই সংস্কৃত পণ্ডিত আমৃত্যু বিদ্রোহীসুলভ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। সমাজ সংস্কারমূলক তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ড ও বাংলা ভাষা সংস্কারে তাঁর বিপ্লবী পদক্ষেপ ব্যতিরেকেও বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র শিক্ষাবিষয়ক তাঁর সম্পৃক্তির জন্যও প্রণম্য এক ব্যক্তিত্ব। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে নিজের শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর থেকে দীর্ঘকাল তিনি শিক্ষকতা করেছেন, যেখানে শিক্ষার্থীর মঙ্গল প্রশ্নটি ছিল সর্বদা সমিদ্ধ। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক কল্যাণে তাঁর নিরত প্রচেষ্টা বাঙালিকে দৃপ্ত এক ভষ্যিতের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। শিক্ষাকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে বাংলা ভাষায় বিপুলসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক রচনা তাঁর এক বিরাট অবদান। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। যেমনভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার জন্মের আগেই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা বাংলাভাষী অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা বিকাশে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলেও তা ছিল শুধুমাত্র কোম্পানির সিভিলিয়ান কর্মচারীদের জন্য।[১] পরবর্তীতে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ পাশ্চাত্য শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় আর এক যুগান্তকারী ঘচনা। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা সংস্কৃত কলেজ, যেখানে নয় বছরের ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ভর্তি হয়েছিলেন ১৮২৯-এর ১ জুন। ১২ বছর ৫ মাস শিক্ষা শেষে উপাধি পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ইতোমধ্যে বাঙালি সমাজ ও শিক্ষা কার্যক্রমে ধ্বনিত হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) ন্যায্য দাবি, যে দাবির উত্তর-উচ্চারণকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৪১-এর ২৯ ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিত হিসেবে। ১৯৪৬-এর ৬ এপ্রিল তিনি যোগ দেন সংস্কৃত কলেজে। এই কলেজের শিক্ষা সংস্কার নিয়েই সম্পাদক রসময় দত্তের সাথে তাঁর মতভিন্নতা হয়, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৮৪৭-এর ১৬ জুলাই বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। ১৮৫০-এ বিদ্যাসাগর পুনরায় সংস্কৃত কলেজে ফিরে আসেন এবং স্বল্প পরেই সেখানকার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ওপর মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৮৫৫-৫৬ সময়ে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলি ও



www.pathagar.com

মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যাসাগর মোট ২০টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোমধ্যে উডের শিক্ষা পত্রে (১৮৫৩) ভারতবর্ষে 'স্ত্রী-শিক্ষা'র বিস্তারে সমর্থন মিললে জে. হ্যালিডে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যাসাগরকে আহ্বান জানান। ১৮৫৭-৫৮ সালের মোট ৬ মাস সময়ে বিদ্যাসাগর হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[২] ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ পরিত্যাগ করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল (১৮৫৯-এর প্রতিষ্ঠিত)-এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষা কার্যক্রম আলোচনার পূর্বে তাঁর শিক্ষক জীবনের উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত হিসাবটি প্রাসঙ্গিক হবে।

শিক্ষাসংস্কার কর্মকাণ্ডে বিদ্যাসাগর ছিলেন নিবেদিত প্রাণ এবং অকুতোভয়। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনকে শিরোধার্য করাই ছিল তাঁর প্রধানতম লক্ষ্য। যে লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা কোনোদিন তাঁর জীবনে গুরুত্ব পায় নি। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁর পদত্যাগের পেছনে যে কারণগুলো ছিল তার মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাত্রদের সুবিধা বিবেচনা না করাও অন্যতম একটি। ৩ মে, ১৮৪৭-এ তিনি কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তকে যে পদত্যাগপত্র দিয়েছিলেন তাতে এমন যে একটি বিষয় রয়েছে তা হলো–

> I allude to the privilege assumed by the Principal of the Hindu College to take occasionally a portion of the stools and desks of the Sanscrit College for the accommodation of his own students at particular examination for 3 or 4 days together. Some of our students are obliged to sit on the ground and it must be remembered the rooms are not matted. This irregularity has been frequently reported to you and although you have frequently promised to take efficient steps for putting a stop to such unjust interfernce, yet you do not appear to have taken any such either because you approve of such conduct or because you are not impressed with the inconvenience and unseemliness of our half of a class sitting on the bare ground whilst the other half sit on stools. Such a disregard of the comfort of the students and of the rights of the institution is to me highly distasteful.[৩]

চিঠিটি পড়লে স্পষ্ট হয় যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টিকে তিনি কতো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন।

'ছাত্র অন্তঃপ্রাণ'–এ শিক্ষাচিন্তক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলাকে যেভাবে যুগোপযোগী এবং ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তা যে কোনো গবেষকের



www.pathagar.com

জন্য বিস্ময়ের। তাঁর কর্মস্থল সংস্কার কলেজে হিন্দুধর্ম, সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রচলিত রীতিনীতি কঠোরভাবে পালিত হতো। পূর্বে যেখানে অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথি ছিল–অনধ্যায় দিবস, বিদ্যাসাগর সেখানে রোববারকে ছুটির দিন ধার্য করেন।[৪] সংস্কৃত কলেজে উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্যতীত প্রবেশাধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগর প্রথম কায়স্তদের সে প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীতে তা সকল জাতির জন্যই উন্মুক্ত হয়।[৫] হিন্দু ধর্মাদর্শে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রদের উপস্থিতি পূর্বে ছিল ছাত্রের ইচ্ছাধীন। সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের উপস্থিতি কখনই সন্তোষজনক হতো না। তিনি বুঝেছিলেন অর্থকে এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তাঁর পরিকল্পনা মতো ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সংস্কৃত কলেজে ছাত্রপ্রতি বেতন ধার্য শুরু হয়, যা প্রার্থিত ফল দিয়েছিল। দেশীয় শিক্ষক দ্বারা ইংরেজি শিক্ষা পরিচালনা অসম্ভব—এমনই ছিল সমসাময়িককালে ইংরেজদের ধারণা। বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (১৮৭২-এ মেট্রোপলিটন কলেজে পরিণত, যা বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) সম্পূর্ণ দেশিয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। প্রবল আপত্তির মুখেও বিদ্যাসাগর তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরেন নি। বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রদের আশানুরূপ ফলাফল বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে সার্থক প্রমাণিত করেছিল।

পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর ছিলেন দূরদর্শী। শিক্ষক জীবন শুরুর প্রথম থেকেই তিনি এ ব্যাপারে সরব ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর দুটি অভিমত হলো—সংস্কৃত শিক্ষাকে ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করা এবং বাঙালির শিক্ষায় সংস্কৃতর পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা। ১৮৪৭-এর পদত্যাগ পত্রেই তাঁর এ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। পাঠ-ব্যবস্থা ও পাঠক্রমকে পরিবর্তনের ব্যাপারে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ওই পত্রটিতেই পরিস্ফুটিত। ইংরেজিকে সকল ছাত্রের জন্য আবশ্যিক করাকেও তিনি বিশেষ প্রয়োজনের বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে রচিত শিক্ষা সংস্কারের প্রত্যক্ষ বিপোর্টগুলোতেও তাঁর এ সকল ভাবনার বিকাশ ঘটেছে। বিদ্যাসাগর রচিত এমন রিপোর্টগুলো হলো (১) সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০-এ Council of Education-এর Secretary F.J. Mouat কে পাঠানো রিপোর্ট; (২) ১৮৫২-র ১২ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে রচিত ২৬ অনুচ্ছেদের Notes on the Sanskrit College (এটি বিনয় ঘোষের *বিদ্যাসাগরও বাঙালি সমাজ*গ্রন্থে অনূদিত হয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে); (৩) বেনারস সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Ballantyne কর্তৃক সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের পর রিপোর্ট F.J.Mouat কর্তৃক সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হলে অধ্যক্ষ হিসেবে ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩তে বিদ্যাসাগর তার উত্তর দেন; পরবর্তীতে ৫ অক্টোবর তিনি এ বিষয়ে F.J. Mouat কে আরও একটি পত্র লেখেন, (৪) ফেডারিক হ্যালিডে বাংলাদেশের প্রথম ছোটলাট (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) হওয়ার দুমাস আগে Council of Education- এর সদস্য হিসেবে বাংলায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেন। হ্যালিডের অনুরোধে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪ তে বিদ্যাসাগর বাংলায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে ১৯ অনুচ্ছেদের



www.pathagar.com

এক Notes on Vernacular Education রচনা করেন (এটির বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সাহিত্য সাধক গ্রন্থমালা* ২য় খণ্ডে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভুক্তিতে গৃহীত হয়েছে); (৫) ১৮৫৭-এর জানুয়ারিতে মডেল স্কুলের কার্যক্রমের ওপর রচিত হয় 'Report for the Quarter Ending'।[৬] বিদ্যাসাগরের এ সকল মন্তব্য ও চিন্তায় সংস্কৃত শিক্ষাক্রমের পুনর্জাগরণ ছাড়াও ইংরেজি শিক্ষার আবশ্যিকতা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেহেতু কালের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি শিক্ষা-কাঠামোর পর্যালোচনা কম গুরুত্বপূর্ণ তাই সেটিকে বাদ দিয়ে বাকি দুটিকে বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইংরেজি শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আলোচনার আগে তাঁর জীবনের দুটি বিষয়কে বিদ্যাসাগর-মননের পটভূমির প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে। এ দুটি হলো (১) সংস্কৃত কলেজে পাঠকালীন সময়ে কলেজের ছাত্ররা যখন শিক্ষাবিভাগের সচিবের কাছে লিখিতভাবে ইংরেজি কোর্স চালুর আবেদন জানান তখন ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই সে আবেদনে সই করেন এবং (২) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন সময়ে নিজের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন ইংরেজি শিখতে, যাদের মধ্যে নিজ ছাত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ও ছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত হয়েও পাশ্চাত্য জ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তাঁর দেরি হয় নি। F.J. Mouat কে পাঠানো সংস্কৃতি কলেজের রিপোর্টে (১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০)[৭] এ বিষয়টি পূর্ণ যুক্তিতে উপস্থাপিত।

বিদ্যাসাগর যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ছাত্ররা যদি ইংরেজি জ্ঞানের সাথে পরিচিত হয় তাহলেই ইউরোপের আধুনিক দর্শনের সাথে পরিচিত হতে পারবে এবং সক্ষম হবে ভারতীয় দর্শনের তুলনা করতে। তাঁর মতে 'Thus he (ছাত্র)will be able to judge for himself. His knowledge of European philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems'। এই রিপোর্টেই তিনি সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর ক্লাসকে সমন্বিত করে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দেন। যদিও তিনি লিখেছেন, 'The study of English instead of being optional be compulsory' তবুও কিন্তু আগ্রহী (any one unwilling to be taught in English) শিক্ষার্থীর জন্য তিনি ভিন্ন ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। আগ্রহী ছাত্রকে সফলভাবে ইংরেজি শেখানোর ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনা ছিল বিদেশি ভাষা শেখানোর ব্যাপারে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। তিনি বলেছিলেন, অলঙ্কার শ্রেণী থেকে যদি শিক্ষার্থী ইংরেজি পড়ে তবে প্রচলিত প্রদ্ধতির চেয়ে দ্বিগুণ সময় পাবে ইংরেজির ব্যাপারে; সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বাকি ৭/৮ বছরে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারবে (a deligent student will have ample opportunity of making himself familiar with English language and literature)।



www.pathagar.com

ইংরেজি শেখানোর গুরুত্ব নিয়ে তাঁর ভাবনা পরবর্তীতে রচিত তাঁর সকল রিপোর্টেও স্পষ্ট। 'Notes on the Sanscrit College' এ তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভের কথা আবারও উল্লেখ করেন। তিনি এও বলেন যে, যদি সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি শেখে তারা বাংলা সাহিত্যকে উন্নত করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে (they will prove the best and ablest coutributors to an enlightened Bengali Literature -অনুচ্ছেদ নং ৫)। তিনি এ অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, যদি তারা সংস্কৃত ভাষায় অঙ্ক না শিখে ইংরেজি ভাষায় শেখে তবে তারা তার অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে (অনুচ্ছেদ নং ১৩)। এছাড়াও সে রিপোর্টে তিনি ইংরেজি পাঠ্যক্রম, প্রয়োজনীয় ইংরেজি শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, ইংরেজি শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি বিষয়েও সমসাময়িক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মন্তব্য করেছেন। এভাবেই সুযোগ পেলেই শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ক প্রসঙ্গে ইংরেজির গুরুত্ব বিদ্যাসাগরের করোটিতে সর্বদা জাগ্রত থাকতো।[৮]

এবারে আসা যাক বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে। সংস্কৃত ভাষা চর্চার সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাকে তিনি সংমিশ্রিত করতে বলেছিলেন এবং এসবের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন। সে সাথে পাঠককে মাতৃভাষা বাংলায় উপস্থাপনও তাঁর কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। আর তাই 'Report on the Sanscrlt College'-এর 'Grammar Department' অংশে তিনি নির্দ্বিধচিত্তে বলেন, 'The boys instead of beginning the grammar at once in the Sanscrit language, should learn some of the most fundamental rules dressed in the easiest Bengali' বাংলা মাধ্যমের পাঠ্যপুস্তককে উপস্থাপনের বিষয়টি তিনি ওই Report-এর 'Jyotisha or Mathematical class' অংশে উপস্থাপন করেছেন। গণিতের উচ্চতর গ্রন্থ জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যেমন Herchel-এর বই প্রভৃতি তিনি বাংলায় অনুবাদের প্রস্তাব করেন এবং মন্তব্য করেন 'their appearance in Bengali will be of great use also in the Vernacular schools'। নিচু শ্রেণীগুলোতে বাংলায় রচিত পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের ব্যাপারটিও তাঁর প্রস্তাবে ছিল। সে Report-এ তিনি অভিমত দেন–

> Should the Council by pleased to introduce these Bengli books, the students of the Sanscrit College will, with little difficulty, acquire great proficiency in Bengali, and through the medium of the language, derive useful information, and thereby have their views expanded before they commence their English studies.

বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও এ–ভাষাতে পাঠদানের বিষয়ে এক ঐতিহাসিক দলিল এই 'Notes' এর ১ নম্বর অনুচ্ছেদই হলো : The creation of an enlighened



www.pathagar.com

Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintedent of Education in Bengal। বাংলা সাহিত্যকে এমন গুরুত্ব দিয়ে আর কোনো বক্তব্য সম্ভবত এর আগে নজরে পড়ে না। পরবর্তী সময়ে রচিত 'Notes on Vernacular Education' ও এমনই এক চিরন্তন ভাবনা দিয়ে শুরু : 'Vernacular education on an extensive scale, and on an efficient footing, is highly desirable, for it is by thus means alone that the condition of the mass people can be ameliorated'। সামগ্রিক বিবেচনার পরই তিনি অভিমত দেন শুধুমাত্র লিখন, পঠন, বা প্রাথমিক গণিতই নয় ভূগোল, ইতিহাস, জীবনী, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, 'Natural philosophy, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতিতেও বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। এই 'Notes' এ তিনি বিভিন্ন শ্রেণী-উপযোগী বাংলা পুস্তকেরও একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। তাছাড়া বাংলা স্কুলগুলো সুষ্ঠু পরিচালনা ও পরিবদর্শনের জন্য তাঁর কিছু মূল্যবান পরামর্শ ও এই 'Notes' এ পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা কার্যক্রমের আর একটি অন্যতম বিষয় হলো পাঠ্যপুস্তক রচনা। দীর্ঘ কর্মজীবনে এ বাঙালি শিক্ষাবিদ যে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক। বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তিনি আধুনিক বাঙালির শিক্ষার ইতিহাস ত্বরান্বিত করেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বিদ্যাসাগরকে মূল্যায়ন করেন এভাবে—

> বিদ্যাসাগর শিশুদের বর্ণবোধের কথা ভেবেছেন, বালকদের চরিত্র গঠনোপযোগী চরিতকাহিনীও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রচলন করেছেন, কিশোরদের চিত্তানুকূল আখ্যান রচনা করে নীরস শিক্ষাগ্রন্থেও সরসতা সঞ্চার করেছেন। বিশাল প্রতিভাধর এই মনস্বী বালক-বালিকাদের শিক্ষার কথা যতোটা গভীর, আন্তরিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে ভেবেছিলেন, বোধকরি সে যুগে সে বিষয়ে অতটা মনোযোগ দিয়ে আর কেউ চিন্তা করেননি। শিশু শিক্ষা নিয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন, পুস্তকও লিখেছিলেন। তবে তিনি ছিলেন বিদ্যাসগারের পার্শ্বচর এবং তাঁরই আলোকে আলোকিত। শতসহস্র কর্মকালজড়িত হয়েও বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে সদাসর্বদা অবহিত ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন শিশু শিক্ষার বুনিয়াদ সুদৃঢ় না হলে কোনো জাতিই মননের ক্ষেত্রে সাবালকত্ব অর্জন করতে পারে না।[৯]

বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় তাঁর দীর্ঘ এ কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে *জীবনচরিত* দিয়ে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি রবার্ট ও উইলিয়াম চেম্বার প্রণীত Exemplary Biography গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষীর অনূদিত জীবনকথা। 'বাঙালা ভাষায় অনুবাদিত হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থীগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে'[১০]—এই আশায় বিদ্যাসাগর গ্রন্থটি রচনায় প্রবৃত্ত হন। এরপর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *বোধোদয়* যা মদনমোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য রচিত *শিশু শিক্ষা* ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগের ধারাবাহিকতায় *শিশু শিক্ষা* ৪র্থ ভাগ নামে প্রথমে প্রকাশিত হয়। এটিও চেম্বার্সের *Rudiments of Knowledge*



www.pathagar.com

অবলম্বনে রচিত। এরপর বিদ্যাসাগর কর্তৃক ১৯৫৫-এর এপ্রিল ও জুনে প্রকাশিত *বর্ণপরিচয়* ১ম ও ২য় ভাগ বয়সোপযোগী প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থ রচনায় যুগান্তকারী নিদর্শন। পরের বছর প্রকাশিত হয় *চরিত্রাবলি* ও *কথামালা*। এ দুটিসহ পরবর্তীতে প্রকাশিত তিন খণ্ড *আখ্যানমঞ্জরী* শিশু-কিশোর শিক্ষা সম্বন্ধীয়। তাই সমালোচকের মূল্যায়ন :

> জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে তার 'বর্ণপরিচয়'-এর সঙ্গে শিশুর প্রথম পরিচয় হয়, তারপর সাধারণ জ্ঞানবর্ধনের জন্য, 'বোধেদয়' এবং তারপর 'কথামালা', 'চরিত্রাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে শিশু বালক হয়, বালক কিশোর হয়। তখন সে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' পড়তে আরম্ভ করে। ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তার মনেরও প্রসার হয়, কিছু কিছু সাহিত্যরসের স্বাদ-গন্ধও তার ভাগ্যে জোটে। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিছক সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বড়ো একটা উৎসাহবোধ করেন নি, লোকশিক্ষা প্রচারই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সেই জন্য ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের নীতিমূলক গল্পকাহিনীকে অবলম্বন করে, কোথাও-বা পুরোপুরি অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে তিনি ছাত্রপাঠ্য রচনার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।[১১]

একথা সকলের জানা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনের প্রথমার্ধে শিক্ষা সংস্কারে নিয়োজিত ছিলেন, যেমনভাবে শেষার্ধে সমাজ সংস্কারে তাঁর মনযোগ বেশি নিবিষ্ট হয়। শিক্ষা সংস্কার কর্মকাণ্ডে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী-কিশোর বিস্তার, পাঠ্যক্রম যুগযোপযোগী করা, বাংলাভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রভৃতি তাঁর প্রধানতম অবদান। মাতৃভাষায় বাঙালি শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনকে সহজলভ্য ও কার্যকরী করতে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কাজ শুরু করে দীর্ঘ বিশ বছরের বেশি সময় তিনি তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করেন', যা প্রায় দেড়শ বছর পরেও নবীন পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করে, গবেষকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. ড. অতুল সুর, *শিক্ষাপীঠ কলকাতা, কলকাতা, ১৯৮৯*, পৃ. ২৩
২. নমিতা চক্রবর্তী তার *বঙ্গদেশে শিক্ষা প্রসার* (কলকাতা, ১৯৮০) গ্রন্থে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত এ সকল বিদ্যালয়ের বিস্তারিত তালিকা দিয়েছেন (পৃ. ৩২৩-৪)
৩. বিদ্যাসাগর রচিত সে পদত্যাগপত্রটি *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা* (প্রথম খণ্ড : প্রথম ভাগ, সংকলন ও সম্পাদনা : প্রবীর মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
৪. নমিতা চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, ৩১৪
৫. এ বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণী আলোচনা রয়েছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় ওয়েসলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Brian A Hatcher রচিত *Idioms of Improvement : Vidvasager and Culural Encounter in Bengal* (Oxford University Press. Calcutta. 1996) গ্রন্থের ওপর আবদুল হালিমকৃত আলোচনায়। আলোচনাটি মীজানুর রহমান সম্পাদিত *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার* বিদ্যাসাগর সংখ্যায় (এপ্রিল-মে-জুন ১৯৯৭) প্রকাশিত হয়েছে
৬. *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা* (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯) গ্রন্থে সংকলিত
৭. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন 'সে রিপোর্টের ফলে সংস্কৃত পাঠশালা কলেজ হইয়া যায়। তাহাতে কথা থাকে তিন ভাগের দুই ভাগ সংস্কৃত ও এক ভাগ ইংরেজি পড়িবে।' ব্রজেন্দ্রনাথ



www.pathagar.com

বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ* (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এ কথা বলেন। দ্রষ্টব্য *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ* (৪র্থ খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯

৮. ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর স্মরণার্থ সভার সাংবাৎসরিক অধিবেশনে বিদ্যাসাগরের ইংরেজি শিক্ষা কার্যক্রমকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়ে দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। বাঙালির নিজের প্রচেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এ প্রথম। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাধীনতভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।

যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন, যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না তিনিই ইংরেজি বিদ্যাকে প্রকৃতভাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন ('বিদ্যাসাগর চরিত' *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ২য় খণ্ড, জয় বুক ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা, ১৪০৬, পৃ. ৭৭৭)

৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর,* কলকাতা, দেজ সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৭, পৃ. ৮৬

১০. *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (সম্পা. তীর্থপতি দত্ত), দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪, পৃ. ১৩৬৭

১১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

দৈনিক *সংবাদ* সাময়িকীতে ১ মে ২০০৩-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# ইংরেজি শিক্ষা : রবীন্দ্র পদ্ধতি

যদিও নীতিগত প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বারো বছরের আগে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না, তবুও তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ ছয় বছর বয়স থেকেই ইংরেজি বাধ্যতামূলক প্রবর্তনে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।[১] জীবনের বিভিন্ন সময়ে ইংরেজি শিক্ষাকে সমালোচনা করে তিনি মন্তব্য-আলোচনা করে থাকলেও ইংরেজি পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে অভিনব কৌশলেরও উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। যেমনভাবে বাংলা বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা নিয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন, ইংরেজি শিক্ষা নিয়েও তাঁর রচনার পরিমাণ একেবারে নগণ্য নয়।

আমরা জানি, অন্যান্য সকল পরিচয়ের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিক্ষাচিন্তাবিদ' পরিচয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বের। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, শিক্ষা-সংগঠক এবং শিক্ষা-দার্শনিক। প্রতিষ্ঠা করেছেন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা নিয়ে তাঁর রচনার পরিমাণও কম নয়। এমনকি ভেবেছেন ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্তভাবে শেখানোর পদ্ধতি নিয়েও। ইংরেজি শেখানোর প্রচলিত আনন্দহীন পদ্ধতিকে অস্বীকার করে উদ্ভাবন করেছেন এমন উপায় যা শিক্ষার্থীকে সহজ ও ফলপ্রসূ উপায়ে ইংরেজি শেখাতে সাহায্য করে। নিজে শিক্ষক হিসেবে যেমন সেসব পদ্ধতি তিনি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করতেন বলে তার ছাত্র-ছাত্রী এবং সমসাময়িক অন্যান্যদের ভাষ্য থেকে জানা যায় তেমনি ইংরেজি নিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেও তিনি এ বিষয়ে তাঁর গভীর মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

শিক্ষা বিষয়ক মূলগ্রন্থ *শিক্ষা* ছাড়াও *শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বিশ্বভারতী, রাশিয়ার চিঠি*সহ অন্যান্য আরও গ্রন্থ ও পত্রাদিতে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ক অর্থাৎ শিক্ষাদর্শন এর উদ্দেশ্য, সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত সব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি যেমন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেন নি, তেমনি শিক্ষাগ্রহণে মাতৃভাষাকে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতেও ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে বলেন, "ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনো প্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস ও বিষয় প্রসঙ্গও বিদেশি। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না তাকাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়"[২]। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এ ভাবনা পরিবর্তিত ও শানিত হয়ে সারাজীবন ধরেই



www.pathagar.com

রবীন্দ্র মস্তিষ্কে ক্রিয়াশীল ছিল। আর তাই ১৯৩৬-এ 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' ভাষণে তিনি ইংরেজির কারণে শিক্ষার্থীর দুর্গতিতে মর্মপীড়িত কণ্ঠে বলেন "গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলেই গোটা ইংরেজি বই মুখস্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না।"[৩] অর্থাৎ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় যা আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই ইংরেজি শেখা ও শেখানোর পদ্ধতির ব্যর্থতা ও অর্থহীনতা তার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তারপর নিজে শিক্ষক হয়ে এবং আরো পরে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীর কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে তাঁর এ অভিজ্ঞতা ক্রমাগতই দৃঢ় ও শানিত হয়েছে। আর এ সব কারণেই হয়তো ইংরেজি শেখানো নিয়ে তাঁর নতুন নতুন রচনার সাক্ষাৎ আমরা পাই। কখনো কখনো সম্পূর্ণভাবে নতুন না হলেও শিক্ষার্থীর প্রয়োজনকে বিবেচনা করে প্রয়োজনানুযায়ী পরিমার্জনাও সেগুলোতে ঘটেছিল।

শিক্ষার্থীকে সহজবোধ্য উপায়ে, অধিকতর ফলপ্রসূ প্রতিবেশের একটি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে প্রথম যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা হলো *ইংরাজি সোপান*। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১৯০৪ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটিতে ছিল : উপক্রমণিকা ও *ইংরাজি-সোপান* প্রথমভাগ। দ্বিতীয় খণ্ডের দুটি অংশ হলো *ইংরাজি সোপান* দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ। 'উপক্রমণিকা' অংশটি পরিবর্ধিত আকারে *ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা* নামে প্রকাশিত হয় সম্ভবত ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। যেমনভাবে ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয় *ইংরাজি-সোপান* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ *ইংরেজি সহজ শিক্ষা* প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ। ইতোমধ্যে ১৯০৯-এ প্রকাশ পায় *ইংরাজি-পাঠ* গ্রন্থটি যা *ইংরাজি-সোপান*-এর প্রাগসর একটি গ্রন্থ। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ *অনুবাদ-চর্চা* নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন সেটিও ইংরেজি শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ছিল বৈকি।

*ইংরাজি-সোপান* প্রধানত রচিত হয়েছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য, যদিও ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী বয়স্ক শিক্ষার্থীরাও এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন, এমন আশা রবীন্দ্রনাথ যথার্থই করেছিলেন। বইটি প্রকাশের পূর্বে ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে তা কয়েক বছর সফলভাবে পঠিত হয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় উল্লেখ করেন।[৪] এ তথ্য থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয় : বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককাল থেকেই ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন ছিলেন, যেমনভাবে একটি সফল পদ্ধতি নির্মাণে নিরন্তর প্রচেষ্টাও ছিলেন তিনি। অন্যদিকে গ্রন্থটি প্রকাশে দেরি করার যে কারণ তিনি স্পষ্ট করেন তা দিয়ে প্রমাণ হয় তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন রচিত পাঠ্যপুস্তকের পরীক্ষিত সাফল্যের ব্যাপারে। এ সচেতনতা যেমন রবীন্দ্রনাথকে একজন ভালো শিক্ষকের মর্যাদা দেয়, তেমনি শিক্ষা উপাদান নির্মাণে তাঁর সাফল্যও চিহ্নিত করে।

ভাবতে বিস্ময় লাগে সারা শতাব্দী জুড়ে ইংরেজি শেখানোর জন্য গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড ছাড়া বাঙালির সামনে যখন আর কোনো পথ খোলা ছিল না, নিয়মকে আশ্রয় করে ভাষা শেখার ক্লান্তিকর, অসফল পদ্ধতিই ছিল একমাত্র অবলম্বন, তখন শতাব্দীর শুরুতেই



www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ প্রযুক্ত করেছিলেন আধুনিকতম ও সর্বোচ্চ ফলদায়ী একটি পদ্ধতি। শোনা ও বলার ভেতর দিয়ে ছাত্রকে একটি বিশেষ বিদেশি ভাষার সাথে পরিচয়ের এমন অভিনবত্ব শুধু যে ভারতবাসীদের নিকট নতুন ছিল তা নয়, বিদেশি ভাষা শেখানোর পদ্ধতির ইতিহাসেও তা ছিল যুগান্তকারী।

*ইংরাজি-সোপান*-এর ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির উপক্রমণিকা সম্পর্কে বলেন, "ছাত্রগণ যখন অক্ষর পরিচয়ে প্রবৃত্ত তখনি ইংরেজি ভাষার সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন এই অংশের উদ্দেশ্য। ইহা ভাষা শিক্ষার ড্রিল। শিক্ষক ক্লাসের জন্য ছাত্রগণকে দাঁড় করাইয়া ইংরেজি ভাষায় আদেশ করিবেন, তাহারা পালন করিতে থাকিবে। যখন বলিবামাত্র তাহারা যথারূপে আদেশ সম্পন্ন করিবে তখন বুঝা যাইবে আদেশ বাক্যের তাৎপর্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।"[৫] কানে শুনিয়ে ও মুখে বলিয়ে ইংরেজি ব্যবহারে ছাত্রদেরকে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য *ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষার* ভূমিকাতেও উল্লিখিত হয়েছিল। সে উদ্দেশ্যকে প্রয়োগের সফল উপায় সম্পর্কেও তিনি সে ভূমিকাতেই উল্লেখ করেন। বারবার অভ্যাস করিয়ে ইংরেজি শেখানোর এই পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবজীবনে সফল হয়েছিলেন বলেই পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসেবে তিনি সে পদ্ধতির ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করতেন। ইংরেজি শেখানোর রবীন্দ্রনাথের এ পদ্ধতির সাথে বিদেশি ভাষা শেখানোর অনেকগুলো পদ্ধতির মধ্যে Direct পদ্ধতির মিল বেশি লক্ষ করা যায়। Direct পদ্ধতিতে 'The teacher communicates with the students in as direct a way as possible, using mime, gestures, and other clues. The method avoids the conscious learning of grammar, and leaves work on reading and writing until after speaking and listening skills are well established.'[৬] রবীন্দ্রনাথ রচিত ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকেও এমন পদ্ধতি স্পষ্ট। তিনি নিয়মের কঠিন নিগড়ে ছাত্রকে না বেঁধে অভ্যাসের মাধ্যমে বিভিন্ন নিয়মের বাক্যকে ছাত্রের আয়ত্তে আনার কথা চিন্তা করেছিলেন। সে আয়ত্ত প্রথমে মুখে এবং পরে লেখাতে আনার সফল উপায়টিও তিনি নির্দেশ করেন। এটি সত্য Grammar-Translation-এর হাজার বছরের পুরানো রীতিকে পিছে ফেলে উনিশ শতকের ইউরোপে ততোদিন বিদেশি ভাষা শেখানোর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ভাষা শিক্ষার স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষার্থীকে বিদেশি ভাষা শেখানোর এ প্রচেষ্টাটি প্রথমে Natural Method হিসেবে পরিচিতি পায় সেটি পরবর্তীতে Direct Method নাম গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে Natural Method-এ যাঁরা বেশি কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে L. Sauveur (১৮২৬-১৯০৭) অন্যতম। Sauveur 'used intensive oral interaction in the target language, employing questions as a way of presenting and eliciting language. He opened a language school in Boston in the late 1860s, and his method soon became referred to as the Natural



www.pathagar.com

Method.'[৭] তবে ভারতীয় উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান উপমহাদেশের একটি ভাষা বাংলাতে। সেজন্যেই প্রতিভা গুপ্ত যথার্থই বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইংরেজি শিক্ষার প্রকৃষ্ট পথ ও উপায় সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াছেন। ইংরেজি-শিক্ষা পদ্ধতিতে "Direct Method" যাহাকে বলে তাহা তিনিই দেশীয় বিদ্যালয়ে প্রথমে প্রচলিত করেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন না, বরঞ্চ যাহাতে বালকেরা বেশ ভালো করিয়া ভাষা আয়ত্ত করতে পারে তাহার জন্য *ইংরাজি-সোপান* রচনা করিয়াছিলেন এবং শিশুদের ইংরেজি পড়িবার ক্লাশগুলো নিজেই লইতেন।'[৮]

সম্পূর্ণত ছাত্রকেন্দ্রিক এ পাঠ্যপুস্তকে প্রথমে শিক্ষার্থীকে আদেশ-নির্দেশসূচক বাক্য দিয়ে অভ্যস্ত করাতে বলা হয়েছে। শিক্ষকের আদেশ-নির্দেশ শিক্ষার্থী শুনবে এবং পালন করবে। 'Come here' দিয়ে শুরু হয়ে সেখানে সহস্র-প্রায় বাক্য রয়েছে। একই structure-এ ব্যবহৃত একাধিক বাক্য সামান্য সামান্য পরিবর্তন গ্রহণ করেছে আস্তে আস্তে। Verb যেমন বদলেছে, বদলেছে preposition বা object বা complement। Come here থেকে come to me; come to me, থেকে come to this window। যেমন সে-সূত্র ধরে go to the wall বা walk into the room। যেমন stand before me বাক্যটি stand on my left side বা lie on your left side রূপও গ্রহণ করে সহজে। *ইংরাজি-সোপান*-এর উপক্রমণিকার ১ অংশটি নিম্নরূপ :

Come here কুমুদ। (এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে)
Sit down কুমুদ।
(প্রত্যেককে) You sit here. You sit there ইত্যাদি।
" Stand up. You stand here. You stand there & c.
" Go. You go there.
" Run. Stop. Come back. Sit down. Lie down.
" Get up. (এইরূপ প্রত্যেককে)[৯]

দিনের পর দিন এমন আদেশ-নির্দেশে অভ্যস্ত হয়ে ছাত্র নিজে interaction-এ অংশ নিতে শুরু করে। Come here Kumud শুনে কুমুদ আসলে প্রশ্ন করা হয় Have you come here? যার উত্তর Yes, I have come। ক্রমান্বয়ে এর ভেতর ঢুকে পড়ে Wh-question ও। যেমন শিক্ষক ছাত্রকে Stop নির্দেশ দিয়ে প্রশ্ন করেন :

প্র. What have you done?
উ. We have stopped.
প্র. What were you doing?
উ. We were walking.
প্র. What was Kumud doing?
উ. Kumud was walking.

(এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে)[১০]



www.pathagar.com

এই 'উপক্রমণিকা'র ১৩টি পৃষ্ঠা আরো বিস্তৃত হয়ে *ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা*তে ২৯ পৃষ্ঠার কলেবর নিয়েছে। এটিতেও রবীন্দ্রনাথ একই রকম ড্রিলের পরামর্শ দিয়েছেন। তবে এর দ্বিতীয় ভাগে ড্রিলের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আরো খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন। পূর্বে যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বা সব শিক্ষার্থীকে একত্রে আদেশ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, বর্তমানে প্রত্যেককে বা দল বিভক্ত করে প্রত্যেক দলকে প্রশ্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্পষ্ট করে উল্লেখ করা না থাকলেও অনুমান করা যায় সাম্প্রতিক সময়ে 'Group-work'-এর মাধ্যমে ভাষা শেখানোর যে পদ্ধতি রয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। Structure-এর ব্যাপারেও *ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা*তে নতুনত্ব আছে। এতে 'Yes'-'No' question-কে তিনি সাজিয়েছেন সব Tense-এর বাক্য দিয়ে। Wh-question-ও এ বইটিতে সংযোজন করা হয়েছিল নতুন মাত্রায়। যেমন—

ছাত্রদের শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া—
Who is the tallest. Find the shortest.
Who is shorter than four feet?
Who is taller than Jadu?
Who are shorter than Ram?
How tall is he, is Jadu? ইত্যাদি।
How stout, thin, fair, dark? ইত্যাদি।[১১]

এভাবে শুধুমাত্র শোনা ও বলার দক্ষতা বৃদ্ধিতেই রবীন্দ্রনাথ সীমাবদ্ধ ছিলেন না। শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট মনোযোগী। *ইংরাজি-সোপান* প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ বা *ইংরেজি সহজশিক্ষা*র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের দিকে লক্ষ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

এ গ্রন্থগুলোতে অনুবাদ-চর্চা শুরু হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ দিয়ে। পর্যায়ক্রমে দীর্ঘতর বাক্যে তিনি গেছেন, গেছেন বাক্যের বহুবিধ রূপেও। *ইংরাজি-সোপান* প্রথমভাগে 'The man-মানুষ, big বড়ো' দিয়ে শুরু তিনি 'The big man' করেছেন। এভাবে শিক্ষার্থীকে শত শত শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে পৌছেছেন ক্ষুদ্র কিন্তু পূর্ণ বাক্যে যা হয়েছে 'The man is big'। তবে এ পর্যায়েও তিনি conversation তুলে দেন নি। মাঝে মাঝেই শিক্ষককে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করার জন্য। সেভাবেই প্রশ্ন এসেছে,

| | |
|---|---|
| | Is the dog mad? |
| | Yes, the dog is mad; |
| (অন্য ছাত্রকে) | Who is mad? |
| | The dog is mad. |
| (অন্যকে) | What is the dog? |
| | The dog is mad. |



www.pathagar.com

(অন্যকে) Is not the dog mad?
Yes, the dog is mad.
Is the boy bad?
Yes, the boy is bad.
(অন্যকে) Who is bad?
The boy is bad.
(অন্যকে) What is the boy?
The boy is bad.
(অন্যকে) Is not the boy bad?
Yes, the boy is bad.[১২]

ইতিবাচক এ সকল প্রশ্ন নেতিরূপ লাভ করেছে খানিক পরেই। যেমন—

Is the boy bad?
No, the boy is not bad, the boy is good.
Is the pen old?
No, the pen is not old, the pen is new.
Is the bed hard?
No, the bed is not hard, the bed is soft.[১৩]

এবং পুনশ্চ উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ এ সব উদাহরণও চর্চা করেছেন অনুবাদ-উদ্দেশ্যে। Active-Passive বা Direct-Indirect বাক্য পরিবর্তনের ব্যাপারটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রয়োজনে বাংলা থেকে ইংরেজি বা ইংরেজি থেকে বাংলা করারও নির্দেশ রয়েছে গ্রন্থে। *ইংরেজি সহজশিক্ষার* শেষে এসে বাংলা পূর্ণ অনুচ্ছেদের ইংরেজি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এবার আসছি *ইংরাজি পাঠ*-এ। ইংরেজি বাক্য দেখে দেখে অনুরূপ বাংলা বাক্যের ইংরেজি করানোর জন্য এ বইটি। বইটির মোট ১৮টি Lesson-এর প্রথমটি পর্যালোচনা করলেই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমে একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদ দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি সরল বাক্যের সমন্বয়ে এ অনুচ্ছেদের নিচে একটি বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে যেটি শিক্ষার্থী ইংরেজি বাক্যগুলো দেখলে অনুবাদ করতে সক্ষম হবে। যেমন— It is Sunday, ইংরেজি অনুচ্ছেদ দেখে বাংলা অনুবাদ 'আজ শনিবার', 'আজ সোমবার' ইত্যাদির ইংরেজি অনুবাদ করা যায়। ইংরেজি অনুচ্ছেদের প্রতিটি বাক্যের বিপরীতেই বাংলা অনুচ্ছেদে একাধিক বাক্য স্থান পেয়েছে।

তবে সন্দেহ নেই *অনুবাদ-চর্চা* অনুবাদ কার্যক্রমের অনেক উঁচু স্তরের গ্রন্থ। এতে মোট ২২৪টি বাংলা অনুচ্ছেদ রয়েছে যেগুলোতে সরল ও জটিল বাক্য নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কোনোরকম সূত্রের উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র কম পরিচিত কিছু নামবাচক শব্দ ইংরেজি হরফে লেখা।

উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ যখন ছাত্র-ছাত্রীকে করানোর জন্য drill-এর তালিকা করেন তখন তা করেন ইংরেজিতে, কিন্তু সেটি অনুসরণের ব্যাপারে শিক্ষকের জন্য রচিত



www.pathagar.com

পরামর্শ বাংলায় লেখেন তিনি। কিভাবে drill-কে শ্রেণীকক্ষে মনোগ্রাহী এবং বাস্তবোচিত (real-life situation) করা যায় তার বিবরণও বইতে রয়েছে।

ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি অবশ্য উচ্চার্য নাম। বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় বিষয়কেই তিনি বিচার করেছেন। শিক্ষাদানের পদ্ধতির ব্যাপারটিও তাঁর ভাবনায় ছিল। আর সেজন্যই শিক্ষার্থীকে প্রীতিকর পরিবেশে রেখে তুলনামূলক বেশি ইংরেজি-ভাষা শেখানোর পদ্ধতিকে অনুসন্ধানও ছিল তাঁর অনেক লক্ষ্যের অন্যতম। আর সে অনুসন্ধানের ফসলই হলো ইংরেজি শোনা ও বলার মাধ্যমে একজন বাঙালি ছাত্রছাত্রীকে পড়া ও লেখার ভেতরে নিবিষ্ট করার রাবীন্দ্রিক পদ্ধতি। বিদেশি ভাষা শেখার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি কথোপকথনের ভেতর দিয়ে ভাষা শেখানোর পক্ষে থাকলেও উচ্চতর পর্যায়ে অনুবাদকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। ইংরেজি উচ্চারণ নিয়েও তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। পাঠভবনের কার্যক্রম সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়ে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লেখেন 'মাঝে মাঝে ইংরেজি নাটক অভিনয় ভাষা শিক্ষার পক্ষে উপযোগী এ কথা যেন মনে থাকে—অবশ্য এই সুযোগে উচ্চারণ এবং একসেন্টের ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত।'[১৪]

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় ১৯২০ সালের দিকে পরিস্থিতির প্রয়োজনে ইউরোপে Direct Method গুরুত্ব হারাতে থাকে এবং পরবর্তীতে আমেরিকায় Audiolingual এবং ব্রিটেনে Oral Approach or Situational Language Teaching-এর বিকাশ ঘটে।[১৫] Humanistic Method-এর Community Language Learningও[১৬] বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনের ফসল যার আরেক রূপ Communicative Language Teaching বা বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত ও জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। গ্রামার ট্রান্সলেশন পদ্ধতির কাঠখোট্টা কম ফলপ্রসূ পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ বাংলাভাষীদের নিকট প্রথম উপস্থাপন করেন যে শিক্ষাবিদ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তথ্যসূত্র


১. অন্নদাশংকর রায়, *শিক্ষার ভবিষ্যৎ*, প্রথম সুচেতনা সংস্করণ, ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৩০

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার হেরফের', *শিক্ষা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনাবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ. ০৮

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ*, *শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৪. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য *ইংরাজি-সোপান* গ্রন্থের 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' অংশটি। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (পঞ্চদশ খণ্ড), জয় বুক ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা ১৪০৬, পৃ. ১৯১

৫. তদেব

৬. David Crystal, *An Encyclopedic Dictionary of Language & Languages*, Uk, 1992, P.106

৭. Jack C Richards and Theodore S. Rodgers, *Approches and methods in language teaching*, Cambridge University Press, Great Britain, Low Price Edition, 1995, p-09




www.pathagar.com

প্রতিভা গুপ্ত, *শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ*, কলিকাতা প্রথম সংস্করণ ১৯৬১ (নতুন সং ১৩৯৩), পৃ. ১৫৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ইংরাজি-সোপান, রবীন্দ্র রচনাবলী* (পঞ্চদশ খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

১০. তদেব, পৃ. ২০৩

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৫

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ইংরাজি -সোপান প্রথম ভাগ, রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০

১৩. তদেব, পৃ. ২১১

১৪. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র নং ১, *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত : শিক্ষাচিন্তা*, (সম্পা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়)। কলকাতা, ১৩৮৯, পৃ. ২২৩

১৫. দ্রষ্টব্য Jack C Richard and Theodore S. Rodgers, ibid, p.11

১৬. দ্রষ্টব্য David Nunan, *Language Teaching Methodology*, London, 1998, p. 234-237

মাসিক *শিক্ষাবার্তা* (সম্পা: আফরোজান নাহার রাশেদা, ঢাকা)-য় মে ২০০৩ এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# শিক্ষক জীবনানন্দ দাশের শিক্ষাচিন্তা

"কিশোর বয়সে যা শেখা হয়েছিল তা আর এখন একটি জীবনের বাকি দিনগুলোর জন্য যথেষ্ট নয়। এর থেকেই বলা যায়, স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া ডিগ্রিকে সারাজীবনের জন্য মূল্যায়ন বলে মনে করা ঠিক নয়, আসলে এই ডিগ্রিগুলো একটি সাময়িক মূল্যায়ন। পরিণত জীবনে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিনিয়ত পরীক্ষা হওয়া উচিত এবং বারবার আমাদের পুনর্মূল্যায়ন হওয়া উচিত...।" আর্নল্ড টয়েনবির (১৮৮৯-১৯৭৫) এ কথাগুলো বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।[১] টয়েনবি ও দাইসাকু ইকোর কথোপকথনের 'শিক্ষা' শিরোনামাধীন এ অংশটির সমভাব নিয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে *মাসিক বসুমতীর* কার্তিক সংখ্যায়। 'শিক্ষা-দীক্ষা—শিক্ষকতা' নামের সে লেখায় ছিল "... ইউনিভার্সিটি নিজে ঠিক করে দিয়েছে কে কোন ক্লাস। সেটা তাদের কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে ঠিক হয়ে গেছে। এরপর সমস্ত জীবনভর আর কোন ক্রমবিকাশ নেই! মানুষ আঠারো-কুড়ি বছর পর্যন্ত বাড়ে, তারপর আর কোন বাড় নেই শরীরের, মনের বেলাও সেইটেই ঠিক?" লেখক ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। এ তো গেলো শিক্ষাচিন্তক জীবনানন্দের পরিচয়, কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তিনি কেমন? "... তিনি ইংরেজি গদ্য-প্রবন্ধ পড়াতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত সেই গদ্য-গ্রন্থটি অতিশয় নিরস। কিন্তু ছাত্রীদের কাছে শুনেছি নিরস গদ্যও নাকি তাঁর পড়ানোর গুণে কবিতার মতো স্বাদু হয়ে উঠতো।"—জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে এ মন্তব্য হাওড়া গার্লস কলেজে তাঁর সহকর্মী অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের।[২]

কবি জীবনানন্দের কথাসাহিত্যিক খ্যাতি সাম্প্রতিক দশকের। কিছু কিছু প্রবন্ধ দৃষ্টি কাড়ছে। কিন্তু শিক্ষাচিন্তাবিদ হিসাবে তাঁর অবস্থানটিও ভেবে দেখার মতো। যদিও এসব কিছুর গভীরে যাওয়ার আগে আমাদের প্রয়োজন পড়বে অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তি জীবনের খতিয়ানটি নেওয়ার।

'সন্তান শিক্ষায় প্রহারের স্থান নেই, প্রহার করে সন্তানকে শাসন করতে হলে তোমার নিজেরই পরাজয় হল, এরকম একটা ধারণা বাবার ছিল। সন্তান শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব পুস্তিকা অথবা প্রবন্ধ তিনি নানা সময়ে লিখেছেন সর্বত্রই খুব জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন'—এ হলো বাবা সম্পর্কে জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ দাশের ভাবনা।[৩] আর মা? 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে' খ্যাত কুসুমকমারী দেবী। এঁদেরই বড় ছেলে জীবনানন্দের জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯।



www.pathagar.com

১৯২১-এ এম, এ. পাসের পর তিনি ১৯২২-এ কলকাতার সিটি কলেজে যোগ দেন। ১৯২৮-এর টিউটর পদের এ চাকরিটি চলে যাওয়া নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত। 'অশ্লীল কবিতা' লেখা, হিন্দু ও বাহ্মদের বিতণ্ডা ইত্যাদিকে অনেকেই এই চাকরি হারানোর পেছনের কারণ বলে মনে করেন। কলেজের আর্থিক দুরবস্থাকেও চিহ্নিত করেছেন কেউ কেউ। কাটালেন এক বছরেরও বেশি বেকারকাল যখন টিউশনি ছিল একমাত্র উপায়। ১৯২৯-এর মাঝামাঝি বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে ছিলেন মাস তিনেকের জন্য। ভাল না লাগায় চাকরি ছেড়ে আবার কলকাতা, আবার গৃহশিক্ষকতা। ও বছরের ডিসেম্বরেই অধ্যাপনা পান দিল্লির রামযশ কলেজে। কিন্তু মাত্র মাসচারেক। বিয়ে ইত্যাদির জন্য আর ফেরা হয় নি। এবারের কর্মহীনতা দীর্ঘতর–১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত। ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্টের কাজ, ভাই অশোকনন্দের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জনৈক বন্ধুর সাথে ব্যবসার চেষ্টা ইত্যাদি এ সময়েই ঘটে। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য আবার টিউশনি। এরপর পেলেন স্থায়ী অধ্যাপকের চাকরি, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে কলকাতা থেকে সুদূর বরিশালের এই চাকরি তাঁকে ঠিক যেন স্বস্তি দিচ্ছিল না। 'পপুলার টিচার' হওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর এভাবেই আসে ১৯৪৬ সাল। সম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হিন্দু অধ্যাপকের পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ। আবার বেকার, দ্বারে দ্বারে ঘোরা। ১৯৫০-এ জোটে কলেজের চাকরি—খড়গপুরে। '৫০-এর সেপ্টেম্বর থেকে '৫১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট পাঁচ মাস। স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য ছুটি শেষে একেবারে ইস্তফা। বহুবিধ চেষ্টা চরিত্র। শেষে '৫২-এর নভেম্বরে বড়িশা কলেজে আকস্মিকভাবেই। মাত্র চারমাস পর 'পড়াতে পারতেন না এবং বয়সও হয়ে গিয়েছিল' অভিযোগে চাকরিচ্যুত। ওই বছরই জুলাইতে যোগদান করেন হাওড়া গার্লস কলেজে যেখানে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন কর্মরত। চাকরি-জীবনের এই তথ্যাদি –তাঁর অধ্যাপনা পাওয়া বা না-পাওয়া শিক্ষকতায় সাফল্য বা ব্যর্থতা ইত্যাদি বর্তমান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত।

জীবনানন্দ প্রসঙ্গে অশোক মিত্র এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "বরিশালে তো জীবনানন্দকে বলা হতো পাগলা অধ্যাপক।" "তেমন দক্ষ অধ্যাপকও ছিলেন না–লাজুক প্রকৃতির মানুষ; ফলে পড়াশোনায় তেমন সুনামও ছিল না।" অশোক মিত্রেরই ভাষ্য। যদিও শেষ জীবনে হাওড়া গার্লস কলেজে চাকরিকালীন হয়তো অবস্থা কিছু বদলে থাকবে। ১৯৫৩ সালে ওই কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে লিখেছেন, "ওটি [র‍্যালে'র 'দি ইনফ্লুয়েন্স অব দি ভয়েজেস অব দি সিক্সটিনথ সেঞ্চুরি অন ইংলিশ লিটারেচার'] শক্ত প্রবন্ধ ছিল। কিন্তু 'জে ডি' [জীবনানন্দ দাশ]-এর পড়াবার স্টাইলটি এত অন্তরঙ্গ যে বুঝতে অসুবিধা হয়নি।"[৬] শিক্ষক জীবনানন্দের ব্যক্তিগত ও পরিচয়টি আরও স্পষ্ট হয় তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দাশের লেখা 'মানুষ জীবনানন্দ' (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) থেকে। হোলির দিনে ছাত্ররা বাড়িতে এসেছিল আবির দিয়ে তাঁকে প্রণাম করার জন্য। এদের একজন লাবণ্যর ঘরে ঢুকে তাঁকে রং দিতে চাইলে তিনি আপত্তি করেন এবং একটি অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় যাতে জীবনানন্দ হন খুব ব্যথিত। আর এসব কারণেই হয়তো কবি-স্ত্রী কবি সম্পর্কে লেখেন, "কবি ছিলেন



www.pathagar.com

ছাত্রদরদী। ছাত্ররাও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করত। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও আমি তাঁর ছাত্র-প্রীতি লক্ষ করেছি"[৭]।

এ তো গেল ব্যক্তি জীবনানন্দের শিক্ষক পরিচয়। এবার আসা যাক শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ভাবনা প্রসঙ্গে। *দেশ* এবং *স্টেটসম্যান* কাগজে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ বেরিয়েছিল যেগুলো তাঁকে হাওড়া গার্লস কলেজে চাকরি পেতে সাহায্য করে। গোপালচন্দ্র রায়ের 'জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচয়',[৮] নিবন্ধ থেকে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বাংলা ও ইংরেজি লেখালেখির পরিচয় মিললেও জীবনানন্দের লেখা মোট চারটি প্রবন্ধ সাকুল্যে আমরা পেয়েছি এবং উল্লেখ্য ইংরেজি লেখা শিক্ষা বিষয়ক তাঁর কোন প্রবন্ধই এখন পর্যন্ত লভ্য নয়। ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র* (মাওলা বাদ্রার্স, ঢাকা)-তেও ইংরেজিতে লেখা জীবনানন্দের অন্যান্য প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হলেও শিক্ষা বিষয়ক কোন ইংরেজি প্রবন্ধ নেই। শিক্ষা বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধ চারটি হলো : শিক্ষা-দীক্ষা–শিক্ষকতা (*মাসিক বসুমতি* কার্তিক, ১৩৫৫); শিক্ষার কথা (*দেশ*, ১৪ ভাদ্র, ১৩৫৯); শিক্ষা-দীক্ষা (*দেশ*, ২১ ভাদ্র, ১৩৫৯); এবং শিক্ষা ও ইংরাজি (এ প্রবন্ধটির প্রকাশকাল নিয়ে খানিক সন্দেহ রয়েছে। বিভিন্ন পক্ষের অনুমান ১৩৬০-এর শারদীয় *দৈনিক বসুমতী* তে তাঁর যে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল সেটিই এটি)। প্রবন্ধ চারটিতে যে বিষয়গুলো আলোকিত হয়েছে তা হলো শিক্ষকদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, শিক্ষাব্যবস্থায় দুরবস্থা, ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন এবং তা পড়ানোর পদ্ধতি পরিবর্তন ইত্যাদি।

"শিক্ষা-দীক্ষা–শিক্ষকতা' শীর্ষক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি আসলে শিক্ষা-বিষয়ক কোনো আলোচনা নয়। কলেজ-শিক্ষকদের পেশাগত অবস্থা ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ কিছু যুক্তিবহ বিশ্লেষণী মন্তব্য,–এ প্রবন্ধটির বিষয়।"[৯] ১৯৪৮ সালে রচিত এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "...অনেক বেসরকারি কলেজের শিক্ষকেরা মোটামুটি গর্ভরমেন্ট অফিসের লোয়ার ডিভিশনের কেরানিদের মতো মাইনে পায় কিংবা তার চেয়েও কম।" তাঁর এ বক্তব্য ব্যাখ্যা করে জীবনানন্দ আরও বলেন, "আমি কেরানিদের সঙ্গে প্রফেসরদের তুলনা করলাম এই জন্যে যে, আমাদের দেশে অনেকেরই মনে একটা ধারণা আছে, তথাকথিত ভদ্র সাধারণদের ভেতর কেরানিরাই সবচেয়ে বেশি আর্থিক অবিচার সহ্য করে আসছে—ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিক থেকে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। গর্ভরমেন্টের ও ধনিক অফিসগুলোর ওপরের—এমন কি মাঝমাঝি দিকের কেরানিরা যে ধরনের মাইনে, বোনাস ও অন্য দু'-চার রকম সুবিধে পায়, বাঁধাধরা পথে তাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নতির যত বেশি সুযোগ ও সুবিধে রয়ে গেছে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের তা নেই।" কলেজের শিক্ষকদের সাথে প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের দুরবস্থাকে তিনি সমান্তরাল করেন এভাবে, "আমি প্রাইভেট কলেজের মাস্টারদের সম্বন্ধেই বলছি; বলা বাহুল্য প্রাইভেট স্কুলের মাস্টারদের অবস্থা এসব প্রফেসরদের চেয়েও খারাপ।" যদিও সে সব অধ্যাপকদের যোগ্যতার প্রশ্নটি এমন 'ফার্স্ট ক্লাস এম এ না হলে আকজাল কলেজে মাস্টারি পাওয়া কঠিন।' আর যাঁরা এ যোগ্যতার বিপরীতে ওই সামান্য বেতন দয়াপরবশ হয়ে দেন তাঁদের সম্বন্ধে জীবনানন্দ সংক্ষেপে বলেন, "কলেজের গভর্নিং বডিগুলোর উকিলরা হাজার



www.pathagar.com

বারোশ টাকা (কেউ কেউ আরো বেশি, হাইকোর্টের উকিল জজের বরাদ্দ) মাসে মাসে পেলেও কলেজের প্রফেসরকে যে গোড়াতে একশ টাকার বেশি বেতন দেওয়া যেতে পারে না এবং চুল সাদা হয়ে গেলে মরবার আগে একশো পঁচাত্তর বড় জোড় দু'শো টাকা দেওয়া চলে—এ সম্বন্ধে তাদের বিবেক এত পরিচ্ছন্ন যে, সত্যিই তাদের কোন দোষ দেওয়া যায় না"। শিক্ষদের অর্থনৈতিক দৈন্যের এ চিত্রের ঐতিহাসিক কারণগুলোকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এভাবে, "আর্থিক দিক দিয়ে প্রাইভেট কলেজের প্রফেসররা কলেজগুলোর সেই সূত্রপাতের দিন থেকেই এরকম অবহেলিত হয়ে আসছে, যে কারণেই হোক না কেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোনদিনও প্রাইভেট কলেজের প্রফেসরদের দিকে ফিরে তাকায়নি। ফিরে যে তাকায়নি—শিক্ষার সৎ সংগঠন ও বিস্তারের জন্যে এবং কলেজের প্রফেসরদেরও রাষ্ট্রের অতি প্রয়োজনীয় কর্মী হিসাবে গ্রহণ করার জন্যে ব্রিটিশদের ভেতরে যে কঠিন বিমুখতা ছাড়া আর কিছু নেই, এ নিয়ে (যারা মাস্টার নয়) দেশের সব শিক্ষিত ও সচ্ছল সাধারণ মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেছিলেন বলে জানা নেই।" শিক্ষকদের দৈন্যদশার প্রতি দেশীয় মানুষদের রহস্যময় নিরবতা নিয়ে তাঁর কৌতুক উচ্চারণ "যতদিন ব্রিটিশ গর্ভরমেন্ট আমাদের দেশে রাজ্য সাম্রাজ্যের কাজ করে গেছে, আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্র সাধারণ সব ছেড়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার একমাত্র ব্রত নিয়ে যে ব্যাপৃত রয়েছিলেন এ কথা বলতে পারা যায় না। তাঁরা গভর্নমেন্টের সবরকম প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কাজ করেছেন ব্রিটিশের প্রতিনিধি হলে রাজ্য শাসন করেছেন—আইনের সভায় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন বেআইন বাতিলের চেষ্টা করেছেন, মন্ত্রিত্ব করেছেন, ব্রিটিশকে পরামর্শ দিয়েছেন, অনেক কাজই করেছেন, সব কিছুতে সফল হন নি বটে, কিন্তু নানা রকম ব্যাপারে অল্পবিস্তর সফলতা পেয়েছেন, কিন্তু স্কুলে মাস্টারদের হয়ে তাঁরা কোনোদিন আপ্রাণ লড়েছেন বলে জানি না"। এসব শিক্ষকের ব্যাপারে দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত লোকজনের আচরণ জীবনানন্দ দাশের কলমে মূল্যায়িত হয় এভাবে, "ইস্কুলের মাস্টাররা তো নিশ্চয়ই— বাংলাদেশের অধিকাংশ বেসরকারি কলেজের বেশির ভাগ অধ্যাপকেরাই যা মাইনে পায় তাতে মনে হয়, আমাদের দেশের পরিচালকের কোন অবস্থা ও শ্রদ্ধা নেই শিক্ষার ও শিক্ষকদের উপর"। অথচ একজন নিবেদিতপ্রাণ অধ্যাপককে "...বই, পত্র, পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদির জন্য কৌতূহলী হয়ে থাকতে হয়, পৃথিবীর পুরোনো বইগুলোর মর্ম সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়, নতুন বইয়ের খোঁজ রাখতে হয়—যত দূর সম্ভব শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়ে দেখতে হয়—কেউ তাকে কানে টানছে বলে নয়—ভালবাসার তাগিদে"। এবং "যে কোন নিজের কাজে সমাহিত অধ্যাপককে ভাঙিয়ে অন্য লাইনে নিয়ে যাওয়া কঠিন—টাকার প্রলোভনেও তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে অন্য কোন 'বড়' চাকরিতে যাবেন না"। এভাবে স্পষ্ট হয় একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের ব্যাপারে জীবনানন্দের আস্থা ও প্রত্যাশা। কিন্তু সামাজিক অবস্থার কারণে "বাংলাদেশে একসময় ও রকম সুধী আত্মস্থ শিক্ষকের বেশ সুসমাবেশ ছিল, দিনের পর দিন তা কমে যাচ্ছে"।



www.pathagar.com

শিক্ষা বিষয়ে জীবনানন্দ দাশের পরবর্তী প্রবন্ধ 'শিক্ষার কথা'য় তিনি শিক্ষক সমাজের অর্থনৈতিক দৈন্যের পুনঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় নোট বইয়ের প্রাচুর্য এবং তা থেকে ক্ষতির দিকগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। সে সূত্র ধরে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে বাঙালি যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। নোট বইয়ের পেছনের কারণকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে [মোটামুটি ১৯১২-১৯১৭ সাল নাগাদ] ইস্কুলের ছেলেদের জন্য ইউনিভার্সিটির কোন বাঁধাধরা পাঠ্যবই ছিল না, যদিও কয়েকটি বই পড়বার নির্দেশ দেওয়া হ'ত। কিন্তু সে-সব বই থেকে আজকের তুলনায় এরকম টেকস্‌টের প্রশ্ন বিশেষ কিছুই করা হ'ত না—যতদূর মনে পড়ে কোন প্রশ্নই থাকত না। তখনকার দিনে ইস্কুলে ক্লাশ নাইন-টেনে যেসব ইংরেজি বই পড়ানো হত সেগুলোর কোনরকম নোটই বাজারে কিনতে পাওয়া যেত না। কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষক বা অধ্যাপক কেউই "ইস্কুলের ছাত্রদের ইংরেজি পাঠ্যের নোট লেখার এই মর্মচ্ছেদী ব্যবসার কথা তখন কারো মাথায়ও ছিল কিনা বলতে পারছি না"। নোট বইয়ের পূর্ব ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জীবনানন্দ তাঁর কৈশোরকালের পাঠ্য ইংরেজি বইগুলোর চরিত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন এভাবে : "হোহেন লিন্ডেন,' 'আফটার ব্লেনহেইম', 'উই আর সেভেন' ইত্যাদি এখনকার (ইস্কুলে) পাঠনীয় অনেক কবিতাই সেকালের ছেলেরাও পড়েছে—কিন্তু নোট ছাড়া, কেবলমাত্র শিক্ষকদের কাছে ও বাড়িতে মন ও অভিধানের সাহায্যে। কিছু কিছু অপ্রচলিত ও শক্ত শব্দের মানে ও ক্বচিৎ ভাবভাষা ও বিষয়ের খটকা একআধ কথায় ভাড়িয়ে অল্প-স্বল্প টীকা থাকত হয়তো কবিতার বইগুলির পেছন দিকে; নোট বলতে ইংরেজি কাব্য সম্পাদকের এই সব টীকাই বুঝত ছেলেরা"। সে প্রসঙ্গে তিনি দাঢ্যকণ্ঠে প্রশ্ন তোলেন, "কিন্তু ইংরেজি কবিতা (বা গদ্যে) বুৎপত্তি কি আজকালকার ছেলেদের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে খারাপ ছিল তখনকার ছেলেদের"? ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞানের এ দুর্দশা নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে জীবনানন্দ এ প্রবন্ধ রচনার পর আরও অন্তত পঞ্চাশ বছর বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। তাঁর অভিমত "সাহিত্য হিসাবে না হোক, ভাষা হিসাবে অন্তত ইংরেজিকে এখনই এদেশের শিক্ষা-দীক্ষার ভেতর থেকে বিদায় দেওয়া চলে না।... আরো কয়েক দশক—খুব সম্ভব এই শতকের শেষ অব্দি—এ দেশের ছাত্রদের ইংরেজি জানা দরকার। তা না হলে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের চর্চা আধাখেঁচড়াভাবে চলবে, বেশি সার্থকতা পাওয়া যাবে না"। বাঙালির নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার এ প্রয়োজনকে হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষক জীবনানন্দ দাশ। আর সে কারণেই প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত তিনি করেছিলেন 'শিক্ষার কথা' প্রবন্ধে। "ইস্কুলে পাঠ্য পড়বার ও পরীক্ষা নেবার পদ্ধতি এরকম হওয়া দরকার—ইংরেজি ভাষাকে এমন হৃদ্য করে তোলা উচিত যাতে নোটের অপর্যাপ্ত অসুস্থ ভাষা ছেড়ে তারা [ছাত্রছাত্রীরা] টেক্‌স্‌ট ও নানারকম বইপত্র পত্রিকা পড়বার স্বভাব তাগিদ বোধ করে"—এ ভাবনার ধ্বনি শিক্ষাবিষয়ক তাঁর পরবর্তী দুটি প্রবন্ধ 'শিক্ষাদীক্ষা' ও 'শিক্ষা ও ইংরাজি' উভয়েতেই বিরাজিত।

'শিক্ষা-দীক্ষা–শিক্ষকতা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন যে-ভাবনার নতুন বিশেষণ



www.pathagar.com

ঘটেছে 'শিক্ষাদীক্ষা' প্রবন্ধে। একজন তীক্ষ্ণ সমালোচক-শিক্ষকদের মত তিনি বলেন, "ভারতবাসী ও বাঙালীর শিক্ষা নিয়ে রামমোহন (তখনকার দিনে যতদূর সম্ভব স্পষ্টতায়) ভেবেছিলেন, পরে বিদ্যাসাগর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষানায়কেরা এঁদের চিন্তা ও নির্দেশের ফল গ্রহণ করবার জন্যে কোন সময়ই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন না—শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের আলাদা ধারণা ছিল। দেশের বড় বড় মনীষী বা শিক্ষা কমিশনগুলো (মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও) যাই ভাবুক বা বলুক না কেন, বেসরকারি ও সরকারি শিক্ষাকর্তাদের ধারণাই আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের ইস্কুল কলেজের শিক্ষায় একমাত্র প্রাধান্য পেয়ে এসেছে"।

বিশ্লেষণী এ মন্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সরকারের কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারা যায়, শিক্ষা অন্তত বেসরকারি শিক্ষা (যে শিক্ষা ভারতবর্ষ ও প্রদেশগুলোর মেরুদণ্ড), আজকের স্বাধীন দেশের চোখেও ব্রিটিশ আমলের শিক্ষার মত তুচ্ছ ও চিন্তার অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে"। 'শিক্ষার কথা' প্রবন্ধে আলোচিত নোট বই হেতু ক্ষতির পরিমাপ প্রসঙ্গে তিনি যেমন বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন তেমনি নোট বইয়ের জনপ্রিয়তার কারণকেও খুঁজে দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন। শুধু ইংরেজি শিক্ষার প্রতিই নয় বরং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উপরই ছাত্র-ছাত্রীর সাম্প্রতিক অনীহাকে জীবনানন্দ এসবের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন এভাবে "নানা কারণেই শিক্ষার ওপর ছাত্রদের অরুচি বেড়ে গেছে। ঠিকভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠবার শক্তি কমে গেছে হয়তো। বইয়ের বদলে তাড়াতাড়ি নোট বা ম্যানুয়্যাল মারফত লেখাপড়া শেষ করে রোজগারের কাজে তারা নেমে পড়তে চায়।" বাস্তব আরও কতগুলো কারণকে এর পেছনে দায়ি করেন জীবনানন্দ "যেমন অনেকদিন ধরে আমাদের দেশের আর্থিক দুরবস্থা, রাষ্ট্র চালানোর ব্যাপারে নানা রকম দুর্বলতা ও দোষ, শিক্ষার প্রতি সাধারণের উপেক্ষা, দেশের নেতাদের প্রচণ্ড অমনোযোগ, শিক্ষিতদের চাকরির অভাব, অশিক্ষিত আধো শিক্ষিত মিস্ত্রী মজুরদের তুলনায় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বেশি বেকার থাকার সম্ভাবনা, দরিদ্র, শিক্ষিত সমাজের জীবন্মৃত অবস্থা।" শিক্ষাগ্রহণে ব্যর্থতার পেছনের এসব কারণ নির্দেশ জীবনানন্দের সমাজবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। শিক্ষার এ ব্যর্থতা শুধু যে ইংরেজি শেখার ব্যর্থতা তাই নয়, বাংলাও যে ছাত্ররা ভাল শিখছে না তা বলতে জীবনানন্দ ভোলেন নি। তাই ভাল করে বাংলা ভাষা শিক্ষার গুরুত্বকেও তিনি বিবেচনা করেছেন যেমনভাবে করেছেন ইংরেজি শেখার গুরুত্বকে। জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চায় ইংরেজির গুরুত্বকে তিনি এ প্রবন্ধে চিহ্নিত করেন এভাবে, "ইস্কুল-কলেজের শিক্ষকদের পাঠন ইংরেজিতে ও ইংরেজি মিশানো বাংলায় হবে বলেই শুধু ইংরেজি ঠিকভাবে জানা দরকার নয়—ইংরেজি সেরকম শেখা থাকলে ছেলেরা অনেক মূল পুঁথিপত্র বক্তৃতা কাগজ পত্রিকা ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারবে। ইংরেজি না জেনে বা কম শিখে পৃথিবীর জ্ঞান বিচারে সম্বন্ধ থেকে দূরে সরে থাকলে আমাদের শিক্ষা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়বে"। আর সে কারণেই 'শিক্ষার কথা'য় যেমন তিনি ইংরেজি শেখার পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন,



www.pathagar.com

তেমনই পরিবর্তনের কথা 'শিক্ষা-দীক্ষা'তে ও বলেছেন। ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তনে জীবনানন্দের [৮] এভাবনা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেয়েছে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর সর্বশেষ প্রবন্ধ 'শিক্ষা ও ইংরাজি'তে।

ইংরেজি শিক্ষায় ব্যর্থতার কথা বলতে গিয়ে জীবনানন্দ সাধারণ শিক্ষকদের মত যারা "ইংরেজি বাঙালীর কাছে সহজাত ভাষা–এ ভাষা শেখা বাঙালীর পক্ষে তেমন শক্ত কিছু নয়, ইংরেজির চেয়ে তামিল তেলেগু ইত্যাদি ভারতীয় ভাষা বরং কঠিন" না বলে বরং গভীর মমতায় স্বীকার করেছেন, "ইংরেজি একেবারেই বিদেশি ভাষা...ভাষা হিসেবেও সহজ নয়, ইংরেজির অগোত্রীয় ভাষাভাষীদের পক্ষে আরো কঠিন"। কিন্তু সে কঠিন ভাষাটি উপযুক্ত পদ্ধতির অভাবে কেমনভাবে ব্যর্থ হলো তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জীবনানন্দ বলেন, "সেকেলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের ইস্কুল-কলেজে কোন সরল বুনিয়াদী (basic) ইংরেজির চলন না থাকায় এবং শিক্ষকেরা নিখুঁত ব্যাকরণ ও 'খাঁটি' ইংরেজির উপর বেশি জোর দেওয়ায় আমাদের দেশে এই একশো-সোয়াশো বছরে শিক্ষা এদেশের প্রায় শতকরা নব্বই জন ছাত্রের পক্ষেই ইংরেজি ভাষা শেখার বিষম চেষ্টায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আট-দশ বছর স্কুলে কাটিয়েও তাদের অনেকেই ইংরেজি কিছুটা শুদ্ধভাবেও বলতে বা লিখতে শেখিনি।... ইংরেজিতে কাঁচা থাকায় ইংরেজির মারফতে এরা স্কুল-কলেজে যা-কিছু শিখেছে সেটা খুব ভালো অধিগত হয়েছে বলে মনে হয় না"। বাংলাভাষী বা ভারতবর্ষীয় অঞ্চলে ইংরেজি শেখার ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল জীবনানন্দ তাই দৃঢ়তার সাথে বলেন, "কোনো দিন বুনিয়াদি ইংরেজির ভালো করে জন্ম ও লালন হয়েছিল কিনা জানি না। এখন তার কি অবস্থা জানা নেই। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে কোনোদিন সে ইংরেজি ঢুকেছি বলে মনে পড়ছে না"। আর এভাবেই জীবনানন্দ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য লেখার আলাদা আলাদা গুরুত্বকে তুলে ধরেন এ প্রসঙ্গে। তিনি যে ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে শেখার ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে লক্ষ করেছিলেন, যা যে কোন ভাষা শেখার জন্যই মনোযোগের দাবিদার, তা বোঝা যায় যখন তিনি নির্দ্বিধকণ্ঠে বলেন, "কিন্তু স্কুল ও কলেজে যে রকমভাবে ইংরেজি শেখাবার চেষ্টা করা হয় ও স্কুল-কলেজের সমস্ত ছেলের জন্যেই ইংরেজি সাহিত্যের ওপর যে অপ্রসাঙ্গিক জোর দেওয়া হয় আজকের দিনে তা অবাস্তব"। তাঁর মতে, "গত দু'তিন দশকে অন্তত শিক্ষায় যে খারাপ ফল পাওয়া যাচ্ছে তার প্রতিকার করতে হলে পাঠ ও শিক্ষার পদ্ধতি শুধু অনেকখানি বদলাবার দরকার নয়—শিক্ষদের মুখে ইংরেজি বা বাংলায় 'কঠিন' শব্দ ব্যবহারের জন্য ছাত্রদের মনে যে নৈষ্ফল্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে সেটা ঘোচাবার জন্যে দুপক্ষের থেকেই উপযুক্ত চেষ্টার দরকার। ছেলেদের আরো ভালো করে ভাষা (ইংরেজি–এমনকি বাংলাও) শেখা উচিত; তাহলে যা শিক্ষকদের ভাষা, তাদের কাছে তা আর তেমন 'পণ্ডিতী' বলে মনে হবে না। পড়াবার ভাষার আড়ষ্টতা ঘুচিয়ে ছেলেদের কাছে নিজেকে যতদূর সম্ভব সহজ করে তোলা উচিত শিক্ষকের"।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জীবনানন্দ দাশ শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যর্থতা নিয়েও উদ্বিগ্ন। 'শিক্ষা-দীক্ষা'য় যে তিনি বলেছিলেন "আজকাল ছাত্রেরা (শিক্ষক অধ্যাপক



www.pathagar.com

ও পরীক্ষকের কাছ থেকে কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছে) বাংলাও ভালো করে শিখছে না" তার প্রতিধ্বনি 'শিক্ষা ও ইংরেজি'তে অনেক বেশি। তিনি লক্ষ করেছিলেন "খুব সম্ভব দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে ইংরেজির প্রতি উপেক্ষা ছাত্রমহলে বেশি বেড়ে গেছে; আরও বাড়ছে। কিন্তু তাই বলে বাংলার জন্যে যে খুব আগ্রহ জন্মেছে তা মনে হয় না। পরীক্ষার খাতায় ভাঙা-ভাঙা কাঁচা বাংলা ঢের বেশি; শতকরা খুব বেশি ফেল করে"। কেমন করে চর্চার মাধ্যমে বাংলার সে ভুল শুধরে নেওয়া যায় সে সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের অভিমত, "বাংলা নিজের ভাষা বলে প্রায় ছেলের কাছেই খুব সম্ভব হাতের পাঁচ হিসেবে গণ্য। সেটা ভুল। এ ভাষাও মন দিয়ে শেখা দরকার। বাঙালী ছেলেরা প্রায়ই যে স্বাচ্ছন্দ্যে বাংলা বলে যেতে পারে, কিন্তু লিখতে গেলে ঠেকে যায়, ভুল করে, অদ্ভুত কাঁচা বাংলা খাড়া করে। এর কারণ খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তারা যে বাংলা বলছে তাও প্রায়ই ঢিলে ও অসংলগ্ন। আমার মনে হয়, কোনো কোনো সময় ইংরেজির চেয়ে ঢের বেশি হিসেব করে বাংলা লেখা উচিত। আধুনিক বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ থেকে আজ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইগুলি পড়ে দেখা দরকার; রবীন্দ্রনাথ ও তার পরের আধুনিক বাংলার সচল ও সৎ তাৎপর্যের সঙ্গেই বেশি পরিচয় থাকলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে বলে আমার মনে হয়। শুধু পড়ে বা বলে নিজের ভাষাও শেখা যায় না—যতদূর সম্ভব লিখে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে হয়"। (শিক্ষা ও ইংরাজি)

একথা সত্য, জীবনানন্দের প্রবন্ধে কিছু কিছু প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু শুধু সে কারণেই সেসব প্রবন্ধকে অবহেলা করা চলে না। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আলোচনাতেও একই ধরনের প্রসঙ্গ যুক্তি হিসাবে উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে সহজেই প্রতীয়মান হয় সাধারণ শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব, অব্যবস্থা, সে-অব্যবস্থার কারণ ইত্যাদি ভাবনাগুলো ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। ভাবলে বিস্ময় হয়, আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ইংরেজি শিক্ষার দুরবস্থাকে তিনি যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দুঃসাহসীভাবে তাই ছাত্রদের ইংরেজি শেখার পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা উচ্চারণ করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। 'শিক্ষা ও ইংরেজি'তে "স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যে পাঠ্য ও পদ্ধতি চলে আসছে তার অনেকখানি বদলে ফেলে ইংরেজি ভাষা শেখাটাকে ছেলেদের কাছে সুস্থ, আধুনিক ও রচিকর করে তোলা দরকার" বলে যে অভিমত তিনি ব্যক্ত করেন তা আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দকে একজন অগ্রসর শিক্ষক হিসাবেই পরিচিত করায়। শুধু ভাষা-শিক্ষক হিসেবেই নয় 'শিক্ষা'র একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে তাঁর পরিণত ভাবনা ঈর্ষণীয়। আর তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় তখন তিনি বলেন, "শুধু ভাষা শেখা—এমনকি ভালো করে শেখার সঙ্গে শিক্ষার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু কোনো একটা বড় ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে উল্লেখ্য তেমন কোন শিক্ষা কেউ পেতে পারে বলে মনে হয় না"। (শিক্ষা ও ইংরাজি)

ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থতা নিয়ে জীবনানন্দ দাশের ভাবনা আমাদের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতেও বিশেষ অর্থবহ। দেশে ইংরেজি শিক্ষার বর্তমান হাল যে কোন শিক্ষিত



www.pathagar.com

মানুষকে উদ্বিগ্ন না করে পারে না। আশৈশব আমরা শুনে আসছি উদ্বেগজনক এ অবস্থা নাকি শুরু হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে। পাকিস্তান আমলে নাকি ইংরেজি শিক্ষার অবস্থা এমন নড়বড়ে ছিল না। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে (সবকটিই ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সালের ভেতর লেখা) আমরা কিন্তু 'প্রতি প্রজন্মই মনে করে, তার সমসাময়িক কর্তৃত্ব অবাচীন প্রজন্মের চেয়েও অনেক উন্নত'[১০] সে কারণে। বর্তমান শতাব্দির শুরুর বছরগুলোতে, অর্থাৎ যখনকার ইংরেজি নিয়ে জীবনানন্দ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রবন্ধগুলোতে, তখনকার ইংরেজি শিক্ষার বেহাল নিয়ে একটি মন্তব্য উল্লেখ করে এ আলোচনা শেষ করব। ১৯২০ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বললেন, "ইংরেজির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ছেলে-মেয়েরা ইংরেজিও শিখছে না এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভও করতে পারছে না। ছেলে-মেয়েরা প্রধানত মুখস্থ করে শিক্ষার কাজ শেষ করছে।"[১১] তাহলে? অন্য বিষয়টি হলো, জীবনানন্দের পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়েছে কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে আমাদের দুরবস্থা এখনও একই রকম।

তথ্যসূত্র


১. আর্নল্ড টয়েনবি ও দাইসাকু ইকেদা, *সজনমূলক জীবনের দিকে : একটি কথোপকথন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি, ১৯৯৮ পৃ. ৫০

২. দ্রষ্টব্য : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তাকে সহকর্মী হিসেবে দেখেছি, *কোরিক সাহিত্য পত্রিকা*। সম্পা, তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ রায় বর্মণ), শারদ ১৯৯৪ জীবনানন্দ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৩১৯

৩. দ্রষ্টব্য : অশোকানন্দ দাশের 'জীবনস্মৃতির ভূমিকা', *অনুষ্টুপ* (সম্পা, অনিল আচার্য), জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ৬৫,৬৬

৪. অরুণ সেন, জীবনানন্দ দাশ : জীবনী, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯

৫. অশোক মিত্র, জীবনানন্দ প্রসঙ্গে, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

৬. প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোরের আলোয় উজ্জ্বল, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৩০৪

৭. লাবণ্য দাশ, মানুষ জীবনানন্দ, *অনুষ্টুপ* জীবনানন্দ সংখ্যা, প্রাগুক্ত. পৃ. ৯৯

৮. দ্রষ্টব্য : গোপালচন্দ্র রায়ের 'জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচয়', *অনুষ্টুপ* জীবনানন্দ সংখ্যা, প্রাগুক্ত

৯. সুব্রত রুদ্র, *প্রবন্ধকার জীবনানন্দ*, , কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২৮

১০. সুব্রত রুদ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০। পরবর্তী বাক্যগুলো এমন 'জীবনানন্দের এই রচনায় এই ধারণার সমর্থনে এবং বিরুদ্ধেও বেশ কিছু বিতর্কসাপেক্ষ মন্তব্য আছে। আসলে এই ধারণায় যার বস্তু যতটা আছে, আমার বস্তু ঠিক ততটাই থেকে যায়'

১১. সুখময় সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা: বাঙালির শিক্ষাচিন্তা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃ. ১০১-১০২


মাসিক *শিক্ষাবার্তা* (সম্পা: আফরোজান নাহার রাশেদা, ঢাকা)-এ জুন ২০০০-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# ইংরেজি শিক্ষা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে পদ্ধতি প্রসঙ্গ

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভারতবর্ষ তথা বাংলাভাষী অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার পর দুইশত বছর পার হয়ে গেছে। এর উপযোগিতা এবং সে প্রশ্নে সকল শিক্ষার্থীর জন্য তা বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিতর্কের সূচনা করলেও সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার এবং বর্তমান বছরগুলোতে ইন্টারনেট ও ই-মেলের যোগাযোগ প্রাচুর্য হয়তো খুব শ্রীঘ্রই গোটা জাতিকে এমন একটি সর্বজন গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত করবে যে ইংরেজি শেখা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই এবং তা সকল শিক্ষার্থীর জন্যই বাধ্যতামূলক করা উচিত। যদিও বর্তমান সরকারি সিদ্ধান্ত সামান্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতেই রয়েছে। তবে আবশ্যিকতা প্রশ্নে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই এমনটি অনুমানে কোন অযৌক্তিকতা দেখি না। কিন্তু আমাদের জন্য যেটি প্রধানতম সমস্যা তা হলো আবশ্যিকভাবে চৌদ্দ বছর ইংরেজি শেখার পর শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে এ ভাষার দক্ষতাগুলোকে আয়ত্ত করতে পারছে না। বিভিন্ন জরিপে এ সংক্রান্ত চিত্রটি বড় হতাশাব্যঞ্জক। বিদেশি ভাষা শেখা ও শেখানোর প্রাচীনতম পদ্ধতি গ্রামার-ট্রানশ্লেসন পদ্ধতিকে আমরা একশ নব্বই বছরের মত ব্যবহারের পর গত এক দশক ধরে Communicative Approach-কে ইংরেজি শেখানোর উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হলেও প্রত্যাশা যেন কিছুতেই পূরণ হবার নয়।

আমাদের ইংরেজি শেখার ইতিহাস দীর্ঘ হলেও ব্যর্থতা বোধ করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত এমন তীব্র করে আর কোন বাঙালি মনীষী বোঝেন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এজন্য টানছি যে বাংলাভাষী মানুষের ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রচেষ্টা ও তার ব্যর্থতা এবং সবশেষে সে ভাষা শেখানো সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর সময়কালে প্রচলিত গ্রামার-ট্রানশ্লেসন পদ্ধতিতে তিনি নিজে ইংরেজি শিখতে গিয়ে কম বিপাকে পড়েন নি। আর তাই ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের পর সে স্কুলের জন্য ইংরেজি শিক্ষাদানের যে বইটিকে তিনি রচনা করেছিলেন তা মোটেও গ্রামার-ট্রানশ্লেসন পদ্ধতিতে রচিত নয়। পরবর্তীকালে তিনি এ প্রয়োজন পূরণোর জন্য আরও গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা বা তার পরেও তিনি সে সকল গ্রন্থাদি বারবার পরিমার্জনা করেছেন।[১] ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেও ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতির



www.pathagar.com

ব্যাপারে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ হয় নি। সেসব কার্যক্রমের শক্তি তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? ১৮৯২- রচিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতার বিবরণ তার ভেতর কি?

> ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত কোন প্রকার মিল নাই। তাহার 'পরে আবার ভাববিন্যাস ও বিষয় প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মবার পূর্বেই মুখস্ত আরম্ভ করতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিবার ফল হয়। ...
>
> আবার নিচের ক্লাশে যে সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এনট্রেনস্ পাস্ কেহ বা এনট্রেন্স্ ফেল, ইংরেজি ভাষা, ভাব, আচার-ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করিয়া থাকে। তাহারা না জানে বাংলা না জানে ভাল ইংরেজি...(শিক্ষার হেরফের)।

ইংরেজি শেখা ও শেখানোর বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ এমন করে ভেতর থেকে দেখেছিলেন বলেই তিনি তা শেখানোর জন্য নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারে উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি যে পদ্ধতির আবিষ্কারে উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি যে পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখা শুরু করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও সকল ব্যথতা নিয়েই ঐ একই পদ্ধতি ছিল আমাদের উপায়। বিংশ শতাব্দী জুড়ে পৃথিবীর দেশে বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতির যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, সেসবের ধারে কাছেও আমরা পৌছতে পারি নি। যে প্রশ্নটি বারবার আমাদেরকে বিদ্ধ করেছে তা হলো ইংরেজিকে বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো হবে কি হবে না। সাথে লেজুড় আর যে একটি প্রশ্ন ছিল তা হলো কোন্ শ্রেণী থেকে কোন্ শ্রেণী পর্যন্ত একে বাধ্যতামূলক করা হবে। বাধ্যতামূলক হিসেবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলেও যে সফলভাবে শিক্ষার্থীরা তা শিখছে না তা অনুধাবন করা গেলেও সফলতা প্রশ্নে অন্য কোন উপায় সন্ধান করা চলে কিনা তা বিবেচ্য হয় নি কখনও।

বাঙালির ইংরেজি শেখা শুরু হয়েছিল ইংরেজ বণিকদের সাথে কথাবার্তার প্রয়োজনে। '১৭৭৪ সনে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ইংরেজি শিক্ষার অর্থকরী শক্তি বেড়ে যায়'।[২] তেমন এক প্রেক্ষাপটেই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার Chronicle Press থেকে প্রকাশিত হয় *An Extensive Vocabulary* গ্রন্থটি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার বিবরণটি পড়লেই পাঠক অনুমান করতে পারবেন এর ভেতরের বিষয় সম্পর্কে। প্রচ্ছদ পৃষ্ঠাটি[৩] হলো 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি /AN EXTENSIVE/VOCABULARY/Bengalese English/ VERY USEFUL/ TO TEEACH THE NATIVES ENGLISH/ AND/ TO ASSIST BEGINNERS IN LEARNING/ THE BENGAL LANGUAGE'-এভাবে Vocabulary বইয়ের মাধ্যমে বাঙালির ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে আরও একটি



www.pathagar.com

Vocabulary বই[৪]-এর প্রকাশের কথা জানা যায়। তবে ইতোমধ্যে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত John Miller-এর *The Tutor* গ্রন্থটি 'is possibly the earliest textbook for the teaching of English is what today would be called the Third World'[৫] *The Tutor*-এ কথোপথনের ইংরেজি বাংলা Translation গ্রন্থিত হয়েছিল। তৎকালীন যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যেমন Vocabulary-র বইয়ের মাধ্যমে বিদেশি ভাষা শেখানো হতো, বাংলাভাষী অঞ্চলেও তার খুব ব্যত্যয় ঘটে নি। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে জগমোহন বসু কর্তৃক কলিকাতা বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করা হলে ইংরেজি শেখার গুরুত্ব অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যায়। প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন বইও প্রকাশিত হতে থাকে। ইংরেজি শেখানোর জন্য ততদিনে এ অঞ্চলে Grammar-Translation method প্রচলন পেয়ে গেছে। সে পর্যন্ত ইংরেজি শিখানোর পদ্ধতি নিয়ে খুব বেশি পশ্চাৎপদতার সুযোগ ছিল না। কেননা 'Grammar- Translation dominated European and foreign language teaching from the 1840s to the 1940s and in modified form it continues to be widely used in some parts of the world today'[৬]; সমস্যাটি হলো 'In some parts of the world' এর মধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝমাঝি থেকেই বহির্দেশীয় যোগাযোগ বৃদ্ধির কারণে 'Oral proficiency'-র গুরুত্ব বেশি অনুভূত হওয়ায় Grammar-Translation method-এর বিপরীতে ভিন্নধারার আবির্ভাব ঘটতে থাকে। ১৮৬০ এর শেষ দিকেই Natural Method-এর বিকাশ ঘটে যা পরবর্তীতে Direct Method-এর সামান্য ভিন্ন অবয়ব নিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। আরও পরে ১৯৩০-এর দিকে Oral Approach বা Situational Language Teaching এর উদ্ভব যা মোটামুটি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল যখন Communicative Language Teaching-এর প্রকাশ ঘটে। ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতির সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও Audiolingual Method, Total Physical Response, Community Language Learning প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োজন ও সময় ভেদে বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে বিদেশি ভাষা শোনানোর পদ্ধতিতে এত পরিবর্তন ঘটলেও বাংলাভাষী অঞ্চলে তার ছাপ খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। কখনও কখনও ব্যক্তিগত বা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানগত পর্যায়ে নতুন পদ্ধতির ব্যবহার ঘটলেও স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে তা গৃহীত হয় নি। আর তাই নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বাংলাদেশের যখন হঠাৎ করে পাঠ্যপুস্তকে প্রথম শ্রেণী থেকে Communicative approach -কে অনুসরণ শুরু হয় তখন তা বহুবিধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়।



www.pathagar.com

'A communicative approach opens up a wider perspective on language. In particular, it makes us consider language not only in terms of its structures (grammar and vocabulary), but also in terms of the communicative functions that it performs'[৮] কে communicative approach— এর মূল কথা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। Communicative functions-এর মধ্যে রয়েছে 'such actions as requesting, apologising, narrating, commanding, and expressing dislike'[৯]। আর সে-কারণেই Communicative approach-এ ভাষার চারটি দক্ষতা অর্থাৎ শোনা (listening), বলা (speaking), পড়া (reading) এবং লেখা (writing)-এর উপর সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। সেজন্য 'It is important to note that all the language skills are practised in this lesson, and they are practised in an integrated way. That is, the skills are used not one after another, but communicatively, through speaking, listening, reading and writing as performed in real life situations'[১০] অর্থাৎ Communicative method-এ ভাষার চারটি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া ও শেখা সকলের উপরেই সমান জোর দেওয়া হয়। Grammar এর নিয়ম-কানুনকে মুখস্থ করে আয়ত্ত না-করে ওই নিয়মে রচিত বাক্যকে বারবার Practise করে আয়ত্ত করাতে এ পদ্ধতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর সে কারণেই ভাষার চারটি দক্ষতাকে অধিক চর্চার প্রয়োজন হয়।

এ কথা সত্য এই পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানো নিশ্চয়ই অধিক কার্যকর হবে। তবে এ পদ্ধতি বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র, অনুন্নত দেশে কতখানি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর তা পরীক্ষা করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে Communicative method চালু করার প্রাথমিক শর্তগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। Communicative method - কে প্রয়োগ করতে হলে যেসব শর্ত পূর্বেই পালনীয় সেগুলোকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায় : ১. নতুন পদ্ধতির আলোকে রচিত সমাজ উপযোগী পাঠ্যপুস্তক, ২.Communicative পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত শিক্ষক ৩. শ্রেণীকক্ষে সীমিত ছাত্রসংখ্যাসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং ৪. পরিবর্তিত উপযুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি। এ সকল শর্তের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইংরেজির অধ্যাপক এম, শহীদুল্লাহ বলেন, 'ভাষা শিক্ষার জন্য যে অনুশীলন প্রয়োজন তার জন্যে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম দরকার, পর্যাপ্ত শিক্ষক দরকার, ভাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দরকার যাদের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রয়েছে, শিক্ষাদানের জন্য materials ও আধুনিক সরঞ্জাম যথা Overhead projection, audio-video, equipements, computers, photocopiers ইত্যাদি অবশ্যই প্রয়োজন।[১১] Communicative পদ্ধতিকে



www.pathagar.com

প্রয়োগের এসব শর্তগুলো বাংলাদেশে কতখানি পূরণ করা হয়েছে বা পূরণ করা সম্ভবপর তার বিশ্লেষণ জরুরি।

এবার ইংরেজি শিক্ষার আনুপূর্বিক যে পাঠ্যক্রম তার প্রতি আমরা একটু দৃষ্টি দিতে চাই। শুরু করছি প্রথম শ্রেণীর *Beginner's English One*-এর Lesson- I দিয়ে এর বিষয়বস্তু একটি ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক (শিক্ষিকা) প্রবেশ করছেন এবং শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে আছে। এ অধ্যায় সম্পর্কে শিক্ষককে দেয়া নির্দেশ থেকে জানা যায় ছবির শিক্ষক (শিক্ষিকা) ও শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গে 'Good morning' বিনিময় করছে। সঙ্গে সঙ্গে এটিও বলা হয়েছে, যেন শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষক অনুরূপ বাক্য বিনিময় করেন। এভাবে বইটির প্রথম ১১টি লেসন oral drill/ recitation বা following simple commands বা playing a game নিয়ে। দ্বাদশ অধ্যায়ে মুখে মুখে alphabet শেখার পর পরবর্তী অধ্যায় দুটোতে ছোট ও বড় হাতের alphabet চেনানোর ব্যবস্থা রয়েছে। পঞ্চদশ বা শেষ অধ্যায়ে রয়েছে মনুষ্য শরীরের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও পরিচিত কয়েকটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাম এবং কয়েকটি পশু-পাখির নাম ছবি দেখিয়ে চেনানোর অনুশীলন। বর্তমান নিবন্ধে প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি বইটির অনুপুঙ্খ এমন বিবরণ দেয়ার পেছনে যে কারণটি রয়েছে তা হলো বইটিতে ইংরেজি শেখানোর কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা পাঠককে বোঝানোর চেষ্টা। এ বইসহ দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ইংরেজি বইয়ে ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতি হলো প্রথমে শোনা অর্থাৎ শিক্ষক বলবেন আর শিক্ষার্থী শুনবে, পরে শিক্ষার্থী শোনা বিষয়টি ইংরেজিতে আওড়াবে, এরপর সে পড়তে শিখবে এবং সব শেষে শিখবে লিখতে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত নয়টি ইংরেজি বই এর সকল অংশই যে এ পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানোর জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত তা নয়। তবে উদ্দেশ্যটি একই রকম। কিন্তু এ ধারণাটির মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে। এতে যে ইংরেজি বই সেটি পূর্বোক্ত পদ্ধতির বাইরে। এটি প্রধানত সাহিত্য নির্ভর। শোনা যাচ্ছিল দশম শ্রেণীর পর্যন্ত চালু ইংরেজি বইটির একটি ধারাবাহিক উচ্চতর অধ্যায়কে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য আমরা গত বছরের মধ্যেই পেয়ে যাব। যদিও বাস্তবে তা পাই নি, কবে পাব জানি না। আর ডিগ্রি পর্যায়ের যে সিলেবাস সেটি আরও বেশি ভিন্ন। সাহিত্য অংশ না থাকায় তা হয়েছে আগের শ্রেণীর সঙ্গে সম্পূর্ণই সম্পর্কহীন এবং অন্যদিকে ভাষা শেখানোর জন্য নির্ধারিত টেক্সট বই না থাকায় তা দশম শ্রেণীর গ্রন্থটির সঙ্গে দূরতম সঙ্গতিও বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

বর্তমান অবস্থার আলোকে ইংরেজি ভাষা শেখানোর এ পদ্ধতি কতটুকু সফল হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। শিক্ষক নিজে যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'Good Evening' বলতে অভ্যস্ত নন সেখানে শিক্ষার্থীর Oral practice কতখানি সার্থক হবে?

শিক্ষক প্রশিক্ষণ এ পদ্ধতির অন্যতম আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং পরিতাপের হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে এর চেয়ে আর কোনও বিষয়কে বেশি অবহেলা করা হয় না। ইংরেজি শিক্ষকদের জন্যে সাধারণভাবে অন্যান্য শিক্ষকদের মত সার্টিফিকেট ইন



www.pathagar.com

এডুকেশন (পিটিআই) বা বিএড, এমএড ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণটি নিতান্তই সাধারণ এবং প্রাচীন পদ্ধতি। communicative পদ্ধতির আলোকে ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের এখন পর্যন্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)। বাউবি তার BELT (Bachelor in English Language Teaching) কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজি শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য ১৯৯৭ সালে প্রথম ব্যাচে ভর্তি শুরু করে। কিন্তু এ কার্যক্রমের সফলতা প্রায় শূন্যের কোঠায়। ২০০০ এর অক্টোবরে এর তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চার সেমিস্টারের সর্ব শেষটি সমাপ্ত হতে আর কতদিন লাগবে তা অনিশ্চিত। BELT-এর বাইরে আর যেসব কার্যক্রম শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজটি করছে তারা হলো PERC (Primary English Resource Centres) এবং ELTIP (English Language Teaching Improvement Project)। বাংলাদেশ এবং ব্রিটেনের সরকারদ্বয়ের সহযোগিতায় এ প্রকল্প দুটির ক্ষমতা, কার্যকাল ইত্যাদি সবকিছুই দেশের বিশাল শিক্ষক গোষ্ঠির তুলনায় সীমিত। তুলনায় বৃহত্তর ELTIP-এর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

ELTIP-এর কাজ শুরু হয়েছে ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে। এটি তিন বছরের একটি প্রকল্প। পঁচিশ কোটি টাকার এ প্রকল্পের[১২] প্রথম এক বছর ব্যয় হয়েছে Baseline study-এর কাজে। মূল কাজ অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে ১৯৯৯-এর জুলাইয়ে। পরবর্তী দুই বছরে সর্বোচ্চ কতজন শিক্ষকে এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভবপর? প্রকল্পটির টিম লিডার টম হান্টারের ধারণা ১২,০০০-এর মত ইংরেজি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হবে।[১৩] তাই যদি হয় তাহলে দেশের মোটামুটি ৩৬,০০০ মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি শিক্ষকের সিংহভাগের কি হবে? তাছাড়া আরও যে একটি জটিলতা চলছে সেটাও ব্যাখ্যা করা দরকার। বই চালু হয়েছে Communicative method— এর; কিন্তু শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নি। ফল কতটা শুভ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এবার আসি শ্রেণীকক্ষের প্রাসঙ্গিকতায়। ELT বিষয়ে অভিজ্ঞরা অভিমত দেন একটি শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা, যেখানে Communicative method অনুসরণ করা হবে, কোনক্রমেই ২৫-৩০ এর বেশি হওয়া উচিত নয়। শ্রেণীর আকার নিয়ে সে মতদ্বৈততা নেই তা নয়। টম হান্টার বলেছেন, 'I have taught, and have seen taught, classes of 200 or more with communicative methodology.[১৪] যেহেতু শ্রেণীটি হবে মূলত Practice-based দ্বিতীয় মতের কার্যকরীতা নিয়ে সন্দেহ করা চলে সহজেই। যদি প্রথমটি অর্থাৎ ২৫-৩০ জন ছাত্রের একটি শ্রেণী আদর্শ শ্রেণী হয় Communicative method-এর জন্য তবে বলতেই হয় বাংলাদেশে এমন একটি পরিবেশ আমরা বোধ হয় কোনদিনই অর্জন করতে পারব না। কেননা, দিন যত যাচ্ছে শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকারি তাগিদও বৃদ্ধি পাচ্ছে সে পরিমাণে। ১৯৯৫-



www.pathagar.com

এর ২৪ অক্টোবর প্রণীত মাধ্যমিক স্কুলের জনবল কাঠামো অনুযায়ী সেকশনের জন্য ছাত্রসংখ্যা ধরা হয়েছে ৬০, অর্থাৎ আর এক ৬০ না হওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১১৯ জনকে একই শ্রেণীকক্ষে ঠেসে বসিয়ে পাঠদান করতে হবে। ...যদি কোন স্কুল নিজ উদ্যোগে ছাত্রসংখ্যা ৬০ পূর্ণ হওয়ার আগেই নতুন সেকশন সৃষ্টি করে তা হলে অতিরিক্ত শিক্ষকের আর্থিক দায়িত্ব স্কুলকেই বহন করতে হবে, সরকার তা বহন করবে না।[১৫] আর সঠিক চিত্রটি হলো এমন সংখ্যক ছাত্র নিয়েই প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের দ্বারা চলছে Communicative method of teaching English। আর সুপরিসর জায়গাবিহীন, ইংরেজির পর্যাপ্ত শিক্ষকবিহীন অধিকাংশ বাংলাদেশী স্কুল-কলেজে teaching learning material বলতে চক ও ডাস্টারের অধিক আর কিছু কল্পনা করাও অসাধ্য।

Communicative method-এর সর্বশেষ শর্তকে আমরা সম্পৃক্ত করেছিলাম পরীক্ষার সঙ্গে। বইটি হবে নতুন পদ্ধতির আর পরীক্ষা হবে পুরানো পদ্ধতিতে তা তো হয় না। শেখানোর পদ্ধতি হিসেবে শোনা-বলা-পড়া ও লেখাকে গুরুত্ব দিলেও পরীক্ষাতে ছাত্রের শুধু পড়া ও লেখার উপর Test নেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এমন বিষয় দেয়া হয় না যা আয়ত্ত করা জ্ঞানার্জনে সত্যিকারের কোন ভূমিকা রাখে না কিন্তু নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়। এতে ছাত্র ভাষা শেখার চেয়ে গ্রন্থের বিষয়বস্তু মুখস্থের প্রতি উৎসুক হয়।

এ ব্যর্থতা থেকে মুক্তির প্রধান যে উপায় সেটি ছিল শিক্ষককে ইংরেজি শোনা ও বলার ব্যাপারে প্রয়োজনীয়ভাবে দক্ষ ও উৎসাহী করা (কিছু ইংরেজি শিক্ষক নিশ্চয়ই আছেন যাদের এ দুটি দক্ষতা প্রশংসনীয়। তেমন নগণ্য সংখ্যককে আমরা বিবেচনায় আনছি না)। তবে শিক্ষক নিজে যেহেতু তাঁর শিক্ষা জীবনে ইংরেজি শোনা ও বলা শেখার বিশেষ সুযোগ পান নি, কেননা সে সময় ইংরেজি শেখার এ পদ্ধতি ছিল না, তাই তাদের অধিকাংশের পক্ষে এ দুটি ব্যাপারে সংকোচ ও দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক। ইংরেজি শেখানোর বর্তমান পদ্ধতিতে এটি একটি মারাত্মক ত্রুটি যে, শিক্ষককে তৈরি না করেই তাঁর হাতে এমন একটি পাঠ্যক্রম তুলে দেওয়া হয়েছে যার পদ্ধতি প্রয়োগে তিনি অধিকাংশতই অপরাগ। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। প্রতি শিক্ষাবর্ষের শেষে যখন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ থাকে সে সময় ১০/১৫ দিনের জন্য সরাসরি এ বিষযে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ছাড়া সুবিধাজনক সময় (দৈনিক সন্ধ্যার পর বা শুক্রবার) বেতার ও টেলিভিশনেও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলতে পারে। এ সকল পদক্ষেপের পর চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বর্ষশেষে সশরীরে উপস্থিত থেকে করানোর ব্যবস্থাও করা সম্ভব। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেননা প্রথম পাঁচ বছরে শিক্ষার্থী যদি Oral Practice-এর আসতে না পারে তাহলে পরবর্তীকালে সে সহপাঠীদের সামনে এটি করতে সংকুচিত হবে এবং তা তার শিক্ষাকে ব্যাহত করবে। ইংরেজি শিক্ষক-প্রশিক্ষণের এ উদ্যোগে ক্রমান্বয়ে মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।



www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর পর্যায়কে গুরুত্ব দিয়ে যদি তার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া যায় তবে নিশ্চয়ই আমরা সুফল পাব। শিক্ষক নিজে যদি শ্রেণীর পাঠ্যসূচিকে ইংরেজিতে সহজভাবে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন তবে ভাষা শেখানোর এ পদ্ধতি অনেকখানিই অসফল হবে। এছাড়া শ্রেণী অনুযায়ী ইংরেজি শিক্ষার ক্লাস রেডিও টেলিভিশনেও প্রচার করা সম্ভব। পূর্ব ঘোষিত সময়ে দিবাভাগে সপ্তাহে এক শ্রেণীর জন্য একদিন করে চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের একট ক্লাস প্রচার করা যেতে পারে যেখানে একটি Lesson -এর oral practice স্থান পাবে। এতে সুবিধে হবে এই: একই সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দু'জনেই উপকৃত হবেন। শিক্ষক ইংরেজি শেখানোর এ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগে অভিজ্ঞ হবেন, আর শিক্ষার্থী তার পাঠ শিখবে।

ব্যাপারটি অনেকের কাছেই অসম্ভব মনে হলেও আসলে তা নয়। বর্তমান স্থানীয় সরকার কাঠামোর প্রতি নির্দিষ্ট গ্রামের জন্য একজন করে মেম্বার রয়েছে। সে মেম্বারের দায়িত্বে একটি করে সাদা-কালো টেলিভিশন কেনার ব্যাপারে প্রত্যেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যা ঐ গ্রামের সকল শিক্ষার্থীর ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। অন্যদিকে বর্তমানে শুক্র ও শনিবারসহ বাকি দিনগুলিতেও বিটিভি সকালে খোলা রাখলে ভাল হয়। প্রয়োজনে দেশের অন্য টিভি চ্যানেলগুলোকেও এ ব্যাপারে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। তা ছাড়া প্রথম থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে থাকা দরকার ইংরেজি শোনা ও বলার পরীক্ষা। শোনা ও বলার জন্য নম্বর বন্টন উচ্চতর শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে পড়া ও লেখার জন্য বরাদ্দ করতে হবে। প্রশ্নপত্র নির্মাণেও দরকার পরিমার্জন। শুধু সেসব বিষয় ছাত্রকে সরাসরি প্রশ্ন করা হবে যা ছাত্রের জ্ঞান সঞ্চয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ছাত্রসংখ্যা কত (নবম-দশম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পূর্ববর্তী গ্রন্থটিতে ছিল) এ প্রশ্ন করা গেলেও তারেক কোন শ্রেণীতে পড়ে সে প্রশ্ন এভাবে করা চলবে না। Comprehensive ব্যবস্থার উদ্যোগটি প্রশংসনীয় হলেও এর ইংরেজি বিষয়ের অবজেকটিভ অংশের ধরনটির পরিবর্তন করতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক ধরনের বর্তমানে প্রচলিত প্রশ্নই থাকবে তবে তার উত্তর দেওয়া থাকবে না। উত্তরের জন্য বরাদ্দ স্থানে ছাত্রকে লিখতে নির্দেশ দিতে হবে। এতে শিক্ষার্থী ভাষা জ্ঞান থেকে উত্তর প্রদানে সচেষ্ট হবে, সঠিক উত্তর আগেভাগে মুখস্থ করা থেকে বিরত থাকবে। আর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য নবম-দশম শ্রেণীর সঙ্গতি রেখে পুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। ডিগ্রি ক্লাসের জন্য আরও ফলপ্রসূ একটি শিক্ষাক্রম নির্মাণ করতে হবে।

Communicative approach-এর প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না করেই একে প্রয়োগ করায় বিরূপ ফললাভ ঘটেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রতিবেশী দেশ ভারতই এমন অসময়োচিত সিদ্ধান্তের ভুক্তভোগী উদাহরণ।

> "CLT which owes a lot of the Natural Method is yet ineffective and unsucessful in India. Even in West Bengal, where the Left Front Government has shown a good will by living scope for experimenting with the CLT method of



www.pathagar.com

English, a luke warm response had been noticed most of the teachers of the Secondary and Higher Secondary level are either inefficient or reluctant to follow the CLT method properly in the class rooms. They teach English only in their own chosen way which is neither CLT nor SLT. The concept is not much clear to them—the concept of the modern CLT approach to English. They accept the SLT method and yet they teach in the CLT method.[১৬]

পশ্চিমবাংলার এ অভিজ্ঞতা Communicative method প্রয়োগে আমাদেরকে পূর্ব সতর্কতা জানায়। যেহেতু ভাষা শেখা অর্থ হল এর সকল দক্ষতাকে (Skill) ব্যবহারের চেষ্টা তাই Communicative method-ই যথাযথ উপায়। কোন শ্রেণী থেকে ইংরেজি পাঠ করা উচিত, সেটি আবশ্যক হিসেবে পাঠ্য হবে কিনা এসব বির্তক থেকে বিরত হওয়ার সময় বোধ হয় এসেছে। আমরা উপলব্ধি করছি ইংরেজি শেখাটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে ইংরেজি শেখার বিকল্প নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে এ ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে যেন ইংরেজির পক্ষে অতি উৎসাহী লোকজনের উদ্ভট আহ্বানে আমরা গা ভাসিয়ে না দেই। দেশটি বাংলাদেশ, রাষ্ট্রভাষা বাংলায় যে দেশে সকল মানুষ কথা বলেন সেখানে কেন 'সরকারি-বেসরকারি অফিসসহ সকল অফিসে আগের মত ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষার ব্যবহার চালু করতে হইবে। রাষ্ট্রের সকল ফরম ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় ছাপাইতে হইবে।'[১৭] যেমন 'নিচের শ্রেণীসমূহের না হলেও অন্তত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ডিগ্রি পাস ও অনার্স ক্লাসসমূহে সকল বিষয়ের শিক্ষাদান ও পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হতে হবে'[১৮] বলে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাকে হাস্যকর এবং অগভীর ভাবনাজাত বলেই মনে হয়।

বর্তমান পদ্ধতি রচনাকালে নতুন শিক্ষানীতি মন্ত্রিপরিষদের সভায় অনুমোদন লাভ করে সংসদে উপস্থাপনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। নতুন শিক্ষানীতির লক্ষগুলোকে অর্জন করার জন্য বারো বছর সময় লাগবে বলে ধারণা করা হয়েছে, আর তার জন্য প্রাক্কালিত ব্যয় ধরা হয়েছে, ৩০ হাজার কোটি টাকা।[১৯] সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি-শিক্ষা বিষয়টি তুলনামূলক অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলেও দেশের শিক্ষিত মানবসম্পদকে অধিকতর উপযোগী করে গড়ে তুলতে ইংরেজির গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সঠিক পদ্ধতির মাধ্যম সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারাই সে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। পদ্ধতি হিসেবে Communicative approach এর সামগ্রিক সাফল্য অনস্বীকার্য। সঠিক ব্যবস্থাপনার ভেতরে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজটি সম্পন্নপ্রায়। আগামী ২০০২ সালের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বই Communicative approach রচিত হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষের বিশালতা সমস্যাটি তাড়াতাড়ি সমাধান হবার নয়। Audio-video-



www.pathagar.com

computer সজ্জিত শ্রেণীকক্ষ বাংলাদেশের জন্য এক অবাস্তব স্বপ্ন। তাই টেলিভিশনকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে এ স্বপ্নকে অন্যভাবে পূরণের কথা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। সবশেষে, পরীক্ষায় listening ও speaking test-এর জন্য সম্ভব মৌখিক পরীক্ষার (practical) অন্য কোন বিকল্প বর্তমানে নেই। তবে সে-সকল কার্যক্রমকে সফল করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করা। প্রচুর মূল্য দিয়ে হলেও দেশের সকল ইংরেজি শিক্ষককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইংরেজি শিক্ষাদানের পদ্ধতির ব্যাপারে সচেতন ও সক্রিয় করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণবিহীন একজন শিক্ষকের নিকট Communicative approach-এ রচিত একটি গ্রন্থ আপাতভাবে অনুপযুক্ত, বড় একটি ক্লাস অধিকতর অসফল, ইংরেজির জন্য মৌখিক পরীক্ষা একটি হাস্যকর প্রস্তাবনা। PERC ও ELTIP-র কার্যক্রমকে আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত ও দীর্ঘ মেয়াদী করে, কলেজ-পর্যায়ের ইংরেজি শিক্ষকদেরকে Communicative approach-এর প্রশিক্ষিত করার জন্য অতিরিক্ত আরও একটি প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক-প্রশিক্ষণের কাজটিকে এমনভাবে ত্বরান্বিত ও প্রসারিত করা প্রয়োজন যেন কলেজ পর্যায়ের নতুন ইংরেজি বইটি আসার আগেই অন্তত কলেজ শিক্ষকদের সবাই পদ্ধতিটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। কেননা, কলেজ-পর্যায়ের বিশাল ইংরেজি ক্লাসগুলো যদি প্রশিক্ষণবিহীন ইংরেজি শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হতে থাকে হবে Communicative approach-এর সুবিধার চেয়ে এর অকার্যকারীতাই আমাদের সামনে প্রকট হবে। ইংরেজি শিক্ষায় গত দুশ' বছরে বাঙালি যে ব্যর্থতা তার পুনরাবৃত্তিই ঘটবে মাত্র।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য :

১. শিক্ষার্থীদের সহজবোধ্য উপায়ে, অধিকতর ফলপ্রসূ প্রতিবেশের একটি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে প্রথম যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা হল *ইংরাজি-সোপান*। গ্রন্থটি প্রথমে বোলপুর স্কুলে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পরীক্ষিত হবার পর ১৯০৪ (প্রথম খণ্ড) এবং ১৯০৬ (দ্বিতীয় খণ্ড) এ প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটিতে ছিল : উপক্রমনিকা ও *ইংরাজি-সোপান* প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় খণ্ডের দুটি অংশ হল *ইংরাজি-সোপান* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ *ইংরেজি-সহজশিক্ষা* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ইতোমধ্যে ১৯০৯-এর প্রকাশ পায় *ইংরাজি-পাঠ* গ্রন্থটি যা *ইংরাজি-সোপান*-এর প্রাগ্রসর একটি গ্রন্থ। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ *অনুবাদ-চর্চা* নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন সেটিও ইংরেজি শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ছিল।

ইংরেজি শিক্ষার জন্য রচিত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলো পর্যালেচনা করলে স্পষ্ট হয় তিনি প্রচলিত Grammar-Translation method এ বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ সক্রিয় করার কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। সমকালীন যুগে আধুনিকতম ও সর্বোচ্চ ফলদায়ী এ পদ্ধতিতে শোনা ও বলার ভেতর দিয়ে ছাত্রকে ইংরেজির সাথে পরিচয়ের সুযোগ করা হয়। এ পদ্ধতি যে শুধু ভারতবর্ষীয়দের নিকটই অভিনব ছিল তাই নয়। বিদেশী



www.pathagar.com

ভাষা শেখানোর পদ্ধতির ইতিহাসেও তা ছিল যুগান্তকারী। রবীন্দ্রনাথের এ পদ্ধতির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য পরবর্তীতে Total Physical Response (TPR) পদ্ধতিতে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

২. সুখময় সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা : বাঙালির শিক্ষাচিন্তা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ০১

৩. প্রচ্ছদ পৃষ্ঠাটি Mofakhkhar Hussain Khan রচিত *Tle Bengali Book, History of Printing and vice versa* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯)-এর ৪৮৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

৪. বইটি হলো H. P. Forster রচিত *A Vocabulary in two parts, English and Bongalee and Bookmaking* (তদেব, পৃ. ৪৮৯)- মুদ্রিত হয়েছে।

৫. A. P. R. Howatt-এর *A History of English Language Teaching* (Oxford University Press, Hong Kong, Second Impression 1985. P-69) গ্রন্থে "The Totor"-এর caption দ্রষ্টব্য।

৬. Jock C. Richrds and Theodore S. Rodgers, *Approaches and Methods in Language Teaching*, Cambridge University Press, low Price Edition 1995, P-04

৭. David Crystal তাঁর *An Encyclopedic Dictionanry of Language and Languages'* (Blackwell Publishers, UK, 1992) গ্রন্থে Natural Approach এবং Direct Method সম্পর্কে বলেন,

Natural Approach : 'claims to follow the principles used by children in learnig their first language, emphasizing the primary role of speaking and listening, and the use of everyday objects and activities, (p. 263)

Direct Method : 'A Method of language teaching in which students speak only in the target language in the classroom. The teacher communicates with the students in as direct a way a possible, using mime, gestures, and other cues. The method avoids the conscious learning of grammar, and leaves work on reading and writing until after speaking and listening skills are well established (p. 106).

8. William Littlewood, *Communicative Language Teaching*, Cambridge University Press, Uk, Eighteenth printing 1998, Page x

9. David Crystal, ibid. p. 79

M S Hoque et el. *English Language Teaching and Learning in Bangladesh*, Bangladesh Open University, Gazipur. 1997. p. 78.

১১. এম শহীদুল্লাহ, বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম ও কিছু প্রসঙ্গকথা, *মাসিক শিক্ষাবার্তা* (সম্পা, আফরোজান নাহার রাশেদা) দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা পৃ. ১১

১২. রাশেদ আহমেদ, শিক্ষকদেরই ইংরেজি মান উন্নয়নে ২৫ কোটি টাকার প্রকল্প, *দৈনিক সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮



www.pathagar.com

১৩. বর্তমান লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে টমহান্টার এ তথ্য দেন। সাক্ষাৎকারটি 'International conference or ELT promises good result' শিরোনামে দৈনিক *The Independent* (জানুয়ারি ২৯,১৯৯৯)-এ ছাপা হয়

১৪. Tom Hunter. Effective English Teaching. The daily Independent, June 24, 1998.

১৫. হেনা দাস, বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতি কেন এ অবিচার, *মাসিক শিক্ষাবার্তা* (সম্পা, আফরোজান নাহার রাশেদা), একাদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ১৯

১৬. Ratan Bhattacharjee. Teaching of English in India : The Situational Approach Vs the Communicative Approach, *Journal of Education*, Rabindrabharati University. Vol. 11. No 1. March 1997. p. 22

১৭. মোহাম্মদ সেলিমউল্লাহ, ইংরেজি ভাষা প্রচলন প্রসঙ্গ, একটি ভিন্ন অভিমত, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯৯৮

১৮. এম শহীদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩

১৯. দ্রষ্টব্য ৩ অক্টোবর, ২০০০-র প্রকাশিত *দৈনিক জনকণ্ঠ* পত্রিকার রিপোর্ট 'জাতীয় শিক্ষানীতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন'

প্রবন্ধটি বিভিন্ন খসড়ার পর বর্তমান রূপে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল *বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা* (সম্পা: হোসনে আরা শাহেদ, ঢাকা, ২০০২) গ্রন্থে। এর আগে দৈনিক *মুক্তকণ্ঠ* (৩ মার্চ ১৯৯৮)-এ 'ইংরেজি শিক্ষা : একটি পর্যালোচনা', মাসিক *শিক্ষাবার্তা* (সম্পা: আফরোজান নাহার রাশেদা, ঢাকা, জুন ১৯৯৯)-এ 'প্রসঙ্গ : বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা', দৈনিক *বাংলাবাজার পত্রিকা* (১৯ জুন ১৯৯৯)-এ 'বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও কমিউনিকেটিভ মেথড: একটি পর্যালোচনা' এবং দৈনিক *প্রথম আলো* (২৯ অক্টোবর ১৯৯৯)-এ 'ইংরেজি শিক্ষাদানে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব'-এ প্রবন্ধটির খণ্ডিত ভাবনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল।



www.pathagar.com

# একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন ইংরেজি বই

২০০১-'০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নতুন ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা হয়েছে। নতুনভাবে লিখিত এবং ইতোমধ্যে প্রচলিত *English for Today* সিরিজের এ গ্রন্থটি পূর্বে প্রচলিত সাহিত্যভিত্তিক গ্রন্থটি থেকে মৌলিকভাবে আলাদা এবং Grammar-Translation ভিত্তিক না হওয়ায় অভিভাবক ও অধ্যাপক মহলের ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ভাষা শিক্ষাভিত্তিক এ গ্রন্থটি বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার সফলতম পদ্ধতির আলোকে রচিত হওয়ায় এ সকল সমালোচনা। যদিও বাস্তব প্রেক্ষাপটকে স্বীকার করলে এবং আধুনিক পদ্ধতিকে গ্রহণের মানসিকতাকে অর্জন করলে আমাদের মানতেই হবে এ পাঠ্যপুস্তকটি সামান্য কিছু ভুলত্রুটি ব্যতিরেকে যথেষ্ট পরীক্ষিত ও চিন্তালব্ধ ফসল। বহুল ব্যবহৃত এবং তুলনামূলকভাবে অসফল পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতি Grammar-Translation থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি বাংলাদেশের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক রচনার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সামগ্রিকভাবে এ গ্রন্থটির আলোচনা করতে যাওয়ার পূর্বে প্রথমে ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এ জন্য যে, ইংরেজির অনেক অধ্যাপক এবং শিক্ষিত অভিভাবককেই বলতে শুনেছি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কি পূর্বের পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখেন নি? লক্ষ করা যেতে পারে শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক চিন্তার একটি বিরাট অংশ হল ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গ। বাঙালির ইংরেজি শিক্ষার নিরস পদ্ধতিতে তিনি ছিলেন রীতিমত উদ্বিগ্ন। তাই ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত বোলপুর বিদ্যালয়ের জন্য তিনি একটি ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। নিজ স্কুলে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি *ইংরেজি সোপান* নামের সে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১৯০৪ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। পরিবর্ধিত আকারে প্রথম খণ্ডের "উপক্রমণিকা" অংশটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে *ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা* এবং প্রথম খণ্ডের 'প্রথম ভাগ' ও দ্বিতীয় খণ্ডের 'দ্বিতীয় ভাগ' অংশদ্বয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে *ইংরেজি সহজ শিক্ষা* নামে পুনঃপ্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শিক্ষাদান নিয়ে তাঁর গ্রন্থগুলোতে যে পদ্ধতির অবতারণা করেছিলেন তা বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রচারিত 'Communicative Approach' না হলেও এর পূর্বসূরী 'ডিরেক্ট মেথড'-এরই



www.pathagar.com

নিরীক্ষা। ইংরেজি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সে প্রয়াসের একশত বছর পরও হয়তো আমরা Grammar-Translation পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই, যা আমাদের পশ্চাতপদতারই ইঙ্গিতবাহী। আর তাই গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ নির্ভর পূর্বে প্রচলিত গ্রন্থটিকে এর সাফল্য বা ব্যর্থতার কথা চিন্তা না করেই আমরা কেউ কেউ অসাবধানবশত প্রশংসা করে ফেলি।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য রচিত নতুন ইংরেজি বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এতে ভাষার সকল দক্ষতা বৃদ্ধির কথা ভাবা হয়েছে। মুখস্থভিত্তিক না করে শিক্ষার্থীর চর্চার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, শিক্ষকের কার্যক্রম ভাষণ-নির্ভর না করে শিক্ষার্থীকে ইংরেজি শেখায় উৎসাহিত ও চর্চাকে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে চেষ্টা করা হয়েছে বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত ইংরেজির প্রধান ব্যবহারগুলোর সাথে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিতে। এ সকল অভিনবত্ব আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতার বাইরে থাকায় গ্রন্থটি কটু সমালোচনার শিকার হচ্ছে দ্রুত। কোনো কোনো মহল থেকে এটিকে প্রত্যাহার করার প্রস্তাবও করা হয়েছে বলে শোনা যায়।

সারা পৃথিবীতেই বর্তমানে বিদেশি ভাষা শেখানোর উপায় হিসেবে Communicative Approach-এর সাফল্য প্রমাণিত। ভাষার যে চারটি দক্ষতা অর্থাৎ শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-এর সবগুলোই এতে চর্চা করা হয়। বাংলাদেশেও এ আলোকে রচিত গ্রন্থ নিচের শ্রেণীগুলোতে ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে। সে বইগুলোর ধারাবাহিকতায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বর্তমান ইংরেজি বইটি রচিত। শিক্ষার্থীকে বলার ব্যাপারে উৎসাহিত ও উপযোগী পরিবেশ নির্মাণের জন্যই এ পদ্ধতিতে রচিত বইয়ে Pair Work (দুজনে এক সাথে কাজ করার জন্য নির্মিত দল) ও Group work (দুইয়ের বেশি জনের একসাথে কাজ করার জন্য নির্মিত দল) করার জন্য বলা হয়ে থাকে। অধিকাংশ বেঞ্চ-ব্যবস্থার বর্তমান বাংলাদেশে সেটি একই বেঞ্চের দুজন দুজন শিক্ষার্থী বা দুটি বেঞ্চের শিক্ষার্থীকে সামনা-সামনি বসিয়ে কাজ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর মুখ দিয়ে ইংরেজি বের করার এমন সুন্দর ব্যবস্থাকে অনেকেই হাস্যকর বলে মন্তব্য করে থাকেন যা একইসাথে দুঃখজনক ও অজ্ঞতাপ্রসূত।

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় উপযুক্ত শিক্ষকের সহযোগিতামূলক নির্দেশনার মাধ্যমেই এই কথোপকথনের ব্যাপারটি পরিচালিত হবে। ছাত্রের ধারণায় রয়েছে এমন বিষয়কে ভিত্তি করে এ সকল কথোপকথন বেশি ফলপ্রসূ হবে। কেননা মাতৃভাষায় জানা সে বিষয়গুলোর ইংরেজি প্রকাশ তাকে সহজতা দান করবে। কেউ কেউ বলে থাকেন শিক্ষার্থীর এ সকল চর্চা নোটনির্ভরতা বাড়িয়ে দেবে। কেননা সে না পারলে নোট বইয়ের (বাজারে বর্তমানে নতুন বইটির ওপর ভুলে ভরা অন্তত পঁচিমটি নোট-গাইড বই এসেছে) সাহায্য চাইবে। এর জন্য নোট বইয়ের কাছে যেতে হবে কেন? একটা বিষয় নিয়ে 'ডায়ালগ' কি একটা নির্ধারিত ব্যাপার? যারা এমনটি বলেন তাঁরা যে ইংরেজি শেখার ব্যাপারে মুখস্থ করাকেই প্রাধান্য দেন তা স্পষ্ট।

গ্রামার নিয়ে কোনো কথা না থাকায় অনেকেই গ্রন্থটির উপর রুষ্ট। এতে প্রচুর ছবি ব্যবহার প্রসঙ্গেও কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করেন। এসব প্রসঙ্গে হয়তো একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 'Communicative Apporach'-এ ছাত্র-ছাত্রীদের



www.pathagar.com

গ্রামারের নিয়মগুলো সরাসরি না বলে সে নিয়মে রচিত বাক্যের চর্চা করিয়ে ব্যবহার আয়ত্ত করানো হয়। Cambridge University Press থেকে প্রকাশিত Raymond Murphy-র গ্রামার বইগুলোতেই এমন Practice রয়েছে প্রচুর। একই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত Leo Jones-এর *Communicative Grammar Practice* বইটির ছবির সংখ্যা এবং Pair Work ও Group Work-সহ কথোপকথন-এর তালিকা দেখলে বর্তমান বইটি সম্পর্কে সমালোচকদের ধারণা বদলাবে আশা করা যায়। ELBS থেকে প্রকাশিত Geoffrey Leech ও Ian Svartvik রচিত *A Communicative Grammar of English* ও একই পদ্ধতিতে রচিত একটি বই যা বাংলাদেশের ইংরেজি চর্চাকারীদের কাছে প্রশংসিত। উপযুক্ত বইগুলো ছাড়াও আরো যে একটি বই শিক্ষার্থীদের শেখানোর পদ্ধতির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে তেমন একটি সহজলভ্য গ্রন্থ হল Adrian Doff-এর Teach English। এতোগুলো বইয়ের নাম এজন্যই বলা যে এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে গ্রন্থটির বিরুদ্ধের যেকোনো সমালোচক উপলব্ধি করতে পারতেন বর্তমান ইংরেজি বইটি কতখানি যথাযথ :

কেউ কেউ এ গ্রন্থের অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরও বর্তাতে চান। এ প্রসঙ্গে নিশ্চিতভাবে বলা যায় এ বইটি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর ক্ষোভ থাকার কোনো কারণ নেই। কেননা তারা তো এই পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থই দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ছিল। শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও থাকতে পারে। কেননা একথা সত্য যে কলেজের শিক্ষকদের এ বইটি পড়াতে অসুবিধা হচ্ছে, যদিও এর মানে মোটেও এই নয় যে এটি অযোগ্য একটি বই। অসুবিধার কারণ হলো আমাদের দেশের কলেজগুলোর অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষক ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেছেন। ইংরেজিকে বিদেশি ভাষা হিসেবে শেখানোর পদ্ধতির সাথে তাঁরা পরিচিত নন।

এতোক্ষণ নতুন এ পাঠ্যপুস্তকটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো। এবার আসা যাক একে সফল একটি গ্রন্থ হিসেবে কার্যকরী করা প্রসঙ্গে। বইটির প্রকাশক এবং এ সম্পর্কিত দায়িত্ববান অন্যান্যদের জন্য যে পদক্ষেপগুলো আবশ্যক বলে মনে হয় সেগুলো হলো :

১. নতুন ইংরেজি বইটির *Teacher's Guide* বাজারে যতো দ্রুত সম্ভব সহজলভ্য করা, যা বাংলাদেশের কোনো পাঠ্যপুস্তকেরই *Teacher's Guide*-এর ক্ষেত্রে হয়নি। Teacher's Guide পাশে থাকলে শিক্ষকের অসুবিধা অনেকখানি দূর হবে বলে বিশ্বাস।

২. উচিত ছিল বইটি ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট করার পূর্বে শিক্ষকদেরকে এ বইটি পড়ানোর পদ্ধতি বিষয়ে সচেতন করা। ELT (English Language Teaching) বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত ১/২ দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

৩. মোটামুটি ৪/৫টি Simulation Class-এর পাঠদান টেলিভিশনে দেখানো যেতে পারে। বিশাল পাঠকক্ষে শিক্ষক কিভাবে Pair Work ও Group Work বা



www.pathagar.com

অন্যান্য activities করাবেন তাঁর নমুনা প্রদর্শন এমন কিছু অসাধ্য নয়। এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভাষার চারটি দক্ষতার প্রত্যেকটির ব্যাপারে কীভাবে শিক্ষক ছাত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবেন তা স্পষ্ট হয়।

৪. বইটি নতুন হওয়া, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ এটি পাঠদানে কম অভ্যস্ত থাকা এবং সময়ের সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে, বইটির অন্তত ৩০/৪০ শতাংশ সিলেবাসের বহির্ভূত রাখা দরকার যাতে সময়ের সংক্ষিপ্ততার চিন্তায় শিক্ষক প্রেষিত হয়ে পাঠদানের উপযুক্ত পদ্ধতি থেকে সরে না আসেন।

৫. উভয় পত্রের প্রশ্নের সম্ভাব্য সকল নমুনা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করা দরকার। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় চূড়ান্ত ফলাফলের গুরুত্ব সর্বাধিক হওয়ায় নমুনা প্রশ্ন শিক্ষার্থী-শিক্ষক উভয়কেই উৎসাহ দান করবে।

৬. Free writing-এ কোনোক্রমেই শিক্ষার্থীকে মুখস্ত থেকে পরীক্ষা দিতে না পারার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বইয়ের Passage চর্চা করে অনুরূপ Letter/application/paragraph/dialogue/ report-writing ইত্যাদি যাতে সে লিখতে উৎসাহিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে ভবিষ্যতে প্রশ্ন নির্মাণ করতে হবে।

৭. ইংরেজির জন্য একটি ব্যবহারিক নম্বর নির্ধারণ করা প্রয়োজন (আপাতভাবে দেশিয় প্রেক্ষাপটে এটিকে অস্বাভাবিক মনে হলেও এটি প্রয়োজন। এসাথে উল্লেখ করা চলে যে বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কোনো ছাত্র যখন ইংরেজি শিক্ষার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তখন আর এটিকে অস্বাভাবিক মনে হয় না। দেশজুড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যদি বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর ব্যবহারিক নেওয়া যায় তবে ইংরেজির শিক্ষক শিক্ষার্থীর Speaking skill এর পরীক্ষা নিতে পারবেন না কেন? এখানে বলা অপ্রসাঙ্গিক হবে না যে, যখন আমরা উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে অনেকেই অশুদ্ধভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলি এবং ভুল বানান অহরহ লিখি তখন বাংলায় ব্যবহারিক ক্লাস চালুর দাবিকেও অযৌক্তিক বলা যাবে না।)

৮. সম্ভব হলে Listening-কে মূল পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা (এটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হয়তো কম সম্ভব কেননা এটি যন্ত্র নির্ভর।

সবশেষে বলি, আমাদের শিক্ষাঙ্গণে (স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মান ছাড়া) ইংরেজি শিক্ষার অর্থই হলো ভাষাটি শেখা, সাহিত্য নয়। 'সাহিত্য থেকে ভাষা শেখা' উচ্চতর পর্যায়ের ব্যাপার। দীর্ঘদিন ধরে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে সাহিত্যভিত্তিক ইংরেজি বইটি চালু ছিল। এখন সম্ভব হয়েছে সেটি পরিবর্তনের যা কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে একটি অগ্রসরণ। হয়তো গভীর পর্যালোচনায় বইটিতে ছোটখাট ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে (এটি স্বাভাবিক। যেহেতু বইটি প্রথম বারের জন্য রচিত হয়েছে এবং তা সংশোধনও কোনো কঠিন কাজ নয়) কিন্তু তার মানে এই নয় পাঠদানের অসুবিধার কারণে নতুন এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রত্যাহারের প্রশ্ন ওঠে। বরং এ উদ্যোগকে আমাদের স্বাগত জানান উচিত এবং NCTB কে ধন্যবাদ জানানো আবশ্যিক এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য।

মাসিক *শিক্ষাবার্তা* (সম্পা : আফরোজানা নাহার রাশেদা, ঢাকা)-এ নভেম্বর ২০০২-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

শিশুকে কীভাবে শেখানো হবে এ প্রশ্নের বয়স আড়াই হাজার বছরের বেশি। সে ঘরে বসে শিখবে নাকি স্কুলে যাবে (প্লেটো যার নাম দিয়েছিলেন একাডেমি, এরিস্টটল লাইসিয়াম, বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে বিহার, হিন্দু সমাজে টোল বা চতুস্পাঠী বা পাঠশালা, অথবা গীর্জা নিজেই, নাকি মুসলমান সমাজের 'মাদ্রাসা' ত্রয়োদশ শতকে বর্তমানের অর্থবহ রূপ স্কুল), নিজে নিজে শিখবে নাকি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ অর্থাৎ বাবা-মা, ভাই-বোন বা পরিবার বহির্ভূত পেশাদার জ্ঞানদানকারীর কাছে শিখবে, বই পড়ে শিখবে নাকি শুনিয়ে শুনিয়ে কেউ শেখাবেন বা বইয়ের বস্তুকে বাস্তবে দেখে শিখবে, মুখস্ত করে শিখবে নাকি পাঠকে ধারণায় এনে বাস্তবে প্রয়োগ করে শিখবে, শিখবে কি নিজের জন্য নাকি সমাজের জন্য? নিজের জন্য হলে সে শিক্ষা কি নৈতিক শিক্ষার জন্য নাকি আত্মোন্নয়নের জন্য, সমাজের জন্য হলে সে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সমাজের উপযুক্ত হওয়া নাকি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যা-ইচ্ছা তাই শিখবে নাকি শিক্ষকের নির্দেশমতো সে শিখতে বাধ্য নির্ধারণ অনুযায়ী শিক্ষার্জনে ব্যর্থ হলে সে কি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে নাকি শাস্তির মাধ্যমে তাকে যোগ্য করার প্রচেষ্টা চলবে, একা একা পড়বে নাকি দলবদ্ধভাবে পড়বে ইত্যাকার হাজারো প্রশ্ন যুগে যুগে শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী মানুষকে বিদ্ধ করেছে। সমাজ এবং সময়ের প্রয়োজনে নতুন সংযোজন কখনো এ ব্যাপারে থেমে থাকে নি। আবার প্রয়োজনকে মেটাতে না পেরে অনেক পদ্ধতি বা ভাবনাই হারিয়ে গেছে ইতিহাসের অতলে। আর এভাবেই একবিংশ শতাব্দির দ্বারপ্রান্তে আমরা পৌঁছে গেছি। আড়াই হাজার বছরের বেশিকাল ধরে ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বর্তমান যে ব্যবস্থা শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি তাতে স্পর্শ কিন্তু পুরো ইতিহাসেরই আছে। শিশুদের দুঃখদায়ক বা ভয়ঙ্কর কাহিনীর মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া যাবে না এ বিষয়টিকে কিছুতেই আড়াই হাজার বছর আগের গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর উক্তি মনে হয় না। মনে হয় আমাদের সময়ে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এক উচ্চারণ। আবার দু'হাজার বছর আগের কুইন্টিলিয়ানের ভাবনা কি কম আধুনিক মনে হয় যখন জানি তিনি ছিলেন শিশুদের দৈহিক শাস্তিদানের বিরোধী?

শিশু শিক্ষার আধুনিক যে ধারণা যা বিদ্যালয়গুলোতে সত্যিকার অর্থে প্রচলিত থাকা উচিত বলে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন সেগুলো হলো (১) শিশু শিখবে স্বাধীনভাবে: তার ওপর কোনো উৎপীড়কের ভূমিকা থাকবে না। (২) জ্ঞানার্জনে শিশুর ভূমিকা হবে সক্রিয় (৩) সমাজের অভিজ্ঞতাগুলোই হবে শিশুর পাঠক্রমের বিষয়। (৪)



www.pathagar.com

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিশু অর্জন করবে শৃঙ্খলা বোধ। (৫) সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটানোই শিশুর শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। (৬) ব্যক্তিসত্তা অর্থাৎ শিশুর মানসিক, শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক সকল দিকের সামগ্রিক বিকাশ ঘটাতে হবে। (৭) প্রতিটি শিশুর নিজস্ব সামর্থ ও সম্ভাবনাকে সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করা। (৮) শিক্ষাদানকারীর ভূমিকা সহায়কের, অধিপতির নয়। (৯) শিশুর নিজের প্রয়োজন, আগ্রহ ও সামর্থের ওপর গুরুত্বারোপ। (১০) প্রতিযোগিতা নয় বরং সহযোগিতার পরিবেশে একাদিক শিশুর একসঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ। (১১) শিশুর সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিবারের যৌথ প্রচেষ্টা এবং সর্বশেষ (১৩) শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়, 'শিক্ষাই জীবন' এ ধারণার ভিত্তিতে শিশুকে শিক্ষাদান।

এতো আধুনিক শিক্ষালয়ের কথা। তাহলে সে শিক্ষালয়ের আধুনিক শিক্ষককের রূপটি কেমন ? তিনি (১) সুবিবেচক (২) বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ (৩) যোগ্যতা দিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে সক্ষম (৪) মেজাজ ও আচরণে তিনি সংযমী (৫) দায়িত্বশীল (৬) তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ (৭) প্রগতিশীল (৮) নিরপেক্ষ (৯) নির্ভরযোগ্য এবং (১০) সুব্যক্তিত্বের অধিকারী। শুধু কি তাই? তার থাকতে হবে (১১) শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান (১২) শিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা (১৩) শিশু মনোবিজ্ঞান বিষয়ে গভীর বোধ (১৪) সহযোগিতামূলক মানসিকতা (১৫) শিক্ষণ প্রিয়তা ইত্যাদি। এতেই কি শেষ? একজন শিক্ষক যথার্থ অর্থেই একজন আধুনিক ছাত্রের উপযোগী হতে হলে তাঁর থাকতে হবে (১৬) শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা (১৭) পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সুপরিকল্পনা (১৮) জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের বাইরেও শিক্ষার্থীকে অন্য সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত করে তোলার যোগ্যতা ও মানসিকতা (১৯) শিক্ষার্থীর গৃহের সঙ্গে যোগাযোগ (২০) আধুনিক চিন্তা চেতনা সম্পর্কে ধারণা এবং (২১) সুপরিচালনার ক্ষমতা। অর্থাৎ উপযুক্ত দীর্ঘ দুটি তালিকা দিয়ে আমরা বোঝাতে চেয়েছি আমাদের শিশু যে ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করে তার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপরের শর্তগুলো পূরণ প্রয়োজন। এতোসব ভালোমন্দের হিসেব কি একদিনেই প্রত্যাশিত হয়ে উঠেছে শিক্ষা ব্যবস্থায়? কোন দেশের কোন্ শিক্ষাচিন্তাবিদ বর্তমানেও আধুনিক ও উপযোগী এ সকল ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তার সময়ানুক্রমিক একটি হিসেব আমরা করার চেষ্টা করবো। দেখবো অবিস্মরণীয় সে সব প্রাজ্ঞজনেরা কীভাবে এবং কতোখানি অবদান রেখে গেছেন জ্ঞানার্জন ব্যবস্থায় যা আজো আমরা অবলম্বন করে তাঁদের প্রতি সম্মান জানাই।

শিশুকে সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে; দৈহিক শাস্তি প্রদান শিশুর শিক্ষার পরিপন্থী। গৃহ থেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান অধিকতর কার্যকর এ সকল অভিমত রোমান চিন্তাবিদ মারকাস ফ্রারিয়াস কুইন্টিলিয়ানের (আনু: ৩৫ খ্রিঃ, আনু: ৯৫ খ্রিঃ)।

বর্বরোচিত পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা না করে শিশুর জন্য আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষা সূচিতে খেলা ও অঙ্গ সঞ্চালনের বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সংস্কারক ইরাসমাস রটারডাম ভেবেছিলেন এসব।



www.pathagar.com

সুস্থ ইন্দ্রিয় ও সবল দেহকে মূল লক্ষ্য বিবেচনা করে শিক্ষার্থীর মনকে সুখে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করাই হওয়া উচিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এ অভিমত ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের (১৬৩২-১৭০৪ খ্রিঃ)।

আধুনিক স্কুল পদ্ধতির প্রবক্তাদের অন্যতম সপ্তদশ শতাব্দির চেকোস্লোভাকিয়ান চিন্তাবিদ কমেনিয়াস তো অমূর্ত প্রতীক নয় এবং সরাসরি উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক পন্থায় শিশু শিক্ষার পক্ষপাত ছিলেন।

জোর করে শেখানোর চেষ্টা করলে শৈশবে রাগ, বিরক্তি, মারামারি প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তি জাগার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে জ্যাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রিঃ ) তো শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানেরই বিরোধিতা করেন। স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে মুক্ত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণই শিশুর জন্য উপযোগী এটাই ছিল তাঁর অভিমত। রুশোর দেশ সুইজারল্যান্ডের আর এক শিক্ষাবিদ জোহান হেনরি পেস্তালৎসি (১৭৪৬-১৮২৭ খ্রিঃ) শিক্ষকের ভূমিকাকে দেখেন অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে। তার মত হলো শিক্ষার্থীর সহজাত মানসিক ক্ষমতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত না থাকলে শিক্ষাদান কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে না।

শিশুর আগ্রহ থাকুক বা নাই থাকুক তাকে শেখাতেই হবে এটা কোনো কথা নয়। শিক্ষাগ্রহণে শিশুর ভেতরে আগ্রহ সৃষ্টি করাই প্রধান কাজ। জার্মানীর শিক্ষাবিদ জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট (১৭৭৬-১৮৪১ খ্রিঃ) এর ভাবনা ছিল এরকম।

জার্মানির আর এক শিক্ষাচিন্তাবিদ ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেলইতো আনলেন কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতি। শিশুকে চারাগাছ, শিক্ষককে মালী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাগানের সাথে তুলনা করে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর জন্য অন্তর্ভুক্ত করলেন খেলা, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা ইত্যাদি।

কাজের মাধ্যমে শিশুদের বহুবিধ গুণের বিকাশ সাধন করে তাদেরকে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জন্ম ১৮৫৯ খ্রিঃ মৃত্যু ১৯৫২ খ্রিঃ) পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার পরিবর্তনকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রয়োগবাদের এ ধারণা অর্থাৎ যে শিক্ষার প্রায়োগিক মূল্য আছে সে শিক্ষাই বিতরণ করা উচিত প্রথম ভেবেছিলেন বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিঃ)। তার সে শিক্ষা চিন্তা যথাসময়ে আমাদের ওপর প্রভাব ফেলে নি কেননা রেনেসাঁ ও পরবর্তীকালে ইউরোপীয় চিন্তাই বলা যায় বিশ্ব চিন্তায় পরিণত হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক শাসনে থাকায় এর কোনো ব্যতিক্রম সুযোগও আমাদের ছিল না)।

ব্রিটিশ শিক্ষা দার্শনিক হোয়াটহেড (১৮৬১-১৯৪৭) শিক্ষায় জ্ঞানের চেয়ে মানবকল্যাণে সে জ্ঞানের ব্যবহারকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

বহুযুগ ধরে প্রচলিত বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের বেঞ্চে বসার প্রথা কমিয়ে হালকা টেবিল ও চেয়ারের যিনি প্রবর্তন করেন তিনি হলেন ইটালীয় শিক্ষাবিদ মারিয়া মন্তেসরি (১৮৭০-১৯৫২ খ্রিঃ)।



www.pathagar.com

শিশুকাল থেকে পরিকল্পিত উপায়ে শিশুকে শারীরিক বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন ব্রিটিশ দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৫০ খ্রিঃ)।

শিক্ষাদর্শনের ইতিহাসে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আরো যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের গুরুত্ব কম নয়। গ্রীস দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো বা এরিস্টটল, ইসলামি চিন্তাবিদ ইমাম গায্যালী, রেনেসাঁ পরবর্তী বেসডো, আমেরিকার ফ্রান্সিস পার্কার, ফ্রান্সের রোসার কুসিনে বা ইংল্যান্ডের সেসিল রেডডি এমনকি পাক-ভারত উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপেট স্যার সৈয়দ আহমদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল বা মহাত্মা গান্ধীর অবদানও গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণীয়। উপরে আমরা শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত এমন কিছু প্রসঙ্গকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যেগুলো আজকের দিনেও উপযোগিতা হারায় নি। সময়কে জয় করে যেগুলো এখনো আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিক প্রয়োজনকে মিটিয়ে প্রচলিত রয়ে গেছে।

**কৃতজ্ঞতা :** স্পষ্টতই এ নিবন্ধ রচনায় দর্শন, শিক্ষা ও ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

প্রবন্ধটি প্রথমে দৈনিক *আজকের কাগজ* (৪ মার্চ ১৯৯৮) এ এবং পরে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স কলেজের বার্ষিকপত্র ১৯৯৮ *প্রতিভা*-য় প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# সতীনাথ ভাদুড়ী ও *জাগরী*

সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা ভাষার প্রধান ঔপন্যাসিকদের একজন, এ সত্য বোধ করি কেউ অস্বীকার করবেন না। সবাই এ ভাবনার সাথেও একমত যে, আমাদের অন্যান্য প্রধান কথাকারদের তুলনায় তাঁর পরিচয় ছিল খুবই সীমিত বলয়ে। কম পরিচিতির মুখ্য কারণটি যেমন বুদ্ধিবৃত্তিকতার সাথে সম্পৃক্ত, তেমনি বাংলাভাষী অঞ্চলের বাইরে বিহারের অবস্থানও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কালের প্রশ্নে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক হলেও তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও শৈলী ছিল বিচিত্র এবং অভিনব।

১৯০৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাভাষী অঞ্চল পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবঙ্গ (বর্তমান ভারতের একটি রাজ্য) থেকে দূরবর্তী বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়াতে আইন ব্যবসায়ী পিতার ঘরে জন্ম নেন সতীনাথ ভাদুড়ী। পূর্ণিয়া জেলা স্কুল থেকেই ১৯২৪ সালে এমএ এবং ১৯২৪ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৩০ সালে এম এ এবং ১৯৩১-এ বি.এল পরীক্ষা পর্যন্ত তাঁর পুরো শিক্ষাজীবনও কাটে পাটনায়। কর্মজীবনের প্রথম দিনগুলোতে তিনি বাবার ওকালতি ব্যবসায় সহকারীর ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে সতীনাথ কংগ্রেসে যোগদান করেন। রাজনীতিতে আসার পর ক'বছর কারাবরণ করতে হয় তাঁকে। শেষে রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়ায় ১৯৪৮-এ তিনি কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে সতীনাথ বিদেশ যাত্রায় বের হন। ইউরোপ সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহের কারণে তিনি সে সময় বেশ কটি ইউরোপীয় ভাষাও আয়ত্ত করেন। ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, ইতালি, জার্মানি ও ইংল্যান্ড ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল নতুন দিগদর্শনে।

ভাগলপুর জেলে আটক থাকা অবস্থায় ১৯৪২-১৯৪৪ সময়ে সতীনাথ রচনা করেন রাজনৈতিক পটভূমিকার উপন্যাস *জাগরী*। ১৯৪৫-এর অক্টোবর মাসে প্রকাশিত এ উপন্যাসটির কিশোর সংস্করণ এবং হিন্দি অনুবাদ উভয়ই প্রকাশিত হয় ১৯৪৮-এর জুলাইতে। স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত রবীন্দ্র পুরস্কারের প্রথম বিজয়মালায় ভূষিত হয় *জাগরী* উপন্যাস ১৯৫০ সালে। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ১৯৬৫০তে লীলা রায়ের অনুবাদে এ উপন্যাসটির ইংরেজি সংস্করণ Vigil প্রকাশ পায়।

বহুল আলোচিত এ উপন্যাসটি ছাড়াও সতীনাথের রচিত অন্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সফল হলো *ঢোঁড়াই চরিত মানস*। উপন্যাসটির দুটি খণ্ড যথাক্রমে ১৯৪৯ এবং



www.pathagar.com

১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ মহাকাব্যিক এ উপন্যাসটিও পরবর্তীতে হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হলো— *চিত্রগুপ্তের ফাইল* (১৯৪৯), *অচিন রাগিনী* (১৯৫৪), *সংকট* (১৯৫৯), এবং *দিগভ্রান্ত* (১৯৬৬)।

উপন্যাসের মতো ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও সতীনাথের ছিল অবাধ বিচরণ। উপন্যাসের সাথে সাথেই ছোটগল্প রচনার কাজটিও তাঁর চলছিল। ১৯৪৯-এর বের হয় প্রথম গল্পগ্রন্থ *গণনায়ক*। তাঁর রচিত অন্য গল্পগ্রন্থগুলো হলো : *অপরিচিতা* (১৯৫৪), *চকাচকী* (১৯৫৬), *পত্রলেখার বাবা* (১৯৫৯), *জলভ্রমি* (১৯৬২) এবং *অলোক দৃষ্টি* (১৯৬৩)। এছাড়া বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত *সত্যি ভ্রমণ কাহিনী* প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে।

*জাগরী* উপন্যাসের সময়কাল মাত্র একটি রাত। পূর্ণিয়া জেলে ১৯৪৩ সালের মে মাসের কোন এক গোধূলী থেকে ভোর পর্যন্ত। সেলে বন্দি আসামি বিলু আত্মকথনের ভঙ্গিতে শুরু করে তার পর্ব। বিলুর অংশের নাম 'ফাঁসি সেল'। বাকি অন্য যে তিনটি চরিত্র একই কথন ভঙ্গিমায় নিজেদের বক্তব্য বলেছে তারা হলো বিলুর বাবা : 'আপার ডিভিশন ওয়ার্ড: বাবা'; বিলুর মা: 'আওরৎ কিতা: মা', এবং বিলুর ছোট ভাই নীলু: 'জেলগেট : নীলু'। বিলু যেমন ক্ষণ গুনছে ভোর বেলায় তার ফাঁসির; একই জেলের অন্য ভিন্ন ভিন্ন সেলে বন্দি বিলুর রাজনৈতিক কর্মী বাবা ও মা' ও উদ্বেলিত আশংকায় অপেক্ষা করছে ওই একই ভোরের; যেমনভাবে জেলগেটের বাইরে নীলু অপেক্ষা করছে দাদার লাশ নেয়ার জন্য। একই পরিবারের চারটি চরিত্রে সন্ধ্যা থেকে সারারাতের এ সব ভাবনাই *জাগরী*। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য পূর্ণিয়া জেলে ওই একই সময়ে বন্দি ছিলেন ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী নিজেই। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের শুরু সে আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ বিরোধী পূর্ববর্তী সকল আন্দোলনের চেয়ে তীব্র। 'ভারত ছাড়ো' বা 'আগস্ট বিপ্লব' নামের সে আন্দোলনে হাজার হাজার কর্মীকে জেল জীবন-যাপন করতে হয়। যেমনটি ঘটেছিল সতীনাথ ভাদুড়ী বা কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির নেতা বিলু বাবুর ক্ষেত্রে।

কাহিনী বর্ণনার সাধারণ সূত্র *জাগরী*তে অনুপস্থিত। প্রধান চারটি চরিত্রের চেতন ও অচেতনের সমন্বিত রূপ নিয়েই উপন্যাসটির অবয়ব তৈরি হয়েছে। তাদের সব বলা, দেখা, শোনা মিলেমিলে একাকার হয়ে গেছে ওই উপন্যাসে। যদিও ব্যাপারটি এমন নয় যে সতীনাথ ভাদুড়ীর পূর্বে আর কোন বাংলাভাষার ঔপন্যাসিক আত্মকথনের ভঙ্গি ব্যবহার করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) *রজনী* (১৮৭৭) বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *ঘরে বাইরে* আত্মকথনধর্মী উপন্যাস। তবে সতীনাথের ভিন্নতা এই যে উপর্যুক্ত দুটির মতো তিনি তার *জাগরী*তে কাহিনীর অগ্রসরণ ঘটান না। বরং নীলু, বিলু, বাবা ও মা'র স্বগোতক্তির ভেতর দিয়ে এ কাহিনী বিশ্লেষণ, পুনঃবিশ্লেষণের ফলে ক্রমশ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

*জাগরী*র প্রথম প্রকাশের ভূমিকাতে ঔপন্যাসিক জানিয়েছিলেন: 'রাজনৈতিক জাগৃতিক সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের



www.pathagar.com

তরঙ্গ বিক্ষোভ কোন কোন স্থানে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতে আঘাত করিতেছে। গল্পটি ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে।' শুধু তাই নয়, বাস্তবেও আমরা দেখতে পাই উপন্যাসের চারজন পাত্রপাত্রীর সকলেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব : রাজনীতি তাদের কর্ম ও চেতনা জুড়ে ব্যাপৃত। এবং তারপরও *জাগরী* একটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। কোন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা মতাদর্শকে প্রচারের উদ্দেশ্যে বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল বা তাদের কর্মকাণ্ডক সমালোচনার জন্য উপন্যাসটির রচনা হয় নি। এবং এটি পরিণত হয়েছে রাজনীতি-সম্পৃক্ত চারজন মানুষের মনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। ঔপন্যাসিক নিজেও ভূমিকাতে এ উপন্যাসকে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পড়ার আহ্বান জানালেও প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের টোনের সাথে ও আন্দোলনের বিশেষ যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তাই এটি এক ধরনের সার্বজনীনতা লাভ করে যা যে কোন সময়ের পাঠকের জন্য আকর্ষণীয়। আর সে জন্যই বোধ হয় একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন : '*জাগরী* পড়ে লোকের মনে হতে পারে যে এখানে লেখক সোশালিস্ট বা কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধের কথা বলতে চাইছেন, আসলে কিন্তু দ্বন্দ্বটা রাজনৈতিক একপেশেমীর সাথে মানবিকতার'। সতীনাথ যে কাজটি করেছেন তা হলো কুশলী হাতে রাজনৈতিক সচেতনতার মিশ্রণ ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক অনুপম শিল্পবোধ।

*জাগরীর* চারটি চরিত্র নিজেকে এবং বাকি তিনজনকে কেমনভাবে মূল্যায়ন করে তা একটি প্রধান অনুষঙ্গ। চারটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্রগুলো উদ্ভাসিত। চরিত্রায়নে চেতনা-প্রবাহের ব্যবহারও স্পষ্ট, যদিও সেখানে পাশ্চাত্য ধরনকে অনুস্মরণ করা হয় নি। *সতীনাথ ভাদুড়ী জীবন ও সাহিত্য* (কলকাতা, ১৯৮৪) গ্রন্থে অরূপকুমার ভট্টাচার্য তাই যথাযথই বলেছেন :

> 'বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে নতুন শাখাটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সেই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনায় পাওয়া যায়...। কিন্তু পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের যে ধারাটি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল, সতীনাথ ভাদুড়ী তা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। একদিকে ফয়েডীয় চিন্তাধারা অপরদিকে মার্কিসীয় চিন্তাধারা এই দুটি নতুন দার্শনিক চিন্তা বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশকে বেশ নরনারীর জৈব সম্পর্কের অকপট আলোচনায় আধুনিক সাহিত্যিকরা কিছুটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী এদিকে একেবারেই যান নি। (পৃ. ৭১-৭২)

*জাগরীতে* ঔপন্যাসিক অতিরিক্ত একটি কৃতিত্ব এই চার প্রধান পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিত্বের বিকাশে তিনি চার রকম গদ্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন। বাবা, বিলু ও নীলুর আত্মকথন তো স্পষ্টতই সাধুক্রিয়ায়, অন্যদিকে মা'র চলিত ক্রিয়ায়, উপস্থাপনাগতভাবেও এই চারটি চরিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃশ্যমান।

সতীনাথ ভাদুড়ীর দু'টি উপন্যাসের মধ্যে শুধুমাত্র *ঢোঁড়াই চরিত মানস* কে বাদ দিয়ে বিহার অঞ্চলের ছোঁয়া খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্যগুলোকে বিহারে পূর্ণিয়া বা অন্য কোন অঞ্চলকে প্রেক্ষাপট হিসাবে গ্রহণ করা হলেও বা বিহারের ২/৪ জন চরিত্র অন্তর্ভুক্ত হলেও



www.pathagar.com

উপন্যাসের রসাস্বাদনে বাঙালি পাঠকের কোন অসুবিধাই হয় না। যেমন *জাগরীর* প্রেক্ষাপটকে বাস্তবনিষ্ঠ করার জন্য সতীনাথ ভাদুড়ী প্রধান পাত্রপাত্রীদের চারপাশে এনেছেন সরস্বতী, দুবেজী, দুবেইন, বিষুণদেওজী, সদাসিউ, মনবনিয়ার মতো অনেকগুলো অবাঙালি চরিত্র। যদিও ঔপন্যাসিক এদের মুখে অবাঙালি ভাষা দেন নি। কখনও কখনও অবাঙালি আমেজ ফুটিয়ে তোলার জন্য দু'চারটি হিন্দি শব্দ বা খুব সহজ বাক্যাংশ দিলেও পুরোপুরি হিন্দি ভাষায় কথা বলতে গিয়ে ওই সব চরিত্রকে অস্পষ্ট বা কাহিনীর গতিকে ব্যাহত করেন নি।

*জাগরী* প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় এতে আত্মজৈবনিক উপদানের প্রতুল ব্যবহার। নীলু ও বিলুর মিলিত সত্তারূপ সতীনাথ নিজেই এমনটি ভাবলে দোষ হবে না। তাছাড়া মাস্টারমশাই বা মা চরিত্রের মানুষগুলোর মধ্যে সতীনাথের ব্যক্তিজীবনের পরিচিতজনদের ছায়া স্পষ্ট। তুলনায় অপ্রধান চরিত্রগুলোও বাস্তব জীবনের মানুষদের ছায়ার ওপরে নির্মিত। এমনটিই সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনীকাররা মনে করেন।

তবে *জাগরীর* প্রধান যে চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য তা হলো এর শৈলী। কাহিনী কাঠামো এবং মনঃস্তত্ত্ব নির্মাণে ঔপন্যাসিক এ গ্রন্থে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা বাংলা উপন্যাসে অভাবিতপূর্ব। সতীনাথ যেমন পাশ্চাত্য ধরনকে নকল করতে অনীহ ছিলেন, তেমনি বাংলা উপন্যাসের ধরনকে অনুস্মরণেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ চোখে পড়ে না। আর সে কারণেই সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা উপন্যাসের জগতে একটি মহীরুহের মতো। পাঠকপ্রিয়তা তাঁর ভাগ্যে জোটে নি কিন্তু শিল্পমান এবং সৃষ্টি প্রশ্নে তিনি যে গুটিকয়ের একজন, সেটি অনস্বীকার্য।

দৈনিক *সংবাদ* সাময়িকীতে ২৫ নভেম্বর ২০০৪-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# বিস্মৃত কথাকার সাবিত্রী রায়

সাবিত্রী রায় (১৯১৮-১৯৮৫) শরিয়তপুরের লেখিকা। আটটি উপন্যাস লিখেছিলেন; যার প্রথম দু'টি বাদ দিয়ে বাকি সবক'টিকে সহজেই শিল্পমান উত্তীর্ণ বলবেন যে কোনো কড়া সমালোচকও। দু'টি উপন্যাস *পাকা ধানের গান* (১ম পর্ব ১৯৫৬, ২য় পর্ব ১৯৫৭, ৩য় পর্ব ১৯৫৮) এবং *মেঘনা-পদ্মা* (১ম পর্ব ১৯৬৪, ২য় পর্ব ১৯৬৫) আয়তনে বিশাল এবং এদের প্রথমটি মহাকাব্যিক উপন্যাস অভিধা পেয়েছিল তৎকালীন খ্যাতিমান লেখকদের কাছ থেকে। আরেকটি উপন্যাস *স্বরলিপি* (১৯৫২) আলোড়ন তুলেছিল বিবিধ কারণে। কিন্তু বাংলাভাষী পাঠকের দুর্ভাগ্য এই, বাংলা উপন্যাসের কোনো ইতিহাস বা অধিকাংশ নারী কথাশিল্পী যখন পারিবারিক উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত তখন এই লেখিকা জীবনকে দেখেছেন অনেক বেশি বাস্তবতার নিরিখে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং উপন্যাসের কাঠামোয় সেগুলো প্রকাশের ক্ষমতায় তিনি স্বকালে পুরুষ কথাসাহিত্যিকদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন—এমন অভিমত দিলে যৌক্তিক বিচারে তা অতিরঞ্জন হবে না। সে কালের বাংলার যে চিত্র, যাতে রাজনীতির প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য—তা-ই হয়েছে সাবিত্রী রায়ের অধিকাংশ উপন্যাসের উপজীব্য। পারিবারিক ও সামাজিক চিত্রপটে সাবিত্রী রায় এঁকেছেন রাজনৈতিক বাঙালিকে—যে বাঙালি নারী বা পুরুষ নয়, যে বাঙালি অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ সচেষ্ট। লেখিকার প্রধান দু'টি উপন্যাস *স্বরলিপি* এবং *পাকা ধানের গান*-এর প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে এ সকল বিবেচনাকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

সাবিত্রী রায় রাজনৈতিক পরিবারের মানুষ। বাবা নলিনীরঞ্জন সেন এবং মা সরযুবালা দু'জনেরই উত্তরাধিকার ছিল গর্ব করার মতো। তাছাড়া বাল্যেই সাবিত্রী সান্নিধ্য পেয়েছিলেন পিসিমা অম্বিকা দেবীর—সামাজিক এবং শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে যাঁর ছিল সার্বক্ষণিক তদারকি। পরিবারটির সাথে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের ছিল আন্তরিক যোগাযোগ। বড়ভাই দেবপ্রসাদ সেন ছিলেন বিপ্লবী। সেকারণে চেতনাগতভাবে সাবিত্রী প্রথম থেকেই ছিলেন রাজনীতি সচেতন। শৈশবে সাহিত্যচর্চা বলতে ছিল কবিতা লেখার প্রচেষ্টা; সেগুলোতে স্বদেশিকতার মনোভাব ছিল স্পষ্ট। প্রচলিত বিশ্বাস ও নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে সাবিত্রী রায়ের অবস্থান সর্বদাই দৃঢ়। এসবেরেই চূড়ান্ত হিসাবে ১৯৪১ সালে সাবিত্রী রায় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

সাবিত্রী রায়ের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় অনুবাদকর্মের মাধ্যমে। তার আগে কবিতা লেখার ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। ১৯৩১ সালে বড় ভাই দেবপ্রসাদ সেনের জন্য পুলিশ



www.pathagar.com

বাড়ি তল্লাস করার সময় তাঁর কবিতার খাতাটি নিয়ে যায়; যা আর কখনো তিনি ফেরত পান নি। প্রথম অনুবাদ গল্প 'চোখের জল ফেলো না ম্যারিয়ানা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালের ২৯ ডিসেম্বরে *অরণি* পত্রিকায়। সাংস্কৃতিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে স্বীকৃত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৫৪) সম্পাদিত এ পত্রিকাতেই কিছুদিন পর ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এর প্রকাশিত হয় সাবিত্রী রায়ের প্রথম মৌলিক গল্প 'ধারাবাহিক'। একই বছর *অরণি*-তে তাঁর আরো যেসকল গল্প প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে 'মাটির মানুষ', 'নতুন কিছু নয়', 'সাময়িকী', 'ওরা সব পারে' ইত্যাদি। উপর্যুক্ত গল্পগুলোর সঙ্গে অন্য আরো গল্প যেমন 'রাধারাণী' (১৯৪৫), 'স্বর্গ হইতে বিদায়' (১৩৫৬), 'সমঝ্‌দার' (১৩৫৭), 'হাসিনা' (১৯৪৭), 'প্যারামবুলেটার' (১৯৪৮), 'অন্তঃসলিলা' (১৯৪৯) নিয়ে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয় সাবিত্রী রায়ের একমাত্র গল্পসংকলন *নতুন কিছু নয়*। '১৯৪৩-এর আকালে যাঁরা প্রাণ হারালো তাঁদের স্মরণে' উৎসর্গীকৃত এ গল্পগ্রন্থটি ছাড়া উপন্যাস-বহির্ভূত তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে শিশুপাঠ্য *লেখার খেলা* (১৯৫৫?), কিশোরপাঠ্য *হলদে বোঝা* (১৩৭৯) এবং *নীলচিঠির ঝাঁপি* (১৯৮০)।

১৯৩৮ সালে বি. এ ও পরে বিটি পাস করার পর ১৯৪০ সালে অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের সাথে অসবর্ণ বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে স্বামী জেলে যাওয়ায় এবং সন্তানের লালন পালনের সমস্যা হওয়ায় সাবিত্রী রায় তাঁর পেশা শিক্ষকতা থেকে সরে আসলেও তাঁর মন যে শিশু শিক্ষা ও শিশু পালনের ব্যাপার নিয়ে প্রশ্নিল ছিল তার প্রমাণ উপরে উল্লিখিত শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থ। এ সময় পেশা হিসেবে লেখাকে গ্রহণ করার প্রসঙ্গে তাঁর কন্যা গার্গী রায় (চক্রবর্তী) জানান :

> একসময় মার মনে দ্বিধা আসে,— লিখে তো রোজগারের পথ নেই। সে হল পঞ্চাশ দশকের কথা। মুসৌরিতে মার আলাপ হয় বিশিষ্ট হিন্দী কথাসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ আসখের সঙ্গে। লেখাকে পেশা করাবার জন্য তিনিই মাকে উৎসাহিত করেন। উনি মার লেখিকা-সত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। চাকরি করতে না পারার কুণ্ঠা এরপর অনেকাংশে কেটে গেল। তবে লেখিকা-সত্তার সঙ্গে গৃহিণী-সত্তা বা মাতৃ-সত্তার দ্বন্দ্ব মাকে লাগাতার পীড়িত করেছে। সাংসারিক কাজের অফুরন্ত দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে মা সময় বার করে নিতেন লেখার জন্য। মেঝেতে মাদুর পেতে বা তক্তপোষের ওপর জলচৌকি ধরনের ছোট্ট ডেস্কের ওপর ওর অধিকাংশ লেখা। লেখার জন্য মানসিক পরিবেশ তৈরি করতে টেপরেকর্ডে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চালিয়ে মা কাগজ নিয়ে বসতেন।[১]

*অরণি*-তে ছোটগল্প প্রকাশের কালেই সাবিত্রী রায় উপন্যাস রচনায় হাত দেন। প্রথম উপন্যাস *সৃজন* প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে (শ্রাবণ ১৩৫৪)। ২৮০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি সাবিত্রী উৎসর্গ করেছিলেন পিসীমা, মা ও বাবা-কে; অর্থাৎ লেখিকার পিসীমা যে কতখানি প্রভাব ফেলেছিলেন তার স্বীকৃতি মেলে লেখিকার এ উৎসর্গ থেকে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিশ্বজিৎ। দীর্ঘ রাজনীতির সাক্ষী সে। উপন্যাসের কাহিনীকালে ভারতবর্ষে রাজনীতিতে স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীরা সহিংস আন্দোলন ছেড়ে সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকেছে। দরিদ্র ঘরের সন্তান দুখু দত্তক পুত্র হয়ে বড়লোকের বাড়িতে এসে হয়েছিল বিশ্বজিৎ। কিন্তু



www.pathagar.com

আপন চেহারায় সে বিকশিত হল যখন সন্ত্রাসবাদী স্বদেশীদের সংস্পর্শে সে আসে। আন্দোলন-সংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় কারাগার থেকে যখন সে মুক্তি পায় তখন সে অন্য মানুষ—নতুন দীক্ষায় আলোকিত। প্রথম উপন্যাস *সৃজন*-এ লেখিকার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন তাঁর উপন্যাসের একটি প্রধান অনুষঙ্গ, কিন্তু আন্দোলনের ভেতরের দ্বন্দ্বগুলো নিয়েও তিনি ছিলেন সচেতন। নিজের রচনায় সে-সচেতনতার প্রকাশও তিনি ঘটিয়েছিলেন। সচেতন সে মানসিকতার কারণে তৃতীয় ও চতুর্থ উপন্যাস *স্বরলিপি* ও *পাকা ধানের গান* প্রকাশের পর কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল; এই নির্দেশ অমান্য করায় তাঁর উপন্যাসদ্বয় নিষিদ্ধ করে পার্টি এবং দৃঢ়চেতা সাবিত্রী নিজেই পার্টির সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেন। সাবিত্রী রায় বিস্মৃত হবার পেছনে এসকল কার্যকারণও ক্রিয়াশীল ছিল মনে করতে খুব বেশি বিভ্রান্ত হবার কথা নয়।

সহিংস সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদে দীক্ষা গ্রহণের এমন আরও একটি উপন্যাসের সন্ধান আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি। ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯৯৬) রচিত *ধুলোমাটি* (১৩৬৩) নামের সে উপন্যাসটি তুলনামূলকভাবে বেশি সংহত হলেও *সৃজন*কেও লেখিকার প্রথম প্রয়াস হিসেবে শ্রমসাধ্য বলতে দ্বিধা করা উচিত নয়। তাছাড়া *ধুলোমাটি* উপন্যাসটি *সৃজন*-এর দশ বছর পরের রচনা— সে বিষয়টিকেও বিবেচনায় রাখতে হয়। *সৃজন* সম্পর্কে *আনন্দবাজার* লিখেছিল :

> বিদেশীর কারাগৃহে আবদ্ধ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের গৃণ্য দলাদলি ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ, দাদাদের দল রাখার আপ্রাণ প্রয়াস ও দলগত কুৎসা-প্রচার যা কারান্তরালে ও বিদ্বেষের বহ্নিশিখা জ্বালিয়া সমস্ত আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া আনিয়াছিল, সে সব দুঃখের কাহিনী গ্রন্থকর্তী সুনিপুণ বিশ্লেষণে লোকলোচনের সমক্ষে ধরিয়াছেন।*

সমকালীন রাজনেতিক যে বাস্তবতা তাকে ঔপন্যাসিক সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে *সৃজন*সহ তাঁর অন্যান্য সকল উপন্যাসেই চিত্রিত করেছেন। অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ *অশনি* পত্রিকায় *সৃজন* নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। তার অংশবিশেষ এমন :

> গোড়াতে একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাস্তব জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লেখিকা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একটা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস গল্পের সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।... লেখিকার প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রবল।... সমগ্র উপন্যাসটি পড়লে মনে হয় একটি সত্য কাহিনীকে যেন লেখিকা উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছেন।... কেউ কেউ বলবেন যে প্রায় সব চরিত্রগুলো মধ্যবিত্তের চরিত্র মাত্র। এমনকি মজুররাও তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি নিয়ে চলাফেরা করছে।... মোটের উপর প্রথম রচিত হিসাবে আধুনিক ও আধুনিক লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে লেখিকাও আসন দাবি করতে পারেন।

---

* *আনন্দবাজার* ও *সৃজন* এ প্রকাশিত অভিমত দুটি (তারিখবিহীন ভাবে) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সাবিত্রী রায় সম্পর্কিত একটি পুস্তিকায় যেটি প্রচ্ছদ ও প্রকাশক পাতাহীন ভাবে পাওয়া যায় প্রয়াত সাহিত্যসেবী রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর শরিয়তপুরের বাড়ির লাইব্রেরিতে।



www.pathagar.com

*সৃজন*-এর দুর্বলতাকে ভোলানাথ ঘোষ যেমন চিহ্নিত করেছেন তেমনি অসহিষ্ণু সমালোচকের সম্ভাব্য সমালোচনার উত্তরও তিনি আগে থেকেই প্রস্তুত করেছেন। *অভ্যুদয়* পত্রিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও উৎসাহসূচক মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'ভাষার এই স্বাভাবিকতাই লেখিকার বৈশিষ্ট্য, হয়তো মনে হবে বাংলা উপন্যাসে নৈর্ব্যক্তিকতার সার্থক সূচনা এই বইয়ে পাওয়া যায়"। সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসকে ক্রম অনুযায়ী পাঠ করলে বোঝা যায় চেনা সমাজ ও চেনা মানুষের ছবি *সৃজন* ও দ্বিতীয় উপন্যাস *ত্রিসোতা*-তে যে সহজতায় তিনি এঁকেছেন *স্বরলিপি* হয়ে পাকা *ধানের গান* পর্যন্ত তার রূপ অপরিবর্তিত থাকে নি। ক্রমান্বয়ে তিনি শিল্পসচেতন হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর লেখিকা সত্তায় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী চেতনা দার্ঢ্য লাভ করেছে।

*ত্রিসোতা* প্রকাশ পায় ১৯৫০ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৯৫৪-তে। দ্বিতীয় সংস্করণে 'প্রকাশকের কথা' অংশটি ১৯৬১-তে প্রকাশিত দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ থেকে বাদ দেয়া যায়। ঔপন্যাসিক হিসেবে সাবিত্রী রায়ের কৃতিত্ব *ত্রিসোতা* পর্যন্ত প্রশ্নাতীত না হলেও প্রগতি সাহিত্যের একজন কলাকার হিসেবে তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টা যে যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তা 'প্রকাশকের কথা' অংশে স্পষ্ট। এতে আছে :

> নির্জিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রগতিসাহিত্যের ভূমিকা হল প্রতিবাদের। তাকে হতে হবে বিপ্লবের হাতিয়ার। তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে জনগণের। এখানে লেখকবাহিনীর কাজ হবে ধনিক সমাজের ক্রূর, নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ছলনার কথা পরিষ্কার করে সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া— যেন জনসাধারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রেরণা পেতে পারে তা থেকে। জনগণের সংগ্রামের অকূল একাংশই থাকবে এতে। রাজনীতির বিচারে যে সব সাহিত্যিক নিজেদের শ্রেণীচ্যুত, জাতিভ্রষ্ট মনে করে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনকে জীবনাদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন—তাঁদের গভীর প্রয়াস লক্ষ করা যায় নতুন শ্রেণী-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। লেখিকার বর্তমান উপন্যাসটিকেও এই পর্যায়ে ফেলা চলে অকুণ্ঠ চিত্তে। এমনি একজন মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে দেখা সমগ্র জাতির জীবনচাঞ্চল্য! গ্রাম্য পরিবেশ থেকে শহরের জনারণ্যে সর্বত্রই আশ্রয়চ্যুত মধ্যবিত্ত মনের ছোঁয়াচ। এ মধ্যবিত্ত মন নিজের খোলস ছাড়িয়ে বের হয়েছে অনন্ত যাত্রার পথে। উদ্বেগ, বিভ্রান্তি আর সমস্যা-সংশয় জড়িত সে পথ। আর তার পাশেই চলেছে দিগ্বলয় রেখায় কাতার দিয়ে বলিষ্ট মানুষের দল— শোষিত সর্বহারার মিছিল—উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র ব্যাকুল। দুঃখ আসে তাদের জীবনে—কিন্তু মুহ্যমান করে বিবশ করে দিতে পারে না সে দুঃখ, কর্ম প্রেরণায় এগিয়ে যায় তারা। তাঁদেরই দলে যে মিশতে হবে তাকেও। সেই অবিনাশী প্রাণশক্তির শিকড়ের সন্ধান যে লেখিকা খুঁজে পেয়েছেন তা নিঃসন্দেহে। আর কিছু না হোক, গণসাহিত্য সৃষ্টির সযত্ন প্রচেষ্টা এর প্রতিছত্রে সুপরিস্ফুট।[২]

দীর্ঘ এ উদ্ধৃতির অপ্রত্যক্ষ কারণ হলো এটি সুস্পষ্ট করা যে, সাবিত্রী রায় ততদিনে গণসাহিত্যের লেখক হয়েছেন। অথচ মর্মান্তিক এই যে, সেই জনগণের প্রাণ যে পার্টি তা-ই তাঁর স্বাধীনতা হরণ করতে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। *ত্রিসোতা*-তে সাবিত্রী রায়ের আত্মজৈবনিক উপাদানের উপস্থিতি খুব বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য। উপন্যাসের রূপসী গ্রামকে ব্যক্তি সাবিত্রীর বাল্যজীবনের 'উপসী' গ্রাম হিসেবে সনাক্ত করতে সচেতন পাঠকের অসুবিধা



www.pathagar.com

হবার কথা নয়। এমনকি সেখানে রয়েছে রথীন্দ্র মাস্টার (প্রয়াত সাহিত্য সেবক রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী) এবং আরও অনেক চেনা মুখ যাঁদেরকে ব্যক্তি সাবিত্রী রায়ের জীবনের চারপাশে আমরা দেখি। উপন্যাসের অন্য চরিত্র কুসুমলতাকেও সাবিত্রী রায়ের পিসিমা অম্বিকা দেবী হিসেবে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

*ত্রিসোতা* শুরু হয়েছে চরকা কাটার সময়। সাথে সাথে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুবকদের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো গ্রামীণ জীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ *ত্রিসোতা*-রও বিশাল জায়গা দখল করে আছে। আর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পদ্মার সাথে লেখিকার সাজুয্যও দুর্লক্ষ নয়। নিজ পরিবার এবং সমাজকে প্রেক্ষাপট বানিয়ে লেখিকা তাঁর এ উপন্যাসের নির্মিতি দিয়েছেন। পদ্মা শুধু উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র নয়, বিদ্রোহী চরিত্রও বটে। ঘটনার ক্রমপ্রসারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত এ উপন্যাসে তীব্রভাবে অনুভূত। দুর্ভিক্ষের তীব্র ছোবলে রক্তাক্ত বাঙালি সমাজের কমবেশি চিত্র এ উপন্যাসে পাওয়া যায়। বাঙালি সাধারণ নারীর যৌন নিরাপত্তাহীন সে সময় বড় ক্রুর।[৩] নারীর সম্ভ্রমের মূল্যহীনতার এমন মর্মন্তুদ চিত্র বুঝি শুধু সুলেখা সান্যালের[৪] (১৯২৮-১৯৬২) 'সিঁদুরে মেঘ' (১৩৫৯) গল্পেই পাওয়া যায়। 'সিঁদুরে মেঘ' গল্পের অনন্ত আর মালতী দুজনেই তো ঘরে পোড়া গরু। বাংলার সর্বকালের বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষে মালতী যেমন তার সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে নি, তেমনি অনন্তও প্ররোচিত হয়েছিল তার মৃত স্ত্রী ললিতার শরীর বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে। *ত্রিসোতা*-র *মদনতো* বিলাতি সাহেবের মন গলিয়ে দু'পয়সা বেশি কামাই করতে যে কারও গৃহস্ত বধূর যৌবন কালিমাময় করতে রাজি। আর ক্ষুধা। সে তো সেকালের বাঙালি সাধারণ মানুষের নিত্য সঙ্গী। ধারণা করা যায়, সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস-সকলের মধ্যে *ত্রিসোতা*-তেই দুর্ভিক্ষের চিত্র সবচেয়ে বেশি মাত্রায় উপস্থিত :

> মুসলমান পাড়ার মেয়েরা আসিয়া শাক তুলিয়া লইয়া যায় আশ্রমের ভিটা হইতে। কানে আসে শিশুদের ক্ষুধার্ত আর্তনাদ।—চাউল আনছে তোর বাজানে?
>
> —চাউল নাই আউজকা কয়দিন না? কচুসিদ্ধ চলছে দুই সন্ধ্যা। এক সন্ধ্যা গেছে মিষ্টি আলু-পোড়া দিয়া। আউজকা একমুঠা চাউল আনছে বাবুগো বাড়ির থন—জিভটা জড়াইয়া আসে। আউস ধানের ফ্যানা ভাতের স্বপ্ন ক্ষুধায় স্তিমিত চোখগুলোতে।
>
> ছোট ছোট একপাল ছেলেমেয়ে পিতলের বাটি রাখিয়া যায় রান্না ঘরের সামনে ফ্যানের প্রত্যাশায়।
>
> তারাসুন্দরী একজনের মতো চাউল বেশি লয় রোজই। কিছু কিছু ভাত ও ফ্যান একসঙ্গে ঢালিয়া দেয় ঐ পিতলের ঘটিগুলোতে। কোনো কোনো দিন নিজের ভাতটুকুও দিয়া দেয়। বুকটা যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—কি ভীষণ দুর্দিন। ঘরে ঘরে অনাহারে মৃত্যু আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই হাড়গিলা শিশুগুলো টিকিয়া থাকিবে কি এই ফ্যানটুকুর জোরে। ঘটিতে ফ্যান ঢালিতে ঢালিতে ভাবে তারা সুন্দরী।[৫]

দুর্ভিক্ষের এ চিত্রের মতোই তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিক্রমায় *ত্রিসোতা*-র অগ্রসরণ। সেখানে দৃপ্ত পদক্ষেপে কর্মব্যস্ত কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীবাহিনী, কিন্তু



www.pathagar.com

সাথে আছে ফরোয়ার্ড ব্লক ও সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের আগমন বার্তা। এসবের ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, ভারতের স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু সে স্বাধীনতা যে সাধারণ মানুষের স্বাধীন হওয়ার ইঙ্গিত নয় তাও স্পষ্ট। কিন্তু তারপরও মানবজীবন তো আশারই প্রত্যাশায় স্থাপিত। আর সেজন্যেই হয়তো পদ্মা সকলকে হারিয়েও যখন মেয়েকে কোলে তুলে নেয় তখন 'একফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে রোয়াকে'। উপন্যাসটির আলোচনা শেষে একথা স্বীকার করতেই হয়, *ত্রিসোতা* পর্যন্ত সাবিত্রী রায় বড় বেশি ঘটনার বিবরণকারী। সামগ্রিক সময় ও সমাজ জীবনকে ধারণ করতে তিনি মাঝে মাঝেই অপ্রত্যাশিত ও দৃষ্টিকটুভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেন, যা উপন্যাসের সামগ্রিক গঠন-সৌকর্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তবে পরবর্তী উপন্যাস *স্বরলিপি*-তেই তিনি সে দার্ঢ্য অনেকখানি অর্জন করেছিলেন কোনো সন্দেহ নেই।

*স্বরলিপি*-র 'লেখিকার কথা'য় সাবিত্রী রায় যে বলেছিলেন, "এ উপন্যাসেরও আমার পূর্ববর্তী উপন্যাস দুইটির মতোই, কোনো চরিত্র মিথ্যা নয়—বাস্তবেরই ছায়া, আবার কোনো চরিত্রই সত্য নয়—কল্পনারই প্রতিচ্ছায় মাত্র"—যাকে ঔপন্যাসিকের সাহিত্যাদর্শ হিসেবে ধরে নেয়া চলে সহজেই। তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা থেকেই যে তিনি তাঁর উপন্যাস-সকলের কাহিনী বুনন করেন তা'তো অন্য যেকোনো লেখককের মতোই স্বতঃসিদ্ধ। *স্বরলিপি*-র কালসীমা ১৯৪৬-১৯৫১। অর্থাৎ বলা চলে *ত্রিসোতা*-র প্রায় শেষদিক থেকে এসে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী তিন-চার বছর কাল পর্যন্ত এ উপন্যাস বিস্তৃত। প্রায় একই সময় নিয়ে সাম্প্রতিকালে আরও যে একটি কালজয়ী উপন্যাস আমার পেয়েছি তা হলো *খোয়াবনামা* (১৯৯৬)। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) রচিত সে উপন্যাসও বাংলা অঞ্চলের সে সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত— যেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তে'ভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি যেমন আত্তীকরণ করেছে, সাবিত্রী রায়ও তা করেছেন তাঁর *স্বরলিপি*-তে। ইলিয়াস পঞ্চাশ বছর পর, আর সাবিত্রী পঞ্চাশ বছর আগে। সাবিত্রী যে কাজটি করেছেন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকে, ইলিয়াসকে তা করতে হয়েছে ইতিহাসের পঠনের ভেতর দিয়ে। আর সেকারণেই হয়তো ইলিয়াসের অনেক বিবরণ ইঙ্গিতবাহী, স্বপ্নমিশ্রিত— যেটি সাবিত্রীর ক্ষেত্রে সাদামাটা বিবরণেই ব্যক্ত। তবে ইলিয়াস ও সাবিত্রীর রচনাদ্বয়ের একটি চূড়ান্ত পার্থক্য এভাবে হয়তো চিহ্নিত করা চলে যে, সাবিত্রীর সামগ্রিক প্রকাশ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাস্নাত; যেমনটি ইলিয়াসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ঘটে নি।

*স্বরলিপি*-র প্রকাশক লিখেছিলেন :

> রাজনীতিকে প্রধান উপজীব্য করেও অনাবিল জীবনালেখ্য রচনা যে সম্ভব তারই জ্বলন্ত প্রমাণ পূর্বগামী সাহিত্যিক প্রচেষ্টা 'সৃজন'। বিপ্লবী বাস্তবতায় পরিপ্লুত 'স্বরলিপি' হলো মুক্তিকামী, শান্তিপিপাসু ভারতীয় আত্মার সংগ্রামী সাধনার অনুলেখ। জীবনকে বাদ দিয়ে সংগ্রাম নয়—তাই বৃহত্তর সংগ্রামের সাথে দেখি মিলিয়ে গেছে ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংঘাত, দোলাচল চিত্ততা, প্রেম ও প্রয়োজনের শত সহস্র খুঁটিনাটি। 'ত্রিসোতা' ছিল বাংলা সাহিত্যের এক অকর্ষিত পথে প্রথম পদক্ষেপ। 'স্বরলিপি' হল সেই পথেই বলিষ্ঠ অভিযান।[৬]



www.pathagar.com

*স্বরলিপি* শুরুই হয়েছে এক সমাবেশ দিয়ে। যেখানে মুহুর্মুহু শ্লোগান 'তেলেঙ্গনোর পথ আমাদের পথ'। আর সামান্য পরেই সেখানে উপস্থিতি দর্শকের মানসিক অভিব্যক্তি : 'প্রতিহিংসাই। শুধু সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে নয়, এতদিনের ভুল পথ-ধরা আপোষী সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধেও'[৭] এবং শেষ বক্তার কথা 'এতকাল আমরা যা বলেছি, তা সবই ভুল। আজ থেকে যা বলছি, তাই একমাত্র ঠিক'[৮]— থেকে বোঝা যায় সম্পূর্ণতই একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সাবিত্রী রায়ের অন্বিষ্ট। সাধারণভাবে রাজনৈতিক না বলে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল অর্থাৎ তৎকালীন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির লোকজন এবং কর্মকাণ্ডকে ঘিরে *স্বরলিপি*-র আবর্তন। পার্টির কঠোর অনুশাসনের সেই দিনগুলোতেও সাবিত্রীর পর্যবেক্ষণ কিন্তু বিশ্লেষণী। আর তাই, সাম্যবাদের চূড়ান্ত আদর্শকে লালন করে, সার্বক্ষণিক কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্মী সাবিত্রী রায়, সার্বক্ষণিক পার্টি কর্মী শান্তিময় রায়ের স্ত্রী সাবিত্রী রায় তাঁর দেখা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। পার্টির ভেতরের লোকজনের ভাবনায় পার্টির কর্মকাণ্ডের সমালোচনাও বিপুল। আর সে কারণে পার্টির পক্ষ থেকে সাবিত্রী রায়কে মুখোমুখি করা হয় এক অগ্নিপরীক্ষার। এ প্রসঙ্গে সুজিৎ ঘোষের ভাষ্য হলো :

> কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির বিচ্যুতিগুলিকে তাত্ত্বিকরূপে না রেখে জীবন্ত প্রতীকে চিত্রিত করায়, প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের মতো পার্টির কর্ণধারদেরও তিনি বিরাগভাজন হয়েছেন। 'স্বরলিপি' প্রকাশের পরে, পার্টির তরফ থেকে এই বই প্রত্যাহারের প্রত্যক্ষ নির্দেশও তাঁর প্রতি আসে। তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হন নি। ফলে বইটি পার্টি থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তাঁর অনমনীয়তার পার্টির সভ্যপদ শেষ পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করেন। 'সুজন' এর 'বিশ্বজিৎ' এর মতোই আদর্শে আত্মনিবেচিত অথচ উদাসী লেখিকার স্বামীও পার্টি এবং লেখিকার মধ্যে এই সংঘাতে থেকেছেন উদাসীন, কিছুটা ইচ্ছাকৃত নিরপেক্ষ। হয়তো লেখিকার মনে সেকারণে ছিল অভিমান, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর যেন একলব্যের সাধনা-পার্টির স্বীকৃতি বা সভ্য পদ প্রভৃতির প্রতি না তাকিয়েই তিনি একাই নিজের লক্ষ্যভেদের সাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন। লিখে গেছেন পরবর্তী উপন্যাসগুলি একের পর একসে উপন্যাসগুলিতেও তিনি শ্রমজীবী শোষিত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষে, শোষণের বিপক্ষে এক শোষণ-নিপীড়নহীন মনুষ্যত্বের, সাম্যসমাজের স্বপ্ন দেখেছেন।[৮]

কিন্তু *স্বরলিপি*-র বিশেষত্ব এই যে, এ উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র রাজনৈতিক মানুষ হলেও সর্বোপরি তারা মানবিক বোধে সিঞ্চিত। উপন্যাসের পৃথ্বী, রথী, শীতা, সুমিত্রা, মেনকা, সাগরী, ফল্গু, কুরী, আক্রাম খাঁ—এরা সবাই জীবন্ত। অর্থাৎ সাবিত্রী রায় তাঁদের সর্বোপরি মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, রাজনীতি বা আদর্শের পুতুল হিসেবে নয়। এমনকি প্রয়োজনহীন বিবেচনা করে লেখিকা উপন্যাসের অনেক স্থানেই একটি রেখাতেই একটি চরিত্রকে মূল ঘটনাক্রমে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। নমিতার স্কুলের বোর্ডিংয়ে সিপ্রা ও চন্দনার অনুপ্রবেশ[১০] এমনই এক উদাহরণ। উপন্যাসের মূল বিষয় রাজনীতি হওয়ার কারণে এমন কুড়ি কুড়ি চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে খুব সহজেই। শিবশম্ভুবাবু, মহিমদা, স্বরাজ, সুন্দরপ্রকাশ, কুমারী, উর্মি, শুক্লা, মায়া, ছায়া, দেবজ্যোতি, মেনকা, বিনু, সুদর্শন, শীতাংশু, অরুণাংশু প্রমুখ চরিত্রের আবির্ভাব উপন্যাস শুরুর প্রথম থেকেই। উপন্যাসের



www.pathagar.com

শেষে যেয়ে বোঝা যায়, চরিত্রের একটি দীর্ঘ তালিকা নিয়ে সাবিত্র তাঁর গল্প বুনেছিলেন। এবং এদের অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীই, অথবা তাদের সকলেই প্রকৃতপক্ষে একটি সামগ্রিক ও বৃহত্তর পরিমণ্ডল নির্মাণে অংশগ্রহণকারী— কোনো একটা বা একধিক বিশেষ চরিত্রকে বিশেষভাবে রূপায়ণে সাবিত্রী রায় মোটেই আগ্রহী নন।

*স্বরলিপি*-র মূল পরিক্রমা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী তিন-চার বছরের সামগ্রিক রাজনীতি এবং বিশেষভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। স্পষ্ট কোনো সময় দিয়ে উপন্যাস শুরু না হলেও উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর আচরণ ও বক্তব্য দিয়ে বোঝা যায় সাবিত্রী সেকালটাকেই ধরতে চান যখন বাংলার মুক্তিকামী দামাল ছেলেরা এমনকি পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী। পার্টি নেতৃত্বে তখন ধরেছে ঘুণ। উত্তাল সে সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির বিপ্লব অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতাই ছিল পার্টির নেতৃত্বের আমলা মানসিকতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা। ইতিহাস সচেতন সকলেই জানেন পার্টির অভ্যন্তরের ঐ কলুষের কারণেই একসময়ে আসে প্রবল ভাঙন, যার পরিণতি সর্বভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির জন্য ভাল ফল বয়ে আনে নি। বিশেষ মনোযোগের বিষয় এটি যে, সাবিত্রী রায় একজন নারী কর্মী হয়েও পার্টির ভেতরের এ ব্যর্থতাকে চিনতে এবং তার সাহিত্যিক রূপায়ণে ভুল করেন নি।

উপন্যাসের প্রধান পার্টি কর্মীদের মধ্যে পৃথ্বী অন্যতম। সাথে আছে রথী, সাগরী, শীতাংশু, অরুণাংশু, ফল্গু। এদের পত্যেকেই পার্টি-অন্ত-প্রাণ। আবার এরা সকলেই পার্টির নেতৃত্বের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড ও আচরণ সম্পর্কে সচেতন। পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার[১১] পরও এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে আরও যেন বেশি করে নিমগ্ন। সহ্য করেছে অমানুষিক পুলিশি যন্ত্রণা। অথচ নেতৃত্বে যারা সেই নন্দলাল বা তার বিশ্বস্ত সাগরেদ ব্যোমকেশ বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত—শুধু তাই নয়, তাদের সে বিলাস পার্টির টাকায়, যে টাকা পার্টি ফান্ডে আসে কৃষক-মজুরদের এক টাকা দুই টাকা চাঁদা থেকে। নন্দলালের মতো একটি চরিত্রকে উপন্যাসে সমকালেই উপস্থাপন করা সাবিত্রী রায়ের জন্য ছিল এক দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ। পার্টিকর্মী রথীর স্ত্রী সাগরীকে নিজে বিয়ে করার জন্য নন্দলাল যেসব ফাঁদ পেতেছে, অথবা আরেক পার্টিকর্মী চিত্রকর অরুণাংশুকে দিয়ে পিয়নের কাজ করিয়ে নন্দলাল যে আচরণ করেছে তা চিত্রণ এ উপন্যাসে অভিনব। এমনকি পার্টির ফান্ডের টাকা নিয়ে ব্যোমকেশের ক্রিয়াকলাপও যথেষ্ট মনোযোগ দাবি করে। অথচ যারাই এসব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছে তারাই হয়েছে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। কুমার শংকরের মতো একজন সৎ কর্মীকেও পার্টি অন্যায় দোষারোপ করতে দ্বিধা করে নি। এমনটি ঘটেছে পৃথ্বীর ক্ষেত্রেও। শুধু কি বহিষ্কৃত। সাহিত্যিক পৃথ্বী হয়েছে একঘরে। অন্য সকল কর্মীকে নির্দেশ দেয়া হয় পৃথ্বীর সাথে কোনরকম যোগাযোগ না রাখার জন্য। সে পরিক্রমাতেই বহিষ্কৃত হয়েছে রথী। আর নন্দলালের কূটচালে রথীর স্ত্রী পার্টিকর্মী সাগরীকে বলা হয়েছে রথীকে ত্যাগ করতে। ব্যাক্তিগত সকল মানবিক বোধকে অস্বীকার করে পার্টি কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া অন্যায়গুলো নিরলস,



www.pathagar.com

সৎ, একনিষ্ঠ বহু পার্টিকর্মীকে একসময় হতাশ ও ব্যর্থমনোবল করেছিল— এটি বুঝতে বাকি থাকে না। আর তাই সাগরী, অরুণাংশু উভয়েই চলে যায় কৃষক এলাকায়। ফল্গুর উপরও এসেছে অন্যায় ফরমান। অথচ পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনকালে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় এর ব্যাপকতা রোধে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া উদ্বাস্তুদের অধিকার আদায়ে পার্টির এই বহিষ্কৃত কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি আন্তরিক ছিল।

*স্বরলিপি*-র এসব চরিত্র কিন্তু শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গেরই বাসিন্দা নয়। তাদের বিরাট অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেরও নাগরিক। পদ্ম-মেঘনা বিধৌত বাংলার এ অঞ্চলও উপন্যাসটিতে যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গতায় উপস্থাপিত। কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেও উভয় বাংলার প্রাসঙ্গিক হয়েছে। হাজং বিদ্রোহের সংবাদ-তো এ উপন্যাসে রীতিমতো উদ্দীপক তথ্য। হাজং বিদ্রোহের অনেক দূরে অবস্থান করেও সাবিত্রী রায় উপন্যাসের চরিত্রদের এ ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করেন সহজেই। শীতার বাসায় মিঠুর ছোটমা-দের ফেলে যাওয়া কাগজেই-তো আমরা প্রথম পড়ি :

> গুলি চলেছে চাষী-কন্যার বুকে। দুধের শিশু ঢলে পড়েছে হাজং বধূর কোলে। বুকের দুধটুকু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো, জন্মের মত শেষ হল তার স্তন্য খাওয়া। স্তন্যপায়ী শিশুর বুকে গুলি ছুঁড়তে দ্বিধা করে নি সাম্রাজ্যবাদের অনুচরেরা।[১২]

মিঠুর ছোটমা-ই তো পার্বতী এবং মনিকাকা হলো কমরেড নিখিলেশ। দুজনেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কর্মী। এই পার্বতীই ইতিহাসখ্যাত কর্মী ইলা মিত্র; যার বিবরণ আমরা পাই :

> সারাদিন ঘুরছে পৃথ্বী, মামুদপুর মামলার আসামীদের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে। দশ হাজার টাকা তুলে দিতে হবে তিন দিনের মধ্যে। পাকিস্তান থেকে আত্মগোপন করে পালিয়ে এসেছে নিখিলেশ এ টাকা সংগ্রহ করতে। একটা ডিফেন্স কমিটিও গঠন করতে হবে।
>
> পার্বতীসহ সতের জন কৃষকের বিরুদ্ধে মামুদপুর থানার দারোগা হত্যার মামলা চলছে।...সমস্ত কাজের ভিতরে পৃথ্বীর মাথায় ঘুরছে পার্বতীর জবানবন্দী। আজই পত্রিকায় বেরিয়েছে তার উপর অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ।
>
> গুলিতে অগ্নিস্রোতের মত প্রতিহিংসার লাভাস্রোত ধাবিত হচ্ছে পৃথ্বীর অস্তিত্বের শিরা উপশিরায়। শীতের রাতে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে লোহার পেরেক ঢুকিয়েছে সর্বাঙ্গে। ...
>
> জীবনে ভুলতে পারবে না মানুষ— সর্পদংশনের মত এই লাইনগুলি —'Then they pushed hot eggs one after another into my...'[১৩]

আর এভাবে সাবিত্রী রায় রূপ দিয়ে চলেন স্বকালের বাংলার সামগ্রিক এক রূপকে। এরই প্রসঙ্গে গ্রন্থে এসে উপস্থিত হয় আরও দু'টি অনুষঙ্গ—উদ্বাস্তু সমসা এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা।

ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটেই নয় শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ দু'টির গুরুত্ব অপরিসীম। সন্দেহ সেই উদ্বাস্ত বিষয়ে সাবিত্রী রায়ের উপস্থাপনা অপূর্ণ। *স্বরলিপি*-তে বিবৃত হয়েছে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু হিন্দু গৃহহীনদের কথা, পশ্চিমবাংলা



www.pathagar.com

থেকে পূর্ববাংলায় আগত মুসলমান উদ্বাস্তুদের কথা আসে নি। এ প্রসঙ্গে আমরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসে *খোয়াবনামা*-র কথা স্মরণ করতে পারি। সে উপন্যাসে পশ্চিমবাংলা বা ভারত থেকে আগত মুসলমান উদ্বাস্তুদের কথা এসেছে। সাবিত্রী রায় যেহেতু উভয় বাংলাকে তাঁর প্রেক্ষাপটে করেছেন, তাই উভয় ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গটি তাঁর উপন্যাসে প্রত্যাশিত ছিল—যেমনটি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় ক্ষেত্রে তিনি করেছেন। পশ্চিমবাংলায় যাওয়া উদ্বাস্তুদের নিয়ে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মহলের যে কূটচক্র তা-ও এ উপন্যাসে উপস্থিত।

ঘটনার ক্রমঅগ্রসরণে এক পর্যায়ে উপস্থিত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উপন্যাসের সময় ১৯৪৬-এর পর হওয়ায় সে দাঙ্গার চিত্র *স্বরলিপি*-তে লিখিত হয় নি, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ত্যাগের উত্তরকাল তো এ উপন্যাসের গল্প অতিক্রম করছে। আর তাই অতর্কিত এক সংবাদ 'পাকিস্তানে আবার গোলমাল শুরু হয়েছে'।[১৪] ছেচল্লিশের দাঙ্গা কলকাতায় শুরু হয়ে আস্তে আস্তে সারা বাংলায় ছড়িয়েছিল—এবারের দাঙ্গা শুরু হলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সে গোলমাল প্রথমে দেখানো হয়েছে কলকাতা থেকে। হাজার হাজার মানুষ দাঙ্গায় আত্মীয়-পরিজন, ধনসম্পদ হারিয়ে পশ্চিমবাংলায় যেতে তাদের যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে, তারা যে চিঠিপত্র লিখছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে, পত্রিকায় যে সকল সংবাদ ছাপা হয়েছে—এসবের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে দাঙ্গার পূর্ণ চিত্র। উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শীতা তখন পূর্ব পাকিস্তানে এবং সাবিত্রী রায় দেখাতে ভোলেন নি যে, শীতাকে যারা রক্ষা করেছে তারা মুসলমান। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার কারণে পশ্চিমবাংলায় 'রক্তের বদলে রক্ত চাই, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাই[১৫] —শ্লোগান ও পোস্টারে যখন কলকাতার পথঘাট উচ্চকিত, তখন মানবিক বোধসম্পন্ন কিছু মানুষই একত্রিত করে সুস্থ বোধসম্পন্ন সকলকে অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের বিরুদ্ধে। পৃথ্বীরা সবাই কলকাতার দাঙ্গা রোধে সামনের কাতারে। কিন্তু তারপরও রক্ষা হয় না। মধু মুখার্জীর ইন্ধনে কালু গুণ্ডা ও তার লোকজন মুসলমান মেয়ে হাঁশিয়াকে তুলে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণের পর বিবস্ত্র অবস্থায় ফেলে যায়।

ঔপন্যাসিক সাবিত্রী রায়ের জীবনে এটি একটি পরিহাস যে, *স্বরলিপি*-র গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র লেখক ও রাজনীতিক পৃথ্বী পার্টির সমালোচনামূলক বক্তব্যের জন্য বহিষ্কৃত হয় *স্বরলিপি* প্রকাশের পর সাবিত্রী রায়ের ভাগ্যেও বহিষ্কারপ্রাপ্তি ঘটে। বহিষ্কার হয়ে পৃথ্বীর যেমন মনে হয়েছিল 'কি নিয়ে চলতে পারে সে জীবনে। সাহিত্য? কিন্তু কি লিখবে সে?'[১৬] সেই মনে হওয়া দৃঢ়তর হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর। নিজেকে সম্বোধন করে পৃথ্বীর বক্তব্য, 'লেখক তোমার কলম তুলে ধর। কলমে, তুলিতে আর গানে—নতুন সুর বাঁধা স্বরলিপিতে রচনা করো কল্যাণী মানুষের মুক্তির আহ্বান। জানাও দিকে দিকে অনন্ত শান্তির ডাক।'[১৭] সাবিত্রী রায়ের লেখিকা সত্তাও পৃথ্বীর মতো সাহিত্য রচনার ভেতর দিয়ে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া । আর তারই ফল পরবর্তী দু'টি বিশাল উপন্যাস *পাকা ধানের গান* এবং *মেঘনা পদ্মা*।



www.pathagar.com

কম্যুনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ এসকল দ্বন্দ্বের প্রকাশই কি সাবিত্রী রায়কে বিস্মৃতি হবার প্রধান কারণ? পূর্বসূরি এবং সমকালীন অধিকাংশ অন্য লেখিকা যখন ঘরোয়া বিষয়-আশয় নিয়ে লিখতে ব্যস্ত তখন সাবিত্রী ঝুঁকেছেন রাজনীতিকে তাঁর উপন্যাসের বিষয় করতে। স্বীয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই তাঁর পুঁজি। মনন এবং বিশ্লেষণ তাঁর অনুষঙ্গ। সেখানে উত্তাল এই সময়ের বিপুল টানাপোড়েন, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাচিত্র রচনায় একজন পুরুষ ঔপন্যাসিকও সাহস করেন নি, সেখানে সাবিত্রী রায়ের রচনা রীতিমতো প্রথাবিরোধী। সুজিৎ ঘোষ বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে প্রথম উপন্যাসটি থেকেই লেখিকা এক প্রতিষ্ঠান-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসের গুণাগুণ আলোচিত হয় নি, বরং আলোচনা ও প্রচারের অভাবজনিত এক নৈঃশব্দের বাতাবরণ ক্রমশই তাঁর রচনাগুলির ওপর পরিব্যাপ্ত হয়েছে।'[১৮] প্রতিষ্ঠানবিরোধী এ অবস্থানের সাথে যুক্ত হয়েছিল উপন্যাসে বিধৃত পার্টির কিছু কাজ সম্পর্কে কোনো কোনো কর্মীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, যা তাঁকে পার্টি পরিমণ্ডল থেকে দূরে ঠেলে দেয়। *স্বরলিপি* নিষিদ্ধ ঘোষণাকালীন এক প্রবীণ পাঠকের স্মৃতিসমৃদ্ধ আলোচনা রয়েছে যা রীতিমতো উদ্দীপক। সাবিত্রী রায়ের স্বামী শান্তিময় রায়ের ছাত্র সৌরীন ভট্টাচার্য এ আলোচনায় জানিয়েছেন :

> ইতিমধ্যে বাহান্ন সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ... তা 'স্বরলিপি' পড়া শেষ হতে না হতেই আর এক দুঃসংবাদ। ঠিক যে কোনো সংবাদ পাওয়া গেল তা নয়, কীরকম যেন একটা ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে এদিক-ওদিক। বাড়ির বড়রাও যে বেশি কিছু বলতেন তা নয়। সুন্দর দেখতে ঐ 'স্বরলিপি' বইটা আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল, ... শোনা গেল বা জানা গেল বা বোঝা গেল, যাই হোক বইটি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওই রকমই ভাসা ভাসা জানা গেল বইটি পার্টি বিরোধী বলে চিহ্নিত হয়েছে, তাই এ-বইয়ের প্রচার নিষিদ্ধ।
>
> ...ওই সময়ে পার্টির ভেতরের কথায় খানিকটা আলগোছে প্রচার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, লিখিত কোনো সার্কুলার কিংবা ফতোয়া পার্টি সদস্যদের জন্য ছিল কিনা তা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। সম্ভবত ছিল। অন্তরালের চাপাচাপি কতটা ছিল, সে ব্যাপারে নিজের অবস্থা কী ছিল, তাঁর সম্ভাব্য আপত্তি কত তীব্র ছিল এসব কথা আজ হলফ করে বলা শক্ত।[১৯]

আর এভাবেই সাবিত্রী রায় চলে গেলেন বিস্মৃতির গভীর তলে। অথচ পঞ্চাশ বছর আগের সাবিত্রী রায়ের ভাবনা পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী কুম্যুনিস্ট পার্টির ব্যাপারে সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। পার্টির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কর্মীমহলে সকল প্রকার আলোচনা নিষিদ্ধ রাখার ব্যাপারটির তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেজন্যেই তিনি যেমন *স্বরলিপি*-র স্বরকে সমুন্নত রাখতে পার্টির সদস্যপদ ছাড়তে পিছপা হন নি, তেমনি পরবর্তীকালেও নিবৃত হন নি তাঁর জীবনদর্শনকে প্রকাশ করতে। সাহিত্যিক সত্যই ছিল তাঁর একমাত্র আদর্শ। সাহিত্যিক সে চেতনায় যুক্ত ছিল সাম্যবাদ আকাঙ্ক্ষা। পার্টির আদর্শকে তিনি সে আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে স্থান দেন নি। আর সেজন্যেই তাঁর উপন্যাসের মানবিক বোধ পাঠকের কাছে সমাদৃত। দলীয় সংকীর্ণতার উপরে উঠে তাঁর চরিত্রগুলো মানবিক স্পর্শ পেয়েছিল বলেই সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস এখন নতুন করে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। *স্বরলিপি*র এক আলোচনায় সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেন :



www.pathagar.com

সাবিত্রী রায়ের রচনায় একটি গভীর মানবিক আদর্শবাদের ফল্গুধারা প্রবাহিত। এ শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাস নয়, সমাজ মানসে স্বাধীনতাকামী ও স্বাধীনচারী মানুষের, স্বাধীনচারিণী মানবীর যে চলাফেরা তিনি চিত্রিত করেছেন অত্যন্ত সহজে, কোনো ঢাক ঢোল না বাজিয়ে, কোনো দীর্ঘ 'যুদ্ধং দেহি' গোছের বক্তৃতার প্রবর্তন না করেই, সেটাতে সত্যিকার বিস্ময় জাগায়। এটা বিশেষ করে লক্ষণীয় তাঁর নারীচরিত্রে। এরা কেউ প্রেমে সফল, কেউ বা ব্যর্থ, কিন্তু প্রত্যেকেরই হৃদয়বত্তার দু'টি সমান প্রকাশ, একটি তার আদর্শের ক্ষেত্রে, অন্যটি তার মানবিক সম্পর্কগুলির পরিবেশে।[২০]

সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসগুলোতে মানবিক বোধের অনুসন্ধানে সাফল্যের কারণেই কি তাঁর পরবর্তী মহাকাব্যিক উপন্যাস *পাকা ধানের গান* ১৯৮৬ সালে অখণ্ড সংস্করণ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে প্রকাশ পেয়েছিল?

*স্বরলিপি* বা সাবিত্রী রায়ের অন্যান্য উপন্যাসের মতই *পাকা ধানের গান*ও বাংলার উভয় অংশকেই এর ক্ষেত্র করেছে। *স্বরলিপি*তে এসেছিল কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক পরিক্রমা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি। অন্যদিকে *পাকা ধানের গান* বাংলা অঞ্চলের সংঘটিত তে'ভাগা আন্দোলনের মর্মস্পর্শী চিত্র। কৃষকদের সে আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পৃক্ততাসহ পুরো চিত্রটি সাবিত্রী রায় বিধৃত করেছেন, যা শেষ হয়েছে ১৯৪৬-৪৭-এর হাজং বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে। এ উপন্যাস তিনি আবার *স্বরলিপি*-র মতো সংক্ষিপ্ত একটি সময়ের রূপায়ণ না করে ধারণ করেছেন একটি দীর্ঘ কালকে যা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ যুগের শেষ কাল থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরবর্তী তে'ভাগা আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত; যার প্রথম দিককার কিছু *ত্রিসোতা*-তে পাওয়া যেতে পারে; যদিও অবশ্য উল্লেখ্য যে, লেখিকা সেসবের নির্মিতিতে সুস্পষ্ট ভিন্নতা দিয়েছেন। পৌনঃপুনিকতা তাঁর রচনাগুলোকে দুষ্ট করে নি।

ত্রিশ ও চল্লিশে দশকের বাংলাভাষী অঞ্চলে যে বিপুল প্রস্ফুরণ তা নিয়ে উপন্যাস রচনার কি শেষ থাকতে পারে! স্বদেশী যুগের অগ্নিগর্ভ সময় অতিক্রম করে বীর্যবান সেসকল তরুণ ঝুঁকছে তখন নতুন বিশ্ববীক্ষার দিকে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা—যার কাঁপনে বঙ্গবাসীও উদ্বেগাকুল। তারই মধ্যে এলো বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন। বছর না পেরুতেই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সাথে মজুতদার ও জোতদারের যোগসাজশে ছারখার হয়ে গেল বাংলার সাধারণ বিত্তের জীবনযাপন। পঞ্চাশের (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে) যে মন্বন্তরে সরকারি হিসেবেই মারা গিয়েছিল ১৫ লাখের বেশি মানুষ, বেসরকারি হিসেবে যে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ লাখ[২১]—তারই মধ্যে শুরু হলো তে'ভাগা আন্দোলন–কৃষকের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার আমৃত্যু প্রচেষ্টা। বাংলা অঞ্চলের অধিকাংশ জেলার মানুষ সাড়া দিল সে আহ্বানে। একই কাতারে দাঁড়িয়ে সাহস যোগালো শিক্ষিত প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবী। বাঙালি জীবনের ঘটনাবহুল সে-সময়ের সামগ্রিক চিত্র বাংলাভাষায় রচিত উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য না হলেও তার সংখ্যাকে কি প্রতুল বলা চলে? বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনকে একমাত্র উপাত্ত করে রচিত উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) *জাগরী* (১৯৪৬) ছাড়া কোনো ভাল উদাহরণ কি আমাদের



www.pathagar.com

আছে? পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়েও তো মাত্র গোটাকয়েক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *অশনিসংকেত* (১৯৪৪), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭১) *মন্বন্তর* (১৯৪৪) এবং গোপাল হালদারের (১৯০২-১৯৯৩) ত্রয়ী উপন্যাস *পঞ্চাশের পর* (১৯৪৪), *উনপঞ্চাশী* (১৯৪৬) এবং *তেরশ পঞ্চাশ*[২২] (১৯৪৫)। এছাড়া সরোজকুমার রায় চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৭২) *কালোঘোড়া* (১৩৫৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) *চিন্তামণি* (১৯৪৬), সুবোধ ঘোষের (১৯০৮-১৯৮০) *তিলাঞ্জলি* (১৯৪৪), আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) *সূর্য দীঘল বাড়ি* (১৯৫৫), অমলেন্দু চক্রবর্তীর (জন্ম ১৯৩৪) *আকালের সন্ধানে*[২৩] (১৯৮২) উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রাসঙ্গিক হিসেবে প্রবিষ্ট হয়েছিল এমন অন্য কয়েকটি উপন্যাস হলো সুমথনাথ ঘোষের (১৯১০-১৯৮৪) *সর্বংসহা* (১৯৪৪), ভবানী ভট্টাচার্যের[২৪] (১৯০৬-১৯৮৯) ইংরেজি উপন্যাস *So Many Hungers* (১৯৪৮) এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৯-১৯৯০) একমাত্র উপন্যাস *মাটি ও মানুষ* (১৯৬৮), আলাউদ্দিন আল আজাদের (জন্ম ১৯৩২) *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪)। বাঙালির দুর্ভাগ্য এই যে মন্বন্তর নিয়ে কিছু উপন্যাস রচিত হলেও তেজোদীপ্ত বাঙালির দুর্মর সংগ্রাম তে'ভাগা আন্দোলন নিয়ে বিশেষ কোন উপন্যাস রচিত হয় নি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*-য় তে'ভাগার প্রসঙ্গ অনেকখানি আসলেও দুর্ভিক্ষের দূরতম ইঙ্গিত রয়েছে মাত্র। যদিও দাঙ্গা প্রসঙ্গ *খোয়াবনামা*-য় এসেছে পরিপূর্ণ বিস্তৃতিতে। ব্যাপক দাঙ্গার পরিচয় যেসব উপন্যাসে রয়েছে তার মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১), নারায়ণ চৌধুরীর (১৯১৮-১৯৭০) *লালমাটি* (১৯৫১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গটি অন্য যেসকল উপন্যাসের ঘটনাস্রোতে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) *উত্তরণ* (১৯৭০), আবুজাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮৯) *পদ্মা মেঘনা যমুনা* (১৯৭৪), শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *জননী* (১৯৫৮), শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) *সংশপ্তক* (১৯৬৫), অসীম রায়ের (১৯২৭-১৯৮৬) *একালের কথা* (১৯৫৩) প্রভৃতি। হয়তো কৃষণ চন্দরের *গদ্দার* (১৯৬০), খুশবন্ত সিং-এর *ট্রেন টু পাকিস্তান* (১৯৫৬) বা অতি সম্প্রতি রচিত শশি ঠারুরের *রায়ট* (২০০১)-এর মতো সম্পূর্ণতাই দাঙ্গা বিষয়ক কালজয়ী উপন্যাস বাংলাভাষায় দুর্লভ। দাঙ্গা নিয়ে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও যতটুকু ঘটেছিল তেমনটি তে'ভাগার উপন্যাস না থাকা নিয়ে পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেন : 'দুঃখের বিষয় তে'ভাগার আন্দোলনকে নিয়ে এই ধরনের উপন্যাস প্রচেষ্টা আমাদের প্রধান ঔপন্যাসিকেরা কেউ করেন নি।'[২৫] *খোয়াবনামা*-র চল্লিশ বছর আগে *পাকা ধানের গান*-এ তে'ভাগার বিপুল উপস্থিতি আমাদের স্মরণে আসে না, যেহেতু এর লেখিকা হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলে।

*পাকা ধানের গান*-এর পর্ব তিনটি আলাদা-আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। অখণ্ড সংস্করণটি প্রকাশ পায় ১৯৮৬-তে, যার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে ১৯৯০-এ। অখণ্ড সংস্করণে কোনো পর্ব উল্লেখ নেই। অখণ্ড সংস্করণকে সংক্ষেপিত বলা হয়েছে।[২৬]



www.pathagar.com

*পাকা ধানের গান* হিন্দি, মালয়ালাম ও চেক ভাষায় অনূদিত হয় এবং সমাদর লাভ করে। এস, উপাধ্যায় হিন্দী ভাষায়, দুর্বান জবাভিতেল চেক ভাষায় এবং এম. এন. সত্যার্থী মালয়ালাম ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। অখণ্ড সংস্করণে সাড়ে ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি বাংলাভাষী অঞ্চলের সর্ব অগ্রণী রাজনৈতিক উপন্যাস। মহিলা উপন্যাসিকদের মধ্যে আর শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক কথাসাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে সাবিত্রী রায় সর্বাগ্রে উল্লেখ্য এবং সফল এক কথাশিল্পী; যার উত্তরসূরী হিসেবে মহাশ্বেতা দেবীকে (জন্ম ১৯২৬) চিহ্নিত করা চলে। বাংলা কথাসাহিত্যে একই রূপ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন আর যে একজন মহিলা কথাকার, তিনি হলেন সুলেখা সান্যাল; যাঁর উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি।

*পাকা ধানের গান* উপন্যাসে ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের যে উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক সময়কে চিত্রায়িত করা হয় তার প্রধান হল পার্থ। একুশ বছর বয়সী পার্থকে পাওয়া যায় উপন্যাসের প্রথম লাইন থেকেই। এরপর পার্থর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। এক পর্যায়ে হাজং এলাকা। চূড়ান্ত বিদ্রোহের এক সময় পত্রিকা অফিসে টেলিপ্রিন্টার শিটে নিউজ : 'হাজং অঞ্চলে তে'ভাগা আন্দোলন তোরজোর চলেছে। খুব লড়াই করছে চাষীরা। ...মেশিনগান দিয়ে গুলি চালাচ্ছে হাজংদের ওপর। সতের জন আহত হয়েছে।...একজন কৃষক নেতা পার্থ দাস গুলিতে নিহত।[২৭] হাজংদের এই যে রণসাজ তার চূড়ান্ত বর্ণনা সাবিত্রী যেভাবে দেন:

> ঘরে বাইরের সে কফিন স্তব্ধতা ভেদ করে হঠাৎ বনের ভেতর থেকে শিঙা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে চলে সে সাংকেতিক শিঙার বেতার বার্তা।
> সমস্ত রক্তকণিকা দিয়ে শোনে পার্থ অরণ্য-প্রান্তের সে শিঙার প্রতিধ্বনি। স্নিগ্ধ একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে অধর প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে আর খানিকটা রক্ত বেরিয়ে আসে ক্ষত দিয়ে।
> সন্ধ্যা হতে না হতেই হাজার হাজার হাজং সারি বেঁধে টিলার ঢালু বেয়ে নিচে নেমে আসে। আসে হাজার হাজার ডালু, কোচ, গারে বানাই—প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক, লাঠি-সড়কি, বর্শা। দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনীর মতো অন্ধকারের শালবনের ভেতর দিয়ে ছুটে আসে। মশালের পর মশাল। মাদলের গুরু গুরু আওয়াজ আর মশালের গণনাতীত সংখ্যা দেখে ভয় পেয়ে যায় মিলিটারি সশস্ত্র বাহিনী। সৈন্যের ঘাঁটি তুলে নিয়ে যাবার হুকুম আসে ওপরওয়ালার।[২৮]

সংগঠিত হাজংদের বিদ্রোহী কার্যক্রমের এই যে বর্ণনা তা থেকে ধারণা করা যায় তৎকালীন রাজনীতির কর্মকাণ্ড নিয়ে সাবিত্রী রায়ের ধারণা কত প্রত্যক্ষ। বিপ্লবী দলের ছেলে হিসেবে পার্থর প্রথম উপস্থিতি থেকে সংগ্রামী নেতা হিসেবে তার ক্রমঅগ্রসরণ ঘটে। জেল খাটার পর পার্থ ক্রমশ ঝোঁকে সমাজতন্ত্রের দিকে। ব্রিটিশ-বিরোধিতার সাথে তখন যুক্ত হয়েছে অত্যাচারী ধনিক জমিদার বিরোধিতাও। তবে ব্রিটিশ-বিরোধী বা জমিদার-বিরোধী যাই হোক না কেন এ দলভুক্ত মানুষদের ওপর সরকারি নির্যাতন কোনদিনই কমে নি।

*পাকা ধানের গান*-এর জন্য সাবিত্রী রায় যে প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেন তার বিশালতা যোকোনো উপন্যাস-পাঠককেই বিস্মিত করবে। দিঘির পাড়, তালপুকুর, মনসাডাঙ্গা, শ্যামডাঙ্গা, শ্যামগঞ্জ নদীবিধৌত বাংলার এসকল গ্রামের পটে সাবিত্রী রায় হিন্দু-মুসলমান,



www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ-শূদ্র, জেলে-কৃষক সকল ধর্ম, শ্রেণী ও পেশার একটি সমাজকে উপস্থাপন করেছেন, যার বাসিন্দা উপন্যাসের কলাকুশলীরাও। তাদের কেউই অনন্য নয়, তারাও যেন উপন্যাসকে অনুল্লেখিত অন্য মানুষদের মতো সাধারণ। উপন্যাসের কাহিনী আবার ঐ সকল গ্রামের কোনো বিশেষ পরিবারে গণ্ডীবদ্ধ নয়, বিস্তৃত হয়েছে অনেক পরিবারে, সম্পৃক্ত হয়েছে অনেক মানুষ। আর তাই পার্থকে দিয়ে উপন্যাস শুরুর পর ক্রমে ক্রমে সেখানে সমবেত হয়েছে দীনবন্ধু মাস্টার, দেবকী, সুবালা, সুখদা, কেতকী, কুন্তী, সাথী, মফির মা, আমিনুদ্দীন, আমিন, জগাই বাঁড়জ্যে, আলি, পার্থর বাবা সুদাম, লক্ষ্মণ, অমূল্য, কুণ্ড মাঝি, আল্লাবক্স, মঙ্গলা, অর্জুন, লক্ষ্মী, দাসুর মা, মেঘীসহ আরও অনেকে। নিকটবর্তী ঐ গ্রামপুঞ্জ থেকে কাহিনী ছড়িয়েছে কাঞ্চনপুরে; সেখানে দেবকী স্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে পাওয়া যায় ইশানী দেবী, সুন্দর ঠাকরুণ ও লতার মতো চরিত্র। আবার দেবকীর শ্বশুরবাড়ি একই গ্রামে যখন হলো তখন আরও অনেক চরিত্র এসে যুক্ত হয় এদের সাথে। দেবকীর মামী শাশুড়ি, ননদত্রয় পুসি-টুসি-হাসি, বিধবা জা আন্না, স্বামী রাজেন। আর বিপ্লবী সুলক্ষণ সরকারও ঐ বাড়িরই ছেলে।

প্রথম পর্বের মাঝমাঝি জায়গায়[২৯] আমরা পেলাম নতুন আরও একটি স্থান পাহাড়পুর দক্ষিণবঙ্গের আগের গ্রামগুলো থেকে অনেক দূরে। কারাবাসের দিনশেষে পার্থর অন্তরীণ হয়েছে ঐ এলাকায়। দক্ষিণের সে গ্রামগুলো পার্থকে দিয়েছিল চেতনা, যা চূড়ান্ত বিপ্লব কার্যে উত্তরের ঐ পাহাড়পুর এলাকায় স্মরিত। পাহাড়পুরের নতুন মানুষদের মধ্যে রয়েছে সারথী, সরস্বতী, শঙ্কমান, বাসুমনি, আলাপী, কার্ত্তিক চৌকিদার। পনের-ষোল পৃষ্ঠার এই অংশ শেষে আমরা দেখি পার্থর অন্তরীণকাল শেষ। এই অংশটি *পাকা ধানের গান* উপন্যাসের মূল উপপাদ্য হাজং বিদ্রোহী প্রেক্ষাপট নির্মাণে প্রধান নিয়ামক। এই অংশে হাজংদেরকে যে সপ্রতিভ চরিত্রে দেখানো হয়েছে তা দ্বিতীয়বার যখন আমরা পাহাড়পুরে উপস্থিত হই[৩০] তখন বিদ্রোহী চেতনায় পরিবর্তিত। সেখানে বিপ্লবী গণেশ দাসের সশরীর উপস্থিতি। কিছুদিন পর সেখানে সুলক্ষণ ও তর স্ত্রী লতা উপস্থিত। আর এভাবে পাহাড়পুরের হাজং বিদ্রোহের লেখ্যরূপ দেওয়ার জন্য সাবিত্রী রায় স্বাবলম্বী একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করে ফেলেন।

ইতোমধ্যে প্রথম পর্বের দুই-তৃতীয়াংশ শেষে[৩১] পার্থর অবস্থান হয় কলকাতায়। সেখানে ভদ্রার সাথে তার পরিচয়; যে কিনা আর একটি প্রধান নারী চরিত্র হিসেবে উপন্যাস পরিস্ফুটিত। ভদ্রা সূত্রে আরও যারা উপস্থিত হয় তারা হলো—আনন্দবাবু, *নিউ লাইট* পত্রিকার ফটোসাংবাদিক অবাঙালি কুনাল কুরূপ প্রমুখ। আত্মীয়বাড়িতে বেড়াতে যেয়ে ভদ্রার সূত্রে আরও পাওয়া যায় সত্যদর্শন, টিয়া ও টিপুর মত ছোট চরিত্রগুলো। মৃত স্বামীর বাড়িতে (শহরটি যশোর বলে অনুমান[৩২]) অবস্থানকালে তার সাথে যোগাযোগ ঘটে আইরিশ সৈনিক অ্যানড্রু ও'দোনেল বা ও'নীলের। আর এভাবেই দক্ষিণবঙ্গ থেকে উপন্যাসের প্রেক্ষপট উত্তরবঙ্গ হয়ে বাংলাই শুধু পার হয় নি, হয়েছে ভারতবর্ষের সীমানাও। *পরিচয়* পত্রিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন :



www.pathagar.com

> প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পড়তে পড়তেই আশঙ্কাই জাগে, ভয় হয় এতগুলি বিচ্ছিন্ন বিভিন্নমুখী চরিত্রের সামঞ্জস্য কি সম্ভব হবে? সুলক্ষণ ও লতার কাহিনী, সারথি ও সরস্বতীর প্রেম, দেবীর সংক্ষুব্ধ জীবনেতিহাস, আলি ও মেঘীর কাহিনী, ফোটোগ্রাফার কুনালের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, চোরাকারবারী দুলাল দত্তের সংসার, আনন্দবাবু ও ভদ্রার জীবনবৃত্ত—এদের সকলকে একটি সমগ্রতার মধ্যে নিয়ে পরিপূর্ণ ঐক্য পরিণতি কি দিতে পারবেন লেখিকা? কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের শেষাংশ থেকেই বোঝা যায় এতগুলি চরিত্র ও ঘটনা ভিন্নমুখী গতিকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি তাঁর আছে; তৃতীয় খণ্ডে এসে অতি স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ধারাগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাব একটি ধারায় মিলে গেছে।

অন্যদিকে কলকাতায় দেবকীর অবস্থান নেয়ার সূত্রে গড়ে উঠেছে আরও একটি চরিত্রজগত। হেনামামী, দুলালমামা, সুখলালের মত অর্থগৃধ্নু চরিত্রগুলোকে আমরা এখানেই পেয়েছি। সর্বরকম অত্যাচারের অতিষ্ঠ হয়ে দেবকী যখন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তখন তার উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ অন্নপিসি— দেবকীরই মতো আর এক অসহায় কিন্তু সংগ্রামী নারী। দেবকী পরে যখন যক্ষ্মা হাসপাতালে চাকরি নেয় তখন আরও যারা ভীড় করে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে রয়েছে আশাদি, মিহিরবাবু, রাখিদি, অসীম। আর এভাবেই কয়েকশত চরিত্র উপন্যাসের কালের ভেতর দিয়ে গ্রন্থের ঘটনাসমূহকে কোনো না কোনোভাবে স্পর্শ করেছে। এ সকল চরিত্রর মধ্যে পার্থ, দেবকী, ভদ্রা প্রধান ঘটনাসমূহের নিয়ন্ত্রক হলেও সুলক্ষণ, আলি, মেঘী, সারথি সরস্বতী কুনাল প্রভৃতি চরিত্রও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর সেজন্যই বোধহয় একজন সমালোচক *পাকা ধানের গান* উপন্যাসের আলোচনায় বলেছেন :

> নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণার কোন আকর্ষণই সাবিত্রী রায়ের নেই। কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ বীরত্বের শক্তি এবং সম্ভাবনার প্রকাশ ও গ্রামটি এর বিপ্লবী সরল অধিবাসীরা।[৩৩]

*পাকা ধানের গান* হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির এক অনুপম চিত্র। উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন যেমন এ উপন্যাসে মিলেমিশে আছে তেমনি চেতনাগতভাবেও তাদের অবস্থান খুবই কাছাকাছি। লক্ষ্মণ যে আমিনুদ্দির বাড়িতে যায় গাজির গান শুনতে অথবা গুরুগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় মঙ্গলার যে বিশ্বাস পীরের পূজো দিলে গরুর মঙ্গল হবে, তীব্র ঝড়ের দিনে আমিনুদ্দির বাড়িতে যখন হরি ও আল্লাহ উভয়ের নামই ধ্বনিত হয়—তখন ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত ও চেতনাগত নৈকট্য উপলব্ধি করা যায়। আর সচেতনভাবে সাবিত্রী রায় যে কাজটি করেছেন তা হলো আলির সাথে ব্রাহ্মণের বিধবা মেয়ে মেঘীর প্রেম ও বিয়ে। আলি ও মেঘীর এই বৈপ্লবিক কাজটি কিন্তু উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে সামাজিক অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই। মেঘীর জন্মকালেই বাপ মারা যায়। বিয়ের পরপর স্বামীকেও হারায়। এমন অভাগী মেয়ের জায়গা কোথায়! পৈতে বিক্রি করেই চলে মা-বেটির সংসার। সেখানে আলির উপস্থিতি মেঘীর ভেতরে জাগায় স্বপ্ন দেখার সাহস।'ঐ মুসলমান ছেলেই একমাত্র ব্যথার ব্যথী তার'[৩৪] কিন্তু সে স্বপ্ন কি পূরণ হবার জন্য জেগেছে? জগাই বাড়ুজ্জ্যে, যে কিনা মেঘীর শরীর চেয়ে পায় নি, থাকে ওৎ পেতে। তারপর ওদের ভালবাসাবাসি ফাঁস হয়ে গেলে মাথা মুড়িয়ে মেঘীর গালে পোড়া



www.pathagar.com

ছ্যাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু পার্থর দৃঢ়তার কারণেই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় সবকিছু। রেজিস্ট্রি করে বিয়ের জন্য ওদেরকে ট্রেনে তুলে দেয় পার্থরা। আর এভাবেই আলি মেঘীর নতুন এক জীবন শুরু হয়; যা হিন্দু-মুসলমান সমাজের জন্য এক নতুন ইঙ্গিতের সূচনা বৈকি। আলি-মেঘী চলে গেলে পার্থর বাবা সুদাম এবং মা মঙ্গলার নিজের ভাবনা দিয়ে এ অধ্যায় আপাতত শেষ হয় :

> সুদামও নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে ঘরে। কাজটা একবার সায় দেয়, একবার দেয় না মনে, বামুনের মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে–ঘর সংসার চলবে কি ভাবে কে জানে? নামাজ পড়বে, কলমা পড়বে মেঘী? আবার ভাবে, নামাজ কি আলিই পড়তো কেনোদিন? এরা সব আলাদা জাত। আলাদা যুগের আলাদা মানুষ। পার্থ, আলি লক্ষ্মণ—এরা কলিকালের ছেলে সব, এছাড়া এ বিয়ে না দিলেও মেয়েটার দুর্দশার অন্ত থাকবে না।
>
> মঙ্গলা মেঘীদের রওয়ানা করে দিয়ে এসে বলে 'গালের উপর টিকে আগুন দিয়ে ছ্যাকা দিয়ে দিয়েছে মেয়েটার। এরা কি মানুষ নয়?'[২৫]

জমিদারী অত্যাচারের এক জীবন্ত দলিলের মত *পাকা ধানের গান*। সে অত্যাচার কখনও একজন ব্যক্তির ওপর আবার কখনো একটি সামাজিক দলগোষ্ঠীর ওপর নেমেছে। সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের উঠে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা এতে রয়েছে। আর সে জন্যেই তো এতদ্‌অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সামাজিক আন্দোলন তে'ভাগা-হাজং বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল। কবে নাকি দু'হাজর টাকা কর্জ নিয়েছিল সে অজুহাতে জমিদারের আমিন জগাই বাড়ুজ্যে মফির মা'র জমি যেমন দখল করে, আবার পথকর না দিলে চলাচল নিষেধ তেমনি একটি শমন আসতেও খুব বেশি দেরি হয় না। জমিদারে ছত্রছায়ায় থাকা এসব অত্যাচারী মানুষই নীচুতার চূড়ান্ত প্রমাণ করে। এদের বিরুদ্ধেই আলির অবস্থান বলে তার ওপর নির্যাতন বেশি। তাদের এমন অত্যাচার তো পাহাড়পুর এলাকায় তীব্রতর। পার্থরা যাদের সংগঠিত করছে তাদের বেশিরভাগই হদি। ক্ষত্রিয়জ মর্যাদার দাবিদার এই হদিরা হলো রাজা হৈহয়ের বংশধর। তাদের হাতের পদ্মফুল না হলে মায়ের পুজো হয় না, অথচ তাদেরকে পূজায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। এভাবে ধর্মীয় অত্যাচার যেমন আছে, তেমনি আছে সামাজিক অত্যাচার। কিন্তু প্রকৃতিগত বিদ্রোহী চেতনার অধিকারী মানুষ মেনে নেয় নি এসব। আন্দোলন হয়েছে। হদিরা প্রতিমা কাঁধে নিতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনই হয় নি। পরে বাবুরা রাজি হয়েছে পুজোকে সর্বজনীন করতে। এই বিদ্রোহী চেতনারই অঙ্গ হিসেবে এক সময় আসে টংক আন্দোলন। জমির ধান কৃষকেরা জমিদারের গোলায় তুলতে রাজি হয় না; যার পরিণতিতে হাতি আর লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে হাজংদের ঘর-বাড়ি ভেঙে দেয়া হয়েছে। শঙ্খমানকে ধরে নিয়ে জমিদারের পাইকরা দিনরাত শারীরিকভাবে অত্যাচার করেছে। কিন্তু মাথা নত করে নি হাজংরা। ব্যাপকভাবে সংগঠিত হাজংদের ওপর শেষ পর্যন্ত ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে, যার চূড়ান্ত ঘটেছে মেশিনগানের গুলিতে পার্থর মৃত্যুতে।



www.pathagar.com

ব্রিটিশ বিরোধিতা ও জমিদারী বিরোধিতার পাশাপাশি সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস নারীর বিদ্রোহী চেতনারও প্রতিরূপ। নারীকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে উপস্থাপনে সাবিত্রী রায় দৃঢ়চেতা। নিজের জীবনে যেমন নারীত্ব কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি, তেমনি তাঁর নারী চরিত্রকে তিনি সততা ও ন্যায়ের পথে, আদর্শ ও দেশেপ্রেমের পথে নিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা রাখেন না। তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকেই এ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। *স্বরলিপি* ও *পাকা ধানের গান*-এ তা হয়েছে বিস্ময়করভাবে স্বচ্ছ। *ত্রিসোতা*-র পদ্মার বিদ্রোহী চেতনা অনেক বেশি সংহতরূপে প্রকাশ পায় *স্বরলিপি*-র সাগরী ও শীতার ভেতর দিয়ে। এরা দুজনেই সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে, কিন্তু দুজনেই আবার অসাধারণ তাদের ভাবনা ও আদর্শবোধ। পার্টির নির্দেশ মাথা পেতে নিতে সাগরী তার স্বামী রথীকে ত্যাগ করেও তার ভালবাসাকে কুলষিত করে নি। যখনই বুঝেছে তার ব্যক্তিজীবনকে ক্ষতি করতেই পার্টিনেতৃত্ব উপায় খুঁজছে সে প্রতিবাদ করেছে, কলঙ্কের কালি কপালে মেখে চলে গেছে কৃষক এলাকায় আন্দোলন সম্পৃক্ত হতে। আর এভাবেই একসময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে মৃত্যু ঘটে সাগরীর। শীতাও কি কম। ভালবাসলেও তার বিয়ে হয় নি পৃথ্বীর সাথে। বিয়ে হয়েছিল যে দেবজ্যাতির সাথে তার মৃত্যুতে বিধবা শীতার একমাত্র আশ্রয় হয় শিশুসন্তান মিঠু। কিন্তু পরে বোঝা যায় সেও এক ছাইচাপা আগুন। তাই শাশুড়ির মৃত্যুকালে সে শ্বশুরের ভিটাতে যেয়েও সেখানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে পলাতক কমরেডদের । তারই আশ্রিত ছিল নিখিলেশ—পার্বতীর স্বামী; যে কিনা হাজং বিদ্রোহের সময় পুলিশের গুলিতে আহত হয়। শুধু কি তাই! নিজেও তো চেষ্টার ত্রুটি করে নি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এড়াতে। *পাকা ধানের গান*-এর দেবকীর মত একটি বিদ্রোহী চরিত্র তৎকালীন বাংলা উপন্যাসে হয়তো দুর্লভ। হয়তো পারিপার্শ্বিকতার চাপে দেবকী নুইয়ে পড়তে চায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বিদ্রোহীসত্তা অপরাজেয়। দেবকী তো অত্যাচারী স্বামীর পদবী পর্যন্ত নিজের নামের সাথে লাগাতে নারাজ। ভেতরেও কি ধর্ম-সমাজের প্রচলিত প্রথাবিরোধী একজন নারীর শক্তিশালী অস্তিত্বকে আমরা অনুভব করি না? এমনকি ঈশানী দেবী এবং লতাও তো সমাজ পরিবর্তনের কম অগ্রণী নয়। স্বকালের বিদ্রোহী নারী সমাজের কর্মকাণ্ডে সাবিত্রী রায়ের ছিল অচ্ছেদ্য সম্পৃক্ততা। আর সেজন্যেই তো *স্বরলিপি*-র উৎসর্গে ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯-এর যে পাঁচজন শহীদের নাম উৎকীর্ষণ তাঁদের মধ্যে চারজনই নারী।[৩৬]

*পাকা ধানের গান* সন্দেহাতীতভাবেই একটি সফল রাজনৈতিক উপন্যাস। জীবন-ঘনিষ্ঠতায় সফল সামাজিক চিত্রণ এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। সাবিত্রী রায়ের সাফল্য অথবা কৌশল এই যে, তিনি উপন্যাসটিকে সম্পূর্ণত একটি রাজনীতির পরিমণ্ডলে আবদ্ধ না রেখে বরং ঘটনাক্রমের মূল ভিত হিসেবে রেখেছেন বাঙালির দৈনদিন সামাজিক ও পারিবারিক জীবন। *পাকা ধানের গান*-এর আরও একটি বিশিষ্টতা এই যে লৌকিক জীবনাচরণ সারা উপন্যাসটি জুড়ে বর্তমান যা উপন্যাসটির মূল গল্প-কাহিনীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে উপন্যাসটিতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। সেকালের বাঙালি জীবনের লৌকিক বিবিধ অনুষঙ্গ উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে পুঁথির



www.pathagar.com

গল্প আর গান নিয়ে। লাউল[৩৭] সাজানোর গল্প, হলুদ বাটার গান,[৩৮] নীল সাজা,[৩৯] আহ্লাদী পুতুল বানানো,[৪০] গাজীর পট দেখানো,[৪১] কালী নাচ,[৪২] মনসার পাচালী পাঠ,[৪৩] মাঘমঙ্গলের ব্রত,[৪৪] তোষলা ব্রত[৪৫] এমনই কিছু উদাহরণ। লোককাহিনী লোকপূরাণের কতকত গল্পও এসে মিশে আছে *পাকা ধানের গান*-এর মূল গল্পের ভেতর। এবং নির্দ্বিধচিত্তে বলা চলে যে, *পাকা ধানের গান* লৌকিক সংস্কৃতির যে কোনো গবেষকের জন্য একটি মূল্যবান দলিল হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও সাবিত্রীর উপন্যাসের এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। *স্বরলিপি* ও *পাকা ধানের গান* উভয় গ্রন্থেই বহু রবীন্দ্র গান ও কবিতার উদ্ধৃতি লেখকের মনন ও পাঠগত চিত্রকে পরিস্ফুটিত করে।

সাবিত্রী রায়ের পরবর্তী দীর্ঘ উপন্যাস *মেঘনা-পদ্মা*[৪৬]-র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে। সাত শতাধিক পৃষ্ঠায় এ উপন্যাসটির শেষাংশ *সমুদ্রের ঢেউ* আলাদাভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৬৮-তে। সাবিত্রী রায়ের শেষ দু'টি উপন্যাস হল *ঘাসফুল* (১৯৭১) ও *বদ্বীপ* (১৯৭২)। *ঘাসফুল* উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কে ঘিরে। উত্তাল রাজনীতির সেসব যুবক বাংলাদেশের এক মফস্বল শহর যশোর কমব্যস্ত। এ উপনস্যাসের প্রধান চরিত্র অধ্যাপক সুগতর সাথে যোগাযোগ ঘটেছে ব্রিটিশ প্লেনচালক পিটারের। সাম্যবাদের বিশ্বনন্দিত মতবাদে পিটারও সুগতদের সাথে একই কাতারে উপস্থিত। পারিবারিক নৈকট্যে পিটার চলে আসে সুগতর বোন পূর্বারও কাছাকাছি। তাই প্লেন যুদ্ধে পিটার মারা গেলে পূর্বাদের পরিবারে নেমে আসে তমস এক স্বব্ধতা।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের শুরু থেকে পঞ্চাশ দশকের প্রথম বছরগুলো পর্যন্ত বাংলা অঞ্চল অতিক্রম করেছে কঠিন এক সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় হাঁসফাস বাঙালি জীবন, যার সাথে যুক্ত রয়েছে ধুরন্ধর রাজনীতি। সবশেষে মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যায় কণ্টকিত এমন কঠিন সময় বাঙালি আর কখনো অতিক্রম করে নি। উল্লেখ্য যে, এ-সবের ভেতরে দেশের প্রগতিশীল সিংহভাগ মানুষ সেকালে যুক্ত হয়েছিল তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আন্দোলনে–স্বদেশী পার হয়ে সাম্যবাদের পথে তে'ভাগা ও হাজং বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ঐ সময়ের এই উত্তুঙ্গতা সামগ্রিকরূপে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রয়োজনানুযায়ী উপস্থাপিত হয় নি। সে-সময়ের সাথে সমকালীন লেখকদের সম্পৃক্ততা কম থাকায় বা পরবর্তীকালে সে সময়কে ইতিহাস পাঠের ভেতর দিয়ে আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের উপন্যাস বঞ্চিত হয়েছে। সামান্য যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছিল তার মধ্যে সাবিত্রী রায়ের অন্তত *পাকা ধানের গান* উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হতে পারে। রাজনীতির নির্মম কুটিলতায় সাবিত্রী রায় এবং তাঁর গ্রন্থাবলি আজ পাঠক সমাজের দৃষ্টির বাইরে। বাংলার সামাজিক-ধর্মীয় লৌকিক সমাজকে রাজনীতির বিশ্লেষণে স্পষ্ট করে সাবিত্রী রায় তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। নারী হয়ে ঘরে বন্দী থাকেন নি তিনি। তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা বিপুল বিস্তার লাভ করেছিল। সাবিত্রী রায়ের সাহিত্য নতুন ও গভীর মূল্যায়নের দাবি রাখে।



www.pathagar.com

## তথ্য নির্দেশ

১. গার্গী চক্রবর্তী, 'ব্যক্তিমানুষ সাবিত্রী রায়', *সাবিত্রী রায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন*, (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ. ১৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২
৩. সাবিত্রী রায়, *ত্রিসোতা*, (কলকাতা : দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্কারণ, ১৯৬১), পৃ. ৮১
৪. স্বল্পায়ু সুলেখা সান্যালের জন্ম ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদি গ্রামে। প্রথম ছোটগল্প 'পঙ্কতিলক' ১৯৪৪ সালে *অরণি* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে অর্থে বিবেচনা করা যায়, সাবিত্রী রায় থেকে দশ বছর বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও সুলেখা সান্যাল সাহিত্যচর্চা শুরু করেন একই সময়ে। প্রথম উপন্যাস *নবাঙ্কুর* ও ছোটগল্প সংকলন *সিঁদুরে মেঘ* যথাক্রমে ১৩৬২ ও ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায়। ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ও ধীমতী লেখিকা ১৯৫৯ সালে মস্কো যান চিকিৎসার জন্য। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *দেওয়াল পদ্ম* (১৯৬৪)।
৫. ত্রিসোতা, পৃ. ১০০
৬. *সাবিত্রী রায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন*, পৃ. ১৩৩
৭. সাবিত্রী রায়, *স্বরলিপি*, (কলকাতা : রত্না প্রকাশন সংস্কারণ, ১৯৯২), পৃ. ২।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৯. সুজিৎ ঘোষ, 'ভূমিকা', *স্বরলিপি*, প্রাগুক্ত, পৃ. iii
১০. *স্বরলিপি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-২৩৮
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১
১৮. সুজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ii
১৯. সৌরীন ভট্টাচার্য, 'স্বরলিপি : স্বগত কথন', দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) *পরিকথা*, (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : পশ্চিমবঙ্গ, মে ২০০০), পৃ. ১৫৬-১৫৭
২০. সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস', নীরা রহমান (সম্পা.), *চতুরঙ্গ*, (কলকাতা : বর্ষ ৫৩, সংখ্যা ৮, ডিসেম্বর ১৯৯২), পৃ. ৫৫৫
২১. ড. বিনতা রায়চৌধুরী, *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য*, (কলকাতা : ১৯৯৭), পৃ. ৫
২২. মুদ্রণ বিভ্রাটের কারণে মধ্যপর্ব প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছিল বলে জানা যায়।
২৩. এ উপন্যাসটি অবলম্বনেই পরবর্তীকালে খ্যাতিমান চিত্রনির্মাতা মৃণাল সেন একটি ছবি তৈরি করেন।
২৪. বাঙালি ঔপন্যাসিক ভবানী ভট্টাচার্যের জন্ম বিহারে। লিখেছেন ইংরেজিতে। তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলো হলো : *So Many Hungers* (1948), *Music for Mohini* (1952), *He Who Rides a Tiger* (1954), *A Goddess Named Gold* (1960), *Shadow from Ladakh* (1966) ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য, *Who's Who of Indian Writers*, (New Delhi : Shahitya Akdemi, 1983), p. 75. *Larousse Dictionary of Writers*, (New York : 1994), p. 93। ভবানী ভট্টাচার্যের *So Many Hungers* সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে *কতক্ষুধা* নামে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় (দ্র. বিনতা রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫)।
২৫. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তেভাগার উপন্যাস : দু-একটি মন্তব্য', আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.),



www.pathagar.com

*দিবারাত্রির কাব্য*, (কলকাতা : ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ৫৭

২৬. *সাবিত্রী রায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪। যদিও অখণ্ড সংস্করণে সংযোজনের কোনো ব্যাপার ঘটেছে বলে বর্তমান আলোচকের মনে হয় না। কেননা গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বের (আলাদা-আলাদা পর্বে সম্ভবত ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে কোনো সাল উল্লেখ নেই। তাছাড়া আলাদা-আলাদাভাবে মুদ্রিত পর্বগুলির নতুন মুদ্রণের কোনো সংবাদও জানা যায় না।) সাথে অখণ্ড সংস্করণের কোনো সংকোচন দৃষ্টিগোচর হয় নি।

২৭. সাবিত্রী রায়, *পাকা ধানের গান* (অখণ্ড), কলকাতা : প্রথম সংস্কারণ ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯০), পৃ. ৬৪৮

২৮. *পাকা ধানের গান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৭

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৩২. এ অনুমানের ভিত্তি অমলেন্দু সেনগুপ্তের উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব (কলিকাতা, ১৯৮৯) গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে (পৃ. ২৯) সাবিত্রী রায়ের স্বামী শান্তিময় রায়ের এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় কম্যুনিস্ট পার্টি একসময় শান্তিময় রায়কে যশোরে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেয়। সেখানে ক্লাইভ ব্রানসনসহ আরও অনেক বিদেশী সৈনিকই সেসময় ভারতবর্ষের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। কিছুদিন পরে এঁদের দুজন মারা যান; যাঁদেরকে যশোরে কবরস্থ করা হয়।

৩৩. ১৯৬১ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখের *নিউ এজ* পত্রিকা থেকে বাংলা অনুবাদ করেছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

৩৪. *পাকা ধানের গান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২২

৩৬. ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ডাকে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিনা বিচারে বন্দী মুক্তির দাবি নিয়ে যে মিছিলটি বেরিয়েছিল তাতে পুলিশের হামলা হলে বন্দুকের গুলিতে যে চারজন মহিলা কর্মী মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা হলেন : লতিকা সেন (জন্ম ১৯১৩), প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম ১৯১৭), অমিয়া দত্ত (জন্ম ১৯১৮) এবং গীতা সরকার (জন্ম ১৯২২)।

৩৭. *পাকা ধানের গান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৬। নীল সন্ন্যাসীদের একটি গান এমন–

সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে–
ছিল না মা পাশ।
হল একি সর্বনাশ।
মা-মা-মাগো।
নন্দীরে কয় যাও কৈলাসে
নীল হবে না বিনা-পাশে
রেখো মা তোর চরণ তলে
তোমার অনন্ত নীলে।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৪২. প্রাগুক্ত



www.pathagar.com

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫। মাঘমণ্ডলের ব্রততে আছে—

উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া
ইয়লের পঞ্চাশটি শিয়তে থুইয়া
উঠিবেন সূর্য কোনখানে দিয়া
উঠিবেন সূর্য গোয়ালবাড়ির ঘাট দিয়া।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩। তোষলা ব্রতের একটি ছড়া হলো–

কোদাল কাটা ধান পাব,
গোয়াল আলো গরু পাব,
দরবার আলো বেটা পাব,
সভা আলো জামাই পাব,
সেজ আলো ঝি পাব,
আড়িমাপা সিঁদুর পাব,
ঘর করবো নগরে,
মরবো গিয়ে সাগরে,
তোমার কাছে মাগি বর
স্বামীপুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

৪৬. *ত্রিসোতা*, প্রাগুক্ত, এর প্রকাশ পরিচিতি পৃষ্ঠায় 'লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ' তালিকায় যন্ত্রস্থ ও গ্রন্থটির নাম দেয়া হয়েছিল 'পদ্মা-মেঘনা'।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ

১. শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার উপন্যাস* (১৯৪৬-১৯৭১), (ঢাকা : ১৯৯২)
২. দেবাশীষ সেনগুপ্ত (সম্পা.), *প্রগতির পথিকেরা* (১৯৩৬-১৯৫০), (কলকাতা : প্রকাশকাল অনুল্লেখিত)
৩. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, (কলকাতা : ২০০০)
৪. রবীন্দ্র দত্ত, *বাংলা কথাসাহিত্যের একাল* (১৯৪৫-১৯৯৮), (কলকাতা : ১৯৯৮)
৫. শামলী গুপ্ত (সম্পা.), *শতবর্ষের কৃতী বঙ্গনারী*, (কলকাতা : ২০০১)

*বাংলা একাডেমী পত্রিকা*-র জুলাই ২০০২-জুন ২০০৩ (৪৬ বর্ষ : ২-৪ এবং ৪৭ বর্ষ: ১-২ সংখ্যা)-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# মিরজা আবদুল হাই ও *যমনিস সংবাদ*

এক.

মির্জা আবদুল হাই বাংলাদেশের বর্তমান কথাসাহিত্যের বহুপ্রজ লেখকধারার কোন অংশীদার নন। মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থ এবং তিনটি উপন্যাসই তাঁর প্রধান সাহিত্যকর্ম। এছাড়া অগ্রন্থিত উনচল্লিশটি গল্প, দুটি উপন্যাসের তিনি জনক। বাদবাকি রয়েছে একটি শিশুসাহিত্য গ্রন্থ ও অন্যান্য কিছু প্রবন্ধ। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের ফসলকে এভাবে সীমানাবদ্ধ করলে বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর দুর্বল অবস্থান পরিস্ফুটিত হবে ঠিকই, কিন্তু তারপরও তাঁর গ্রন্থের গভীরে অবগাহন পাঠককে তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহী করে, উপলব্ধির আস্বাদ দেয় গভীর রসবোধের।

১৯১৯ সালের ১ ডিসেম্বর বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচঙ্গ থানার লক্ষণার আবদা গ্রামে মিরজা আবদুল হাই জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লী থেকে বাংলাদেশে আগত এবং মুঘল বংশোদ্ভূত আদিপুরুষের (জনশ্রুতি এমন) উত্তরাধিকার মির্জা আবদুল হেকিম ও তাঁর স্ত্রী ফজলুন্নেছার পাঁচ সন্তানের মধ্যে মিরজা আবদুল হাই দ্বিতীয়। উদার পিতার স্নেহে বেড়ে ওঠায় শৈশবেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, *বিষাদসিন্ধু, রামায়ণ, মহাভারত, দুর্গেশনন্দিনী* বা *আনোয়ারার* মত চিরায়ত সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ। প্রাইমারী ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন কারণে বারবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বদলিয়ে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় লেটারসহ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সিলেট এমসি কলেজ থেকে বিজ্ঞান শাখা নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন প্রথম বিভাগে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে একই কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে তিনি বি এসসি পাস করেন।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আসাম প্রাদেশিক সরবরাহ বিভাগের ইনসপেক্টর পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে 'ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়র সিভিল সার্ভিস' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নোয়াখালীর মাইজদিতে পোস্টিং লাভ করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের বাণিজ্য মন্ত্রণায়ে শাখা অফিসার হিসেবে ইসলামাবাদে ডেপুটেশনে যোগদান করেন। ১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে সপরিবারে ইসলামাবাদ থেকে ঢাকায় পালিয়ে আসেন এবং ডেপুটেশনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর উর্ধতন নিবার্হী পদে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পদে যোগদান করেন এবং ১৯৭৮ সালের ১ ডিসেম্বর চূড়ান্তভাবে সরকারি কর্মজীবন থেকে অবসর নেন।

১৯৫৫ সালের ৭ আগস্ট শিক্ষিতা ও আধুনিতার ছোঁয়ায় লালিত সোফিয়া আহমদের সাথে মিরজা আবদুল হাই-এর বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, উদার ও আধুনিক মননের অধিকারী ও দম্পতির মোট সন্তান তিনটি কন্যা।



www.pathagar.com

স্কুল জীবনেই শুরু হয় মিজা আবদুল হাই-এর সাহিত্য প্রচেষ্টা। স্কুল ম্যাগাজিনে গল্প প্রকাশ ও ম্যাগাজিন সম্পাদনার ভেতর দিয়ে তিনি অনেকের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। পরবর্তীতে গল্প রচনার ধারাটি তাঁর সবসময়ই বর্তমান ছিল। জাতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচুর গল্প প্রকাশ তাঁকে পঞ্চাশের দশকেই দেশের উল্লেখযোগ্য একজন ছোটগল্পকারের আসনে বসিয়ে দেয়। সাহিত্য সাধনায় বড় কোন বিচ্ছেদ না ঘটলেও একটি পূর্ণ গ্রন্থের জনক হতে তাঁর লেগে যায় আরও বহু বছর। ১৯৭৬ সালে মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ *ছায়া প্রচ্ছায়া*।

মিরজা আবু মুসা আবদুল হাই এ গল্পগ্রন্থেই মিরজা আবদুল হাই নামে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হন। ১৯৭৮ সালে মুক্তধারা থেকেই প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় ও সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ *বিস্ফোরণ*।

আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ তাঁর প্রথম উপন্যাস *ফিরে চলো* প্রকাশকাল ১৯৭৯ সাল ঈদসংখ্যা *বিচিত্রায়*। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান প্রবাসী বাঙালির জীবন ও ভাবনা প্রত্যাশা ও বাস্তবতা রূপলাভ করেছে এ উপন্যাসে। ১৯৮১ সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর ঐ একই বছর *বিচিত্রার* ঈদসংখ্যাতে প্রকাশিত হয় *তোমার পতাকা* উপন্যাসটি— যেটি গ্রন্থরূপ লাভ করে ১৯৮৪ সালে। একই বছর তাঁর আরও একটি উপন্যাস প্রকাশ পায়-*যমনিস সংবাদ*। মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত উপরোক্ত তিনটি উপন্যাস ছাড়াও সাময়িকপত্রে তাঁর আরও দু'টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্রন্থিত এ উপন্যাসটির নাম *উন্মাদাশ্রম* ও *উর্ণনাভ*। এছাড়াও সুলতার মাহমুদের কাহিনী নিয়ে রচিত *মহাবাহু সুলতান* নামে তাঁর একটি শিশুসাহিত্য গ্রন্থ রয়েছে।

ছোটগল্পে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব তাঁকে পুরস্কৃত করে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারে, ১৯৭৭ সালে। একই বছর ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা তাঁকে প্রদান করে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার '৭৭।

১৯৭৮ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর মিরজা আবদুল হাই নিজেকে পূর্ণতই সাহিত্য কর্মে নিয়োজিত রাখেন। ১৯৮২ সালে তিনি হঠাৎ করে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন যে অসুস্থতা থেকে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। ১৯৮৪ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর রোববার তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দুই.

মৃত্যুর মাত্র একমাস আগে প্রকাশিত *যমনিস সংবাদ*— মিরজা আবদুল হাই-এর সর্বশেষ উপন্যাস। গ্রন্থাকার প্রকাশের আগে উপন্যাসটি *পূর্বাণীর* একটি ঈদসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর আগে প্রকাশিত *ফিরে চলো* এবং *তোমার পতাকা* থেকে *যমনিস সংবাদ* বিষয়গতসহ সকল দিক দিয়েই একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এবং তার পরবর্তী কিছু কাল ধরে বাঙালী যেসব সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা পাকিস্তানে আটকা পড়েন তাদেরকে নিয়ে— তাদের উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুলতা নিয়ে *ফিরে চলো* রচিত। অন্যদিকে লেখকের দীর্ঘতম উপন্যাস *তোমার পতাকা* সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুবল ডাক্তারকে নিয়ে রচিত। উপন্যাসটি সবশেষে এসে পাঠককে পরিচিত



www.pathagar.com

করায় মুক্তিযুদ্ধের সাথে। *যমনিস সংবাদ* মাত্র একশ' চৌত্রিশ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস হলেও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যঙ্গচিত্র—এতে উপস্থিত অবক্ষয়িত সমাজের উচুতলার মানুষগুলোকে আপাত গম্ভীর এক অদ্ভুত আবহে মিরজা আবদুল হাই চিত্রিত করেছেন অভিজ্ঞ হাতে।

উপন্যাসটি শুরু হয় এভাবে '... ছোট বেলায় মনটা থাকে কাদার মত নরম। ভাল করে যদি একবার কোন ছাপ তাতে বসে যেতে পারে, তাহলে মোক্ষমভাবে আড্ডা গাড়ল, দ্রব্যমূল্য বাড়ার মত। চাপা দেবার মত চেষ্টাই কর, ঠিক মওকা বুঝে মাথাচাড়া দেবেই। তখন কার সাধ্য দাবায়।' শুরুর এ অনুচ্ছেদটি থেকেই সচেতন পাঠক সহজেই অনুমান করে ফেলেন সিরিয়াসনেসের এক মুখোশ নিয়ে আসলে ব্যাঙ্গ বিদ্রূপের এক আখ্যান তিনি পাঠ করতে যাচ্ছেন।

এরপর ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে দেড় যুগ আগে কালিন্দী জিএম ডিগ্রী কলেজের থার্ড ইয়ারের এক ছাত্রের কথা। সে ছাত্র এখন কে—সে কথা অস্পষ্ট থেকেছে দীর্ঘক্ষণ। তার নামটি পর্যন্ত অজ্ঞাত থেকে যায় পাঠকের কাছে। কিন্তু একটি পূর্ণ চরিত্র পাঠককে দিতে লেখক কার্পণ্য করেন না। স্পোর্টসম্যান সে ছেলে রাজনীতির নামে অরাজনৈতিক কাজে কামে বেশ ওস্তাদ, টুকলিফাই করে পরীক্ষা পাসের ব্যবস্থা করায় তার জুড়ি নেই। এরপর একদিন কাজের ধান্ধায় সে ছেলে যখন মতিঝিলের রাস্তায় জুতোর তলি ক্ষয় করছে তখন তার সাথে দেখা হয় তার বাবার অফিসের বহুকাল আগের এক পিয়ন কনাই মিয়ার সাথে। সিলেটের বিলেত প্রবাসী কনাই মিয়ার আনুকূল্যে সোজা বিলেত। রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করে টাকা করা ছাড়াও করেছে যথেষ্ট ফষ্টিনষ্টি। ইতোমধ্যে দেশে একবার এসেছিল। চাচা-চাচীর অনুরোধে ফাতেমা নামে এক ম্যাট্রিক পাস বিয়ে করে আবার বিলেত। এর বছরখানেক পরে টাকা-পয়সা গুছিয়ে নিয়ে দেশে ফেরা। এভাবেই খুব স্বল্প পরিসরে চরিত্রটিকে তার আগাপাশতলী-সমেত পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন লেখক। সাথে সাথে সে চরিত্র ঘিরে পাঠকও শুরু করেন গল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনুমান করতে এবং উদ্বিগ্ন হন লেখকের গল্পের সাথে নিজের গল্পের মিল খুঁজেতে। এ সময়ই জানা যায়, সমগ্র উপন্যাসটি এই যে চরিত্রটি নিয়ে আবর্তিত তার নাম আজিজ রেহমান।

*যমনিস সংবাদ* রচিত হয়েছিল ১৯৮১ সালের ১৯শে মে থেকে ৮ জুলাই এর মধ্যে। দেশে ফেরার পর আজিজ রেহমানকে আমরা এ সময়ের কাছাকাছি একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখি। যদিও উপন্যাসটির একটি অন্যতম কৃতি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সন তারিখ উল্লেখ করে এর ঘটনা ও চরিত্রগুলোকে একটি নিকৃষ্ট বলয়ে আটকে ফেলা হয় নি। যে কোন একটি রাজনৈতিকভাবে অস্থির, অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজেই একটি উপন্যাসের কাহিনী, হিসেবে এটি বেমানান নয়। এরপর আজিজ পরিণত হন দেশের ব্যবসায়ী সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বে। র‍্যাপিড এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সংক্ষেপে রাই তার প্রতিষ্ঠান। সুন্দরী সেক্রেটারী শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত অফিস নিয়ে তার জমজমাট ব্যবসা ক্ষেত্র। এরপর একের পর এক যোগাযোগ বৃদ্ধি। প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার অতীত চেলাগেরি এবং বর্তমান বদান্যতায় দরজা খুলে যায় তার। যেমনভাবে পত্র পত্রিকায় তিনি কভারেজ পেতে থাকেন



www.pathagar.com

তেমনি নিজের বুদ্ধি, সরকারি ছত্রচ্ছায়ায় তার উচ্চতা বৃদ্ধি পায় পর্বতসমান। এসব কিছুর মূলে তাকে সহায়তা করে চলে যমনিস।

যত্রতত্র মলমূত্র নিবারণী সংস্থার সহজ রূপ যমনিস। ছাত্র জীবনেই স্থানকাল ভেদাভেদ না করে মানুষের মলমূত্র ত্যাগের ব্যাপারটি তার মনোযোগ কেড়েছিল। তখন যদিও সেটি তার জন্য বিকৃত রুচিতে উৎসাহ যোগাতেই সাহায্য করত। বিলেত ফেরত মালদার আজিজ একদিন বায়তুল মোকাররম মার্কেটে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাজার করতে গেলে তার চোখে কৈশোর-যৌবনে দেখা সে দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তখনই এ সংক্রান্ত আইডিয়া জমতে থাকে তার মাথায়। সারা শহর জুড়ে টয়লেট নির্মাণের জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ এবং পেশাব শেষে মাটির ঢেলার পরিবর্তে কুলুপ করার জন্য ন্যাপকিনের মত নতুন বস্তু উদ্ভাবনে তিনি সময় দিতে থাকেন। এ দু'টোকে কার্যকরী করতে পারলেই তার ব্যবসার প্রবৃদ্ধি বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করেন এবং এক পর্যায়ে সার্থকভাবে বিপুল কর্মোদ্যমে নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে পরিবেশ দূষণের উপর আলোচনার জন্য আজিজ রেহমান যখন বিদেশের মাটিতে ব্যস্ত তিনি জানতে পারেন দেশে ক্যু হয়েছে। অন্য অনেক কিছুর মধ্যে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও সামরিক বাহিনীর সহায়তায় দুর্নীতি বিভাগ কর্তৃক সীল করে দেয়া হয়েছে।

এরপরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যক্ত করা হয়েছে। বিদেশেই নিখোঁজ হয়ে যান আজিজ রেহমান। যোগাযোগ ঘটিয়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে যান সেখানে। কানাডায় টরেন্টো শহরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দীর্ঘদিন পরে আব্বার কবর জিয়ারত করার জন্য সপরিবারে তিনি দেশে ফেরেন। ক'দিন দেশে বেড়িয়ে বিদেশে ফেরার পথে প্লেনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। আর এভাবেই শেষ হয় *যমনিস সংবাদ* উপন্যাসটি।

যে সমাজ ক্ষয়িষ্ণু, যে সমাজে মূলবোধ অসম্মানিত সে সমাজে নীতিহীন, আদর্শহীন মানুষরাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অজ্ঞতা ও ক্লেদের শীর্ষে যারা অবস্থান করে তারাই সে সমাজের মুকুটে পরিণত। *যমনিক সংবাদ* এরকম একটি বাংলাদেশী সমাজকেই চিহ্নিত করেছে। সে সমাজের পারিবারিক সম্পর্কও কেমন অবহেলিত, অর্থের কাছে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা কেমন ভুলুণ্ঠিত তাও উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। স্ত্রী ফাতেমার সাথে, পুত্র কেজির সাথে অথবা ব্যক্তিগত সেক্রেটারী খ্রিস্টান যুবতী মনিকা গনসালভেজের সাথে রেহমানের সম্পর্কে পাঠকের মনে সে সমাজের ব্যর্থতা এবং হতাশার এক মর্মস্পর্শী চিত্র দেয়, মানবিক বোধে পাঠক উজ্জীবিত হন।

আজিজ রেহমান এবং তার সমাজ যে সমাজ বাংলাদেশের নিয়ন্তা, সব কিছুতেই লেখক মির্জা আবদুল হাই যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সাথে অংকন করেন। কিন্তু পাঠক খুব সহজেই এও বোঝেন রচনাকালে লেখক মুচকি হাসছেন তার চরিত্র নিয়ে। আর তাই পাঠকেরও হাসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সহায়ক গ্রন্থঃ

*মিরজা আবদুল হাই* ॥ ভীষ্মদের চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।

অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার বাণী সাময়িকীতে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# উপন্যাসের কথক প্রসঙ্গ :
# *কাঁদো নদী কাঁদো* এবং *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*

## উপন্যাসের কথক

যেহেতু সকল সাহিত্যকর্ম এক ধরনের বর্ণনা, তাই বর্ণনাকারীর উপস্থিতিও অমোঘ। বর্ণনাকারী বা কথক (teller/narrator) প্রসঙ্গে Seymour Chatman-এর যে আপ্তবাক্যটি এ মুহূর্তে স্মরণ করা যেতে পারে তা হলো : "Insofar as there is telling, there must be a teller, a narrative voice"।[১] ইংরেজি উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে যদি *Rabinson Crusoe* (১৭১৯) বা আরো পরের *Pamela* (১৭৪০-৪১) থেকে পর্যালোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে কথক প্রসঙ্গটি তাত্ত্বিকভাবে[২] তত বেশি প্রকাশিত না হলেও ঔপন্যাসিকের প্রয়োজনকে নির্ধারণ এবং সে প্রয়োজনকে প্রযুক্ত করার ব্যাপারে কথক নির্বাচন সবসময়ই যথেষ্ট গুরুত্ববহ প্রমাণিত হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স (১৮২৬-৬৯)-এর *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২) বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) স্বীকৃত সার্থক প্রথম বাংলা উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) বা পরবর্তীকালে রচিত তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেই কথকের বৈচিত্র্য আসতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *ঘরে বাইরে*-কে (১৯১৬) এমন পরিবর্তনের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। আরও পরবর্তীকালে এসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১) রচিত *কাঁদো নদী কাঁদো*র (১৯৬৮) কথক সত্যি সত্যিই অনেক পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য। যেমনভাবে সৈয়দ শামসুল হকের (জ. ১৯৩৫) *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* (১৯৯৮) কথক-প্রাচুর্য্যের এক সাম্প্রতিক উদাহরণ। এ সকল উপন্যাসের শিরোনামকে এমন তড়িৎভাবে উপস্থাপন করা হলেও তা প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধের সমুচয় প্রয়োজনের ইঙ্গিতবাহী।

আর সে জন্যেই লেখক-মনে কথক বিষয়ক প্রশ্নটি সর্বদা ক্রিয়াশীল। লেখক নিজে বর্ণনা করবেন নাকি উপন্যাসের কোনো প্রধান চরিত্র উত্তম পুরুষের সে-কাজটি করবে, নাকি অপ্রধান কোন চরিত্রকে দিয়ে তা করালে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব ইত্যাকার বহু প্রশ্নকে উপন্যাসের উপযোগিতা প্রশ্নে লেখককে চিন্তা করতে হয়। বর্ণনাকারী একজন থাকবে নাকি বহুজন, বর্ণনার হাত বদল কেমন করে ঘটবে—বর্ণনাকারীগণ বারবার ফিরে আসবে, নাকি বর্ণনা শেষ হতেই এক একজন বর্ণনাকারী দৃশ্যপট থেকে আপসৃত হবে,



www.pathagar.com

বর্ণনার ভেতর চিঠিপত্র, সংবাদপত্র, ডায়েরি ইত্যাদি প্রামাণিক দলিল ব্যবহৃত হতে পারবে কিনা সে সকল প্রশ্নও লেখক-মনে সর্বদা সমিদ্ধ।

কথক হলো "A fictional person or conscious who narrates all or part of a text"[৩]। যে বলবে সেই হলো narrator বা কথক। যদি লেখক বলেন তাহলে তিনিই কথক, যদি চরিত্র বলে তবে সে-চরিত্রটিই কথক। এই যে লেখক এবং/বা অন্য চরিত্রের কথক হওয়া এর সবকিছুই নির্ভর করে লেখক প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসে কী সৃষ্টি করতে চান তার উপর। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসের শুরুর অংশগুলো বিবেচনা করলেই কথক ভিন্নতা ব্যাপারটি মূর্ত হয়ে উঠে। "৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বরোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হতে মান্দারবণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন" (*দুর্গেশনন্দিনী*)—লেখকের গল্প বলার এ দায়িত্বটি ইন্দিরা নিজেই নিয়েছিল "অনেকদিন পর আমি শ্বশুর বাড়ি যাইতেছিলাম" (*ইন্দিরা*, ১৮৭৩) বলে যদিও *রজনী* (১৮৭৭)-তে এসে সেই বক্তার সংখ্যা বেড়ে চারটি হয়ে গেল সহজেই : রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র এবং লবঙ্গলতা। এছাড়াও অন্যান্য আরও সকল পদ্ধতি বিবেচনা করে সমালোচকেরা গল্প বলার পদ্ধতিকে মোটামুটি তিন ধরনের বলে চিহ্নিত করেন : ক. প্রত্যক্ষ রীতি (Direct/epic method), খ. আত্মজৈবনিক রীতি (Autobiographical method) এবং গ. প্রামাণিক রীতি (Documentary method)।

প্রত্যক্ষ রীতিতে ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞ ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অধিকাংশ লেখকের পছন্দনীয় এ রীতিতে সামগ্রিক গল্প কাঠামোর বাইরে থেকে গল্প নির্মাণই ঔপন্যাসিকের উপলক্ষ হয়। এতে "The novelist is an historian, narrating from the outside"।[৪] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* (১৮৮২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* (১৯১০), অমিয়ভূষণ মজুমদারের (জ. ১৯১৮) *গড় শ্রীখণ্ড* (১৯৫৭) এমন ধারার শীর্ষতম উদাহরণ। প্রত্যক্ষ রীতিতে "লেখক নিজেই গল্প-উপন্যাসের সব নর-নারীর কাহিনী পরিবেশন করেন বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গিতে। একেই বলতে পারি প্রথম পুরুষের (third person) নিরীক্ষণ বিন্দু।... এখানে পাঠক অনুভব করেন যে, সর্বজ্ঞ লেখকের অজানা কিছুই নেই, তিনি তার ইচ্ছামতো কাহিনীকে ক্রমশ উন্মোচিত করেন, তাদের মনের কথাও তিনি বিশ্লেষণ করতে পারেন প্রয়োজনবোধে।"[৫] প্রথম পুরুষের (third person) বর্ণনাকারীর এই ধারায় কথক আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে স্বমহিম। কখনও তিনি নৈর্ব্যক্তিক (objective) যিনি শুধু ঘটনার বিবরণ দেন, চরিত্রের চৈতন্যে প্রবেশ করেন না বা বিশ্লেষণ করেন না কোনো ঘটনাক্রমকে। কখনও তিনি ঘটনার সাথে সাথে সকল চরিত্রের অন্তর-চৈতন্যে পরিভ্রমণ করতে সক্ষম অর্থাৎ তিনি omniscient। কখনও সে পরিভ্রমণ শুধুমাত্র প্রধান চরিত্রে ঘটে থাকে, আবার কখনও বা ঘটে থাকে একটি অপ্রধান চরিত্রেও। এমন পদ্ধতিকে limited omniscient আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। যখন চরিত্র-মন বা ঘটনাংশের উপর কথক



www.pathagar.com

মন্তব্য করেন তখন তা 'editorial omniscient' বলে পরিচিতি পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের *ইন্দিরা* ও *রজনী* বাদে সকল উপন্যাসেই এই সর্বজ্ঞ লেখকই কথক। যেমনটি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) প্রায় সকল উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কোনো কোনো উপন্যাসে সর্বজ্ঞ লেখক থাকলেও তার উপস্থিতি সার্বক্ষণিক নয়। Joseph Conrad (১৮৫৭-১৯২৪)-এর *Lord Jim* (১৯০০) উপন্যাসের প্রথম চার অধ্যায় লেখক নিজে বর্ণনা করলেও পরে সে দায়িত্ব অর্পিত হয় Marlow-র উপর। Conrad-এর *Heart of Darkness* (১৯০২)-এও কথক-লেখক ও কথক Marlow-র সূক্ষ্ম অন্তর্বুননে প্লট ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শেষের কবিতা* (১৯২৯) উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে কথক হিসেবে যে নবীন লেখকের সাক্ষাৎ আমরা পাই তিনি পরবর্তী পরিচ্ছেদেই অন্তর্হিত, যেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেই কথকের দায়িত্বে অবস্থায়ী। সর্বজ্ঞ লেখকের ক্ষমতা বিষয়ে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-৯১) মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর *স্বর্ণলতা* (১৮৮১) উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে সর্বজ্ঞ লেখক বিষয়ে বর্ণনাটি এমন,

> গ্রন্থাকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পারলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর বঙ্কিমবাবুই বা কিরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েশার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? ইহা ভিন্ন গ্রন্থাকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন।

পাঠককে উদ্দেশ্য করে সর্বজ্ঞ লেখকের বক্তব্য প্রদান বিষয়টিও কথক প্রশ্নে বিশেষ গুরুত্বের। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই পাঠককে সম্বোধন বা পাঠককে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। *কপালকুণ্ডলার* (১৮৬৬) দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে "আর কপালকুণ্ডলা? তাহার কি ভাব! চল পাঠক, তাহাকে দর্শন করি" বা তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে 'মতি তাহা পেষমন্‌কে বলিলেন না। আমরাও তাহা পাঠককে বলিব না" বা তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদের মাঝামাঝি জায়গায় "নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে এক নিবিড় বন আছে, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারে" বা একই পরিচ্ছেদের শেষে "পাঠক মহাশয় বহুকাল কপালকুণ্ডলার কোন সংবাদ পান নাই, সুতরাং কপালকুণ্ডলার সংবাদ আবশ্যক হইয়াছে" বা চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শুরুতে "পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে..." এমনই কিছু উদাহরণ। কখনও কখনও সেসকল বক্তব্যে নীতিকথামূলক ইঙ্গিতও বর্তমান যেমনটি 'কপালকণ্ডলা'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে "তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কে" বাক্যের ভেতর দিয়ে। লক্ষ করা যেতে পারে যে শুধুমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোতেই উদ্দিষ্ট পাঠকের চারিত্রবৈশিষ্ট্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন। Gerald Prince তাঁর সুবিখ্যাত 'Indroduction to



www.pathagar.com

the study of the Narratee' প্রবন্ধে পাঠক (narratee) অর্থাৎ 'whom the narrator addresses' নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। উপদেশক-লেখকের সাক্ষাৎ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আরও অনেক উপন্যাসেই প্রতিভাত। *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩) উপন্যাসের এমন উদাহরণ হলো : "লোকে বলে ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত অব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিল না" (ষটত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদের শেষে) বা "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে" (উপন্যাসের শেষ লাইন) ইত্যাদি। এছাড়া উপন্যাসটির অষ্টম পরিচ্ছেদের শুরুতে এবং শেষে লেখক "এইখানে পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন" ও "পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য..." বলে পাঠককে লেখক সাময়িকভাবে বর্ণনাতে সম্পৃক্ত করেছেন। সরাসরি পাঠককে সম্ভাষণ বা পাঠকের সাথে সম্পৃক্তি বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে প্রায় দেখাই যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) *পুতুল নাচের ইতিকথার* (১৯৩৬) এগারো পরিচ্ছেদের শেষে মতি ও তার যাযাবর স্বামী কুমুদের কাহিনী সমাপ্ত করতে যেয়ে লেখক বলেছেন,

> গৃহবিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে মতিও আজ এলোমেলো পথের জীবনকে বরণ করিল—আমাদের গেঁয়ো মেয়ে মতি। হয়তো একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়তো একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়া ওদের চলিবে না—জীবন-যাপনের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ওদের পক্ষেও অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। আজ সে কথা কিছুই বলা যায় না। পুতুল নাচের ইতিকথায় সে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত—ওদের কথা এখানেই শেষ হইল। যদি বলিতে হয় ভিন্ন বই লিখিয়া বলিব।

পাঠকের সাথে লেখকের এই সংযুক্তি বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামধৃত উপন্যাস *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এও প্রতুল।

সর্বজ্ঞ লেখকের বিবরণ কৌশলে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে তা হলো লেখক নিজেই বর্ণনাকারী হলেও তিনি তার অবস্থানকে একাকার করে দেন জনমানুষের সাথে—যারা একই হলেও বহু। এতে বিশেষ সুবিধা যেটি হয় তাহলো কাহিনীর বিভিন্ন অনুষঙ্গ এবং মূল্যায়নের ব্যাপারে লেখকের দায়বদ্ধতা হ্রাস পায়। বাংলাদেশের উপন্যাসে শহীদুল জহীরের (জ. ১৯৫৩) প্রথম উপন্যাসে *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতাতে* (১৯৮৭) এ কৌশলটির প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি থাকলেও তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*[৬] (১৯৯৫)-তে এটি রীতিমতো প্রকটিত। 'গ্রামের লোকদের সে রাতের চাঁদের কথা মনে পড়ে', 'তারা স্মরণ করতে পারে' (দু'টিই পৃ. ০৯), 'সুহাসিনীর লোকদের মনে পড়ে যে' (পৃ. ১২), 'সুহাসিনীর লোকদের .... স্মরণ হয়' (পৃ. ৩৪), 'গ্রামের লোকেরা জানতে পারে না' (পৃ. ৩৫), 'গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে যে, (পৃ. ৪৪), 'সুহাসিনীর লোকদের যখন মফিজুদ্দিন মিয়া এবং তার পরিবারের কথা মনে আসে' (পৃ. ৮৭) ইত্যাদি ভঙ্গীতে উপন্যাসটির কাহিনী বর্ণিত হয়। *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* উপন্যাসেও এ রীতিটি ব্যবহৃত হয়েছে কোথাও কোথাও।



www.pathagar.com

অন্যদিকে 'আত্মকথনরীতিতে লেখক "writes in the first person, identifying himself with one of his characters (generally, though not always, the hero or heroine), and thus produces an imaginary autobiography"[৭] 'আত্মকথনরীতি' যাকে ইংরেজিতে First person novel বলা হয় তারও শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। স্বয়ং লেখক উপন্যাসের একটি চরিত্রে পরিণত এমনটি হলো এই রীতির প্রধান শ্রেণী। এতে "আমি" চরিত্রটির ওপর লেখকের প্রায়ই বেশ দুর্বলতা দেখা যায়—যা উপন্যাসের স্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রণকে বিঘ্নিত করে।"[৮] এ রীতির অন্য আর যে একটি শ্রেণী রয়েছে সেখানে লেখক স্বয়ং 'আমি'র ভেতর দিয়ে বক্তা নয়, বক্তা লেখক ব্যতিরেকে অন্য কোনো চরিত্র। হীরেন চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের ভেতর আবার দু'টি পৃথক ধারা উল্লেখ করেছেন।[৯] প্রথম ধারায় বক্তা চরিত্রটি যাবতীয় উপন্যাসের ঘটনার সাক্ষীমাত্র—সমস্ত ঘটনা তার চোখের সামনে ঘটে। দ্বিতীয় ধারায় বক্তা চরিত্রটিও মুখ্য, নিজের জীবনের ঘটনা তিনি সাক্ষাতভাবে বর্ণনা করেন।

আত্মকথনমূলক ধারায় রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *ইন্দিরা* (১৮৭৩) এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত* (১ম পর্ব-১৯১৭, ২য় পর্ব-১৯১৮, ৩য় পর্ব-১৯২৭ ও ৪র্থ পর্ব-১৯৩৩) দু'টি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যদিও উপন্যাস দু'টির কথকের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব বিরাজমান। *ইন্দিরায়* কথক যে অর্থে প্রধান চরিত্র শ্রীকান্ত সে অর্থে নয়। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের *চতুরঙ্গ* (১৯১৬) শ্রীবিলাসের জবানীতে রচিত হলেও অধ্যায় নির্দেশক নামাঙ্কিত অন্য চরিত্ররা বক্তা নয়, যদিও *রজনীর* বক্তারাই অধ্যায় নির্দেশক শিরোনাম। রজনী নিজেসহ সেখানে আরও আরও যেসব বক্তা রয়েছে তারা হলো অমরনাথ, লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্র। এ চারজনের বিবরণের ভেতর দিয়ে *রজনী* উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়। বিপরীতভাবে সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬) তাঁর উপন্যাস *জাগরীতেও* (১৯৪৬) চারজন কথকের উপস্থিতি সত্ত্বেও তাদের বর্ণনার ভেতর দিকে কাহিনী-উন্মোচন বা অগ্রসরণে মনোযোগী না হয়ে বরং একটি বিশেষ যে বিষয়ে সকলের দৃষ্টিকোনকে নিক্ষেপ করেছেন তা হলো, সকাল হতেই বিলুর ফাঁসী কার্যকর হওয়ার প্রসঙ্গটি। জেলের চারটি আলাদা আলাদা সেলে বন্দি বিলু, তার ভাই নীলু এবং তাদের বাবা ও মা। বিলু ফাঁসীর আদেশপ্রাপ্ত। *জাগরীতে* ঘটনার অগ্রসরণ না ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক ঘটনা ও এর সাথে সম্পর্কিত মানুষগুলোর মনন বিশ্লেষণ নিয়োজিত। বিমল করের (জ. ১৯২১) *অসময়* উপন্যাসটিও বহুকথক প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবিদার। বহুকথকের ব্যাপারটি বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান দুই আলোচ্য উপন্যাস *কাঁদো নদী কাঁদো* ও *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এও পরিলক্ষিত।

বিবরণ প্রশ্নের তৃতীয়টি হলো প্রামাণিক বা Documentary পদ্ধতি। এতে ক প্রমাণ্য তথ্য হিসেবে ডায়েরি, সংবাদপত্র, চিঠিপত্রাদি বা অন্য কোনো দলিলকে উপস্থাপন করে থাকেন। Samuel Richardson (১৬৮৯-১৭৬১) রচিত ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস *Pamela* ও এ ধারার একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। শুধু পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে রচিত এমন পত্রোপন্যাস (epistolary novel) অষ্টাদশ ও



www.pathagar.com

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যে অনেক রচিত হলেও বর্তমানে এর ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণতই পত্রোপন্যাস গোত্রের উদাহরণ খুবই কম। বরং অন্য পদ্ধতিতে রচিত উপন্যাসে পত্রের ব্যবহারই বাংলা সাহিত্যে বেশি দেখা যায়। নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বসন্তকুমারের পত্র* (১৮৮২) এবং রাধারমণ মাহাতোর *শরতের চিঠির* (১৮৮৭) মতো ইতিহাসের গর্ভে বিলীন পত্রোপন্যাসের পর সার্থক যে পত্রোপন্যাসটি অনেক কারণেই উল্লেখের দাবিদার তা হলো কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর *বাঁধনহারা* (পত্রিকায় প্রকাশ ১৯২০-২১; গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯২৭)। পত্রোপন্যাস রচনায়ত প্রধান যে অসুবিধা অর্থাৎ পত্র পরিচয়িতাদেরকে তাদের পত্রের ভাষা ও মানসিকতা দিয়ে আলাদা আলাদা ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করানো তা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ অসুবিধাজনক। *বাঁধনহারার* নয়জন পত্র লেখকের মধ্যে কোনো কোনো ব্যাপারে সাজুয্য খুঁজে পাওয়া গেলেও চরিত্রগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য স্পষ্ট।

একই রকমভাবে ডায়েরির ব্যবহারও বাংলা সাহিত্যে খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিকোণ নির্মাণে সফল এ ধারার অন্যতম উদাহরণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে* (১৯১৬)। বিমলা, সন্দীপ ও নিখিলেশের আত্মকথাগুলো ডায়েরির ভঙ্গীতেই রচিত। যদিও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য (১৯০৯-৬৯) তাঁর *সৃষ্টি* (১৯৬৫) উপন্যাসে ডায়েরির ফর্মটি আরও বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খতায় ব্যবহার করেছেন। উপন্যাস শুরুর আগেই 'পাঠকের অবগতির জন্যে' অংশে উপন্যাসটির কথক অনুরুদ্ধ ঘোষাল জানিয়েছেন তিনি তার বন্ধু দীপায়ন চৌধুরীর রোজনামচা ব্যবহার করে একটি কাহিনী নির্মাণে আগ্রহী এবং লক্ষ করা যেতে পারে যে *সৃষ্টিতে* ঐ ডায়েরির একটি বিরাট অংশ ব্যবহৃত হয়েছে।

ডায়ালগধর্মিতা (কথোপকথন) উপন্যাসের কথক প্রশ্নে আর একটি বিশেষ চারিত্র্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ বা আত্মকথনরীতিতে রচিত উপন্যাসে কথোপকথন অনেক ঔপন্যাসিকই ব্যবহার করেন। তবে শুধুমাত্র ডায়ালগ দিয়ে উপন্যাস সম্পন্ন হয়েছে এমন উদাহরণ কম। লেখক-চরিত্র কথোপকথন বা চরিত্র–চরিত্র কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এমন উপন্যাস রচনা সম্ভব। ডায়ালগধর্মী উপন্যাসের প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) রচিত *হামিদা* কাহিনী বিকাশ লাভ করেছে ঔপন্যাসিক এবং উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নেহাল সিংহের কথোপকথনের ভেতর দিয়ে। উপন্যাসে কথোপকথন ব্যবহারে সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-৮০) কিছু কিছু উপন্যাস ছাড়াও জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) মৃত্যু পরবর্তী বিশ বছর পরে একাধারে আবিষ্কৃত উপন্যাসগুলোতে প্রচুর। ১৯৩০-এর রচিত তাঁর প্রথম উপন্যাস *মৃণাল* থেকেই এ প্রবণতা লক্ষণীয়। আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত এ উপন্যাসে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেই কথক 'আমি'র সাথে মৃণালের কথোপকথন শুরু। কখনও কখনও কথক 'আমি' খুব সামান্য কিছু বিবরণ দিলেও উপন্যাসটি শেষ হয়েছে ঐ কথোপকথনের ভেতর দিয়েই। ১৯৩৩ পর্যায়ে রচিত তাঁর অন্যান্য উপন্যাস *কারুবাসনা, জীবন প্রণালী, প্রেতিনীর রূপকথা,* ও *বিভা*তেও এ



www.pathagar.com

প্রবণতা বর্তমান। *জীবন প্রণালী* ও *প্রেতিনীর রূপকথা* তো শুরুই হয়েছে ডায়ালগ দিয়ে। তাঁর ১৯৪৮ পর্বের উপন্যাসও সে ধারা থেকে ভিন্ন নয়। শুধুমাত্র *বাসমতীর উপন্যাস*-এর কথাই যদি বলি—এর চরিশ' পৃষ্ঠার কতশ' পৃষ্ঠা কথোপকথনে রচিত তা একটি আলাদা নিবন্ধের বিষয় হতে পারে।

উপস্থাপনা-পদ্ধতির এই যে বিভিন্ন ধরন আধুনিক উপন্যাসে লক্ষ করা যায় তার ব্যবহার কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলরৈখিক নয়। অনেক ভাঙচুর এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক এখন নবতর বর্ণনারীতির সন্ধ্যান করে থাকেন। একজন উপন্যাস-লেখক একই সাথে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার ঘটিয়ে কিভাবে উপন্যাসের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করেন তা বিশ্লেষণের জন্য যে উপন্যাসটিকে বর্তমান আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটি হলো পশ্চিমবাংলার ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের (জ. ১৯৩০) *অলীক মানুষ*। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এ উপন্যাসটি বর্তমান প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করার প্রধান কারণ হলো বাংলাভাষায় নিকট অতীতে রচিত এমন আর কোনো উপন্যাসের নাম সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বর্ণনারীতি নিয়ে এত বেশি নিরীক্ষা সফলভাবে ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

*অলীক মানুষ*-এর কাহিনী সংক্ষেপকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে : এটি শফিউজ্জমানের কাহিনী–তার পিতা বদি-উজ-জামানের সময় থেকে শুরু করে শফিউজ্জামানের মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী ঘটনা এ উপন্যাসে বিবৃত। বুজুর্গপীর পিতার সন্তান শফিউজ্জামান–তার কৈশোর, প্রেম এবং ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসী আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলাসহ শেষ পর্যন্ত ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ–এসবই পুর্ণ বিস্তারে উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত। তার কর্মকাণ্ড পিতার কাহিনীসহ পরবর্তী প্রজন্মতে কিভাবে মূল্যায়িত তাও এড়িয়ে যায় নি লেখকের দৃষ্টি। উনিশ ও বিশ শতকের মোট শতাধিক বছরকালের এ কাহিনীর কথক কে? কখনও কখনও কথক লেখক নিজেই। কখনও শফিউজ্জামান বা বদি-উজ-জামান যারা উভয়েই আত্মকথন রীতি অবলম্বন করেছে। অনেকখানি আবার ওঠে এসেছে দিলরুখ বেগম ও কচির কথোপকথনের ভেতর দিয়ে। দিলরুখ বেগম হলো শফিউজ্জমানের প্রথম যৌবনের ভালবাসার মানুষ যে শফিউজ্জামানের নুলো মেঝভাই মনিরুজ্জমানের স্ত্রী হিসেবে ঐ পরিবারে গৃহীত হয়েছিল। কচি হলো দিলরুখ বেগমের নাতনী। কখনও কখনও পত্রিকার কাটিং বা ডায়েরির অংশ বিশেষও উপন্যাসটিতে ব্যবহার। ডায়েরি আবার দুজনের-বদি-উজ-জামানের যা সাধুভাষায় রচিত এবং শফিউজ্জমানের যার ভাষা চলিত। উপন্যাসের কাহিনীর এতগুলো উৎসকে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করে যথার্থভাবে গল্পটি নির্মাণ এবং দিয়ে পাঠক হৃদয়ে বোধ সৃষ্টি কতখানি আয়াশসাধ্য তা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করে বিস্মিত হবেন। এমনকি একই অধ্যায়ে যখন বহু কথকের আবির্ভাব ঘটে তখন সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের দক্ষ শৈলীতে মুগ্ধ না হওয়ার কোনো উপায় থাকে না। *অলীক মানুষ*-এ ব্যবহৃত মিশ্রণ পদ্ধতির অনুরূপতা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এর দুর্লক্ষ্য নাও হতে পারে।



www.pathagar.com

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসটি বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যাস বিশ্বের একটি প্রধানতম উদাহরণ। অন্যান্য যে সকল কারণে এটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবিদার তার একটি হলো এর বিবরণ কৌশল। এ উপন্যাসটিতে কথক-প্রশ্ন রীতিমতো জটিল এবং কুশলতাপূর্ণ। মাত্র দু'জন কথক মোটামুটি দীর্ঘ এ উপন্যাসের গল্পটির বিবরণ দিলেও তার সূক্ষ্মতা এবং শিল্পদক্ষতার তুলনা বাংলা উপন্যাসে মেলা ভার।

বিবরণের এই যে ভিন্নতা তা কিন্তু *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম শুরু করেন নি। প্রথম উপন্যাসন *লালসালুর* (১৯৪৮) প্রায় পনের/ষোল বছর পর রচিত *চাঁদের অমাবস্যা*তেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিবরণ নিয়ে নতুন একটি নিরীক্ষায় উপস্থিত। কাদের মিয়া কর্তৃক মাঝি মেয়েটি খুন হবার পর সে-ঘটনার দৃশ্যাবলী লেখক বিভিন্নভাবে বারবার উপস্থাপন করেছেন। পুরো উপন্যাটির কথক লেখক নিজে হলেও বিররণের পৌনঃপুনিকতা নতুন নতুন চিত্র নির্মাণ করে। প্রথম আড়াই পৃষ্ঠায় যুবক শিক্ষকের ভেতর দিয়ে লেখক হত্যাকাণ্ডটির যে বিবরণ উপস্থিত করেন ঠিক পরেই সে বিবরণের একটি নতুন সংস্কারণ দরকার হয়ে পড়ে। সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় বিবরণটি যুবক শিক্ষককের ঘোরলাগা মনের কোণে আলো ফেলে সব কিছু স্পষ্ট করতে থাকে যেমনটি প্রথম বিবরণে ছিল না। বিবরণের এমন পুনর্বিবরণ উপন্যাসটিতে বারবার ঘটেছে যা পাঠকের সামনে পুরো ঘটনাটিকে উপস্থিত করে তার নিজস্ব বিবরণ নির্মাণের উপাদান যুগিয়েছে। নিজের দেখা ঘটনার কার্য-কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজনেই যুবক শিক্ষকের ভেতর বিবরণের এই পৌনঃপুনিকতা ঘটে। যেহেতু সামগ্রিক ঘটনা অস্পষ্ট অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গ্রাহ্যতায় স্পষ্ট নয়, তাই বিবরণেও এসে পড়ে অস্পষ্টতা নির্দেশক শব্দাবলী। যখনই বিবরণটি পুনরায় বিবৃত হয় তখনই 'যেন', 'হয়তো', 'মনে হয়' জাতীয় শব্দাবলীর ভিড় পুরো ঘটনাটির সঠিক বিবরণ নির্মাণের দায়িত্ব যেন পাঠকের উপর অর্পণ করে দেয়।

*চাঁদের অমাবস্যার* এই বিবরণ কৌশলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে শিল্প-সচেতনতা এবং চরিত্রের গভীরতম মনকে ভাষায় প্রকাশে যে দার্ঢ্য অর্জন করেন তা সহজেই তাঁকে *কাঁদো নদী কাঁদোর* মতো জটিল বিবরণের একটি উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী করে তোলে।

*কাঁদো নদী কাঁদোর* মূল কাহিনী নির্মিত হয়েছে মুহম্মদ মুস্তফাকে কেন্দ্র করে। মুস্তফার শৈশব থেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত ঘটনাক্রম প্রয়োজনানুযায়ী বিবৃত হয়েছে উপন্যাসে। বাহিরিক ঘটনার চেয়ে চরিত্রের অন্তর্গত চিন্তাস্রোত সেখানে প্রধান উপজীব্য। মুস্তফার কাহিনীর সাথে সাথে আরও যে একটি কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে তা হলো কুমুরডাঙ্গা ও এই জনপদের বাসিন্দাদের দীর্ঘ ইতিহাস। এই দুটি কাহিনী ধারাকে একটি সূত্রে আবদ্ধ করে ব্যক্তিমানসের সাথে তার চতুর্পাশ যা অধিকাংশতই অতীতাশ্রয়ী তাকেই লেখক উপস্থাপন করেছেন *কাঁদো নদী কাঁদো*তে। এ উপন্যাসটির কথক বিশ্লেষণে আর



www.pathagar.com

একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য হলো এটিও একটি অনিশ্চয়তার উপন্যাস। এক ধরনের রহস্য আবহ পুরো ঘটনা এবং সে-ঘটনার চরিত্রাবলীকে আবৃত করে রেখেছে। এমনকি তবারক ভুইঞা প্রকৃতপক্ষে একই নামের কুমুরডাঙ্গার সেই ব্যক্তিটি যার কথা 'আমি' বক্তা মুস্তফার কাছ থেকে শুনেছিল যে কিনা তাও স্পষ্ট করা হয় না। "সে যে তবারক ভুইঞা— সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ দেখতে পাই না"[১০] বলে উপন্যাস শুরুর প্রায় বিশ পৃষ্ঠা পর যাতে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিলে সেই লোকই আবার পৃষ্ঠা দশেক পরে "সে কি সত্যিই তবারক ভুইঞা? আমার ভুল হয়নি তো?"[১১] বাক্যের ভেতর দিয়ে পাঠকের কাছে অনিশ্চয়তার গভীর আবর্তে পড়ে যায়। এই অনিশ্চয়তা *চাঁদের অমাবস্যার* যুবতী মেয়েটি হত্যার ঘটনার বিরণের মতোই *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসেও মূর্ত। যখনই তবারক প্রসঙ্গ, অথবা যখনই মুস্তাফার অতীত তখনই অনিশ্চিতির মাত্রা আরও ঊর্ধ্বগামী। একশ' পৃষ্ঠার *চাঁদের অমাবস্যায়* যেখানে ত্রিশবারের বেশি 'যেন' শব্দটিসহ প্রায় একশ' বারের মতো অনিশ্চয়তা নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল সেখানে *কাঁদো নদী কাঁদোর* একশ' পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় অনিশ্চয়তাজ্ঞাপক শুধু 'হয়তো' শব্দটিই ষাটবারের বেশি প্রযুক্ত। বর্ণানাকারী বা কথক যদি লেখক নিজেই হতেন তাহলে অস্পষ্টতার এ চাদর হয়তো ছিন্ন হতে বাধ্য হতো।

এখন প্রশ্ন হলো *কাঁদো নদী কাঁদোর* কথক কে? লেখক যে নন সেটি অনুমান করা চলে। উপন্যাসটিতে প্রকৃতপক্ষে রয়েছে দু'জন কথক। প্রথম কথক 'আমি' সর্বনাম ব্যবহারকারী একজন। ব্যক্তি যে মুস্তফার সকল বিষয়ে জ্ঞাত এবং সে মুস্তফার চাচাতো ভাই। 'আমি' সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য "উত্তর পুরুষে মুহম্মদ মুস্তফার জীবন কাহিনী বলে যাচ্ছে যে কথক 'আমি' উপন্যাসে তার পরিচয় সুস্পষ্ট নয়"[১২] মেনে নেওয়া যায় না। পুরো উপন্যাসটিকে ধরা হয়েছে এই 'আমি'র বয়ানে, যদিও তার ভেতরে আরও একটি বয়ান বার বার সম্পৃক্ত হয়েছে। আর সেটি করেছে তবারক ভুইঞা নামের উপর্যুক্ত ব্যক্তিটি। কুমুরডাঙ্গায় মুস্তফার ছোট হাকিম পদে যোগদানের পর তবারকের সাথে মুস্তফার যোগাযোগ। 'আমি' বলছে মুস্তফার কথা, আর তবারক বলছে কুমুরডাঙ্গার কথা এবং তবারক একবারও মুস্তফার কথা বলে নি। অথচ কুমুরডাঙ্গায় মুস্তফার বলছে কুমুরডাঙ্গার কথা এবং তবারক একবারও মুস্তাফার কথা বলে নি। অথচ কুমুরডাঙ্গায় মুস্তফার সাথে তবারকের দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তার বিবরণও আমরা পাই 'আমির'র মুখ দিয়ে। এমনকি বেশ আগে দারোগার সাথে স্টীমারের উপর মুস্তফার দেখা হওয়ার ঘটনাটিও বলছে এই 'আমি'ই। মুস্তফা-দারোগা অংশে দারোগা নিজেও কিছুক্ষণের জন্য কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। শুধু তাই নয় 'আমি' এবং তবারক দু'জনে বারবার এমন একটি অবস্থান নেয় যা সর্বজ্ঞ লেখকের। আমি সর্বজ্ঞ হয়ে পরে মুস্তফার ভেতরকে চিত্রিত করতে যেয়ে আর তবারক সর্বজ্ঞ হয় যখন সে কুমুরডাঙ্গার মানুষজনের ভেতরের কথাবার্তা ও চিন্তা-চেতনার বিবরণ দেয়। এভাবেই *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে দু'জন বর্ণনাকারীর ভেতর দিয়েই লেখক নিজেকে প্রবিষ্ট করেন এবং কোনো



www.pathagar.com

রকমের ব্যর্থতা ছাড়াই তিনি সে-কাহিনীর সমাপ্তি ঘটান। "অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করলে দেখা যাবে, কথক 'আমি' হচ্ছে লেখকের দৃষ্টিকোনের ব্যক্তিরূপ আর লেখকের সেই দৃষ্টিকোণের সহযোগী চরিত্ররূপ হচ্ছে তবারক ভুইঞা।"[১৩]

'আমি' সর্বনামের কথক যখন উপন্যাসটি শুরু করে তখন সামগ্রিক বিবরণের কেমন যেন মনে হয় 'আমি' স্বয়ং লেখকই হবেন। স্টীমারের উপর এক অপরাহ্নে সহযাত্রী হলো এই 'আমি' এবং তবারক। তবারক প্রথমে থেকেই বর্ণনা পাচ্ছিল 'লোকটি' অভিধায়। খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটি সম্পর্কে 'আমি' বর্ণনা দিচ্ছিল যেহেতু এই আমি বর্ণনা করছে স্টীমারযাত্রা শেষ হওয়ার পর কোনো এক সময়। স্টীমারযাত্রায় এ দু'জন যাত্রীর স্বাভাবিক অবস্থিতি। প্রায় আট পৃষ্ঠাব্যাপী যে যাত্রার বিবরণে এক পর্যায়ে লোকটি যখন তার গল্পে একটি শহরের অর্থাৎ কুমুরডাঙ্গার নাম উচ্চারণ করে তখনই 'আমি' চমকিত হয়ে উঠে এবং 'আমি'র মনে হয় ঐ সহযাত্রী গল্পকথক নিশ্চয়ই তবারক ভুইঞা। এই মনে হওয়া তাকে তবারকের গল্পের প্রতি একনিষ্ঠ করে তোলে যা ক্রমে ক্রমে তার ভেতর উচ্চকিত করতে থাকে মুস্তফার স্মৃতি। এবং ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর বিবরণকে এত বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তোলেন যে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এই মনে হওয়ার আগ পর্যন্ত 'আমি' তবারকের বলে যাওয়া গল্পগুলো কত হালকাভাবে শুনছিল, বিশেষ অভিনিবেশ না দিয়েই।

তবারক সম্পর্কে 'আমি'র এই সচেতনতা-সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত স্টীমার যাত্রার যে বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে 'আমি'র মুখ দিয়ে সেখানে তবারক সম্পর্কেও অনেক কথা আছে। 'আমি'র বিররণ শুরুর একটু পরেই "ছোটবেলার নাম পড়েছিল পেঁচা। লোকেরা পেঁচা বলতো"[১৪] এবং সাথে সাথেই "না, চোখের জন্য নয়, স্বভাবের জন্য" বলে প্রত্যক্ষ বিবরণে তবারককে দাঁড় করানো হওে বিবরণ হয়ে পড়ে অপ্রত্যক্ষ। মাঝখানে একবার "সে-জন্যেই জীবনে কিছু হয়নি। পরের জীবনের দিকে তাকিয়ে দিন কাটিয়েছি, নিজের জীবন কথা ভাবার সময় হয়ে ওঠেনি"[১৫] শুধুমাত্র এসেছে। উদ্ধার চিহ্নের ভেতরের উপর্যুক্ত বাক্যগুলোর পর দশ পৃষ্ঠার দিকে 'আমি' প্রথম কথকের দায়িত্বটি সরাসরি 'লোকটি বলে:' বলে তবারককে দিয়ে দেয়। কিন্তু একটি অনুচ্ছেদ শেষেই লোকটির বলা কুমুরডাঙ্গার গল্পটি অপ্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হতে শুরু করে যা এরপর বারবার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষতায় পরিবর্তিত হয়।

স্টীমার যাত্রা ও তবারক প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে দিতে কুমুরডাঙ্গার নাম শুনে যখন 'আমি' চমকিত হয় এবং অনুমান করে যে লোকটি তবারক ভুইঞা তখন থেকেই মুহম্মদ মুস্তফার প্রসঙ্গ শুরু। এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদেই প্রথমবারের মতো খোদেজার মৃত্যুর কথা পাঠক জানতে পারেন। খোদেজার মৃত্যুর কথাটি মুস্তফা বলেছিল তবারককে তার ঘোর জ্বরের সময়। অনুমান করা চলে যে সে বিবরণ মুস্তফা আত্মহত্যার পূর্বে বাড়িতে এসে 'আমি'কে বলেছিল। মুস্তফা 'আমি'কে এমন আরও অনেক কিছুই বলেছিল বলে অনুমান করতে অসুবধিা হয় না। কুমুরডাঙ্গায় যাবার সময় স্টীমারে দারোগার সাথে মুস্তফার যে



www.pathagar.com

সাক্ষাৎ সেটিও এমন একটি উদাহরণ। এক পৃষ্ঠার সামান্য বেশি সে-বিবরণ পড়তে পড়তে বারবারই একজন সর্বজ্ঞ লেখককে এর কথক হিসেবে পাঠকের মনে হতে পারে। যদিও সে-বিবরণ দু'টি অনুচ্ছেদের শেষ দিকে এসেই মুস্তফার মানসিকতা বিশ্লেষণের এক পর্যায়ে হঠাৎই "সে আমার চাচাতো ভাই, আমাদের বয়স তেমন প্রভেদ নেই। একই বাড়িতে আমাদের জন্ম। তার কথা আমি জানবো না তো কে জানবে"[১৬] পাঠকের ভাবনাকে ভেঙে চুরে ফেলে। পাঠক বুঝতে পারেন যাকে সর্বজ্ঞ বর্ণনাকারী বলে মনে হয়েছিল সে আমলে 'আমি' নিজেই। 'আমি'র সর্বজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসটিতে আরও কয়েকবার লক্ষ করা যায়। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর আমেনা বেগমের সাথে খেদমতুল্লার যোগাযোগ ও বিবাহ[১৭], মুক্তাগাছি গ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক রাতে আকস্মিকভাবে মুস্তফার গমন[১৮], সে -গমনের পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদে কালু মিয়ার আচরণ[১৯]. খোদেজার মৃত্যু ও তা নিয়ে বাড়ির লোকজনের ভাবনা সম্পর্কে তবারকের সাথে মুস্তফার আলাপ[২০] রাস্তা পরিভ্রমণরত মেয়েটির সাথে খোদেজার সাদৃশ্য আবিষ্কারের মুস্তফার অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড,[২১] খোদেজা একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে এমন মনে হওয়ায় মুস্তফার আচরণ ও আত্মহত্যার চেষ্টা[২২] ইত্যাদি ঘটনার বিবরণে 'আমি' নয় লেখকের উপস্থিতিই মূর্ত। এতসব কিছু মুস্তফার কাছে থেকে 'আমি' জেনেছে এমনটি ভাবার কোনো যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। তাই আমি'র ভেতর দিয়ে সর্বজ্ঞ লেখক উপস্থিত এমনটি না বলে বরং 'আমি' এবং তবারক ভুইঞার সাথে সাথে একজন সর্বজ্ঞ লেখক ও উপন্যাসটির বক্তাদের একজন এমনটি ভাবলে অযৌক্তিক হবে বলে মনে হয় না। যদিও উপন্যাসের শেষ পাদে এসে একাধারে লেখক ও কথক ব্যক্তিত্বটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় যখন 'আমি' উদ্‌ভ্রান্ত মুস্তফার বাড়ি ফেবার পরের বিবরণ দেয়। স্পষ্ট হয়, অনুমানের মতো করে এবং সর্বজ্ঞ লেখকের ভাষ্যগুলো 'আমি' রচনা করলেও সেগুলো আসলে মুস্তফাই তাকে বলেছিল। 'আমি' এ প্রসঙ্গে বলে,

> আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। জানতাম, মুহম্মদ মুস্তফা নিজে থেকে না বললে তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারা সহজ নয়। এ-ও জানতাম, বলবার কিছু থাকলে বা বলবার ইচ্ছা হলে একসময় আমাকেই বলবে।
>
> হয়তো, দ্বিতীয় দিন সে বলে। বলে ধীরে ধীরে, একটু একটু করে, এমনভাবে যেন অন্য কোন মানুষের কথা চলছে, বা যা-বলছে তা নিজের কাছেই অসম্ভব মনে হয়। সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল তা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেনি। প্রথমে আমাকে আন্দাজ-অনুমান করতে হয়, পরে খণ্ড-খণ্ড কথা একত্র করে অত্যাশ্চর্য কথাটি বুঝতে সক্ষম হই।[২৩]

সর্বজ্ঞতার এই ব্যাপারটি কথক তবারক ভুইঞার বিবরণের মধ্যেও পাঠক প্রত্যক্ষ করে থাকেন। নিজের ব্যক্তিগত ও স্মৃতিগত বর্ণনার বাইরেও তবারক এমন অনেক কিছু বলেছে যেগুলো সাধারণভাবে তার জানা থাকার কথা নয় বিশেষ করে কুমুরডাঙ্গার অনেক লোকজনের মনের অনেক কথাই সে অবাধে বলতে থাকে যা সর্বদর্শী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। বাকাল নদীতে চর পড়ে যাওয়া এবং তা নিয়ে কুমুরডাঙ্গার সংস্কারাচ্ছন্ন লোকজনের ভাবনাও একজন সর্বজ্ঞ লোকের বিবরণের সাথে সাজুয্যপূর্ণ। মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের



www.pathagar.com

মেয়ে সখিনা খাতুনের বিশেষ আওয়াজটি শুনতে পাওয়া ও তার পরবর্তী ঘটনাগুলো যে বিবরণ লাভ করেছে তাতে তবারক ভুইঞাকে 'সর্বজ্ঞ' আখ্যা দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। সে-সর্বজ্ঞতাকে সম্পূর্ণরূপে লেখকের সাথে মিলিয়ে না ফেলানোর জন্যই কি উপন্যাসটির শুরুতে তবারককে একজন সূক্ষ্ম দ্রষ্টা ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে? অথচ বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বর্ণনাকারীর এমন গুণাবলীর প্রকাশ কিন্তু 'আমি'র ক্ষেত্রে করা হয় নি, যদিও পুরা উপন্যাসটির আসল কথক 'আমি'। তাছাড়া "লক্ষ করলেই দেখা যাবে আপাত সমান্তরাল দু'টি স্তরে যে দু'জন কাহিনী, আখ্যান বলে যাচ্ছে তারা সামান্য দু-এক জায়গা ছাড়া একেবারে দর্শক–ঐতিহাসিকের মতো তারা অতীতের আখ্যান বলে যাচ্ছে নিজে জড়িয়ে যাচ্ছে না"[২৪] মেনে নেয়া যায় না। 'আমি'র ভূমিকা ঘটনাক্রমে বাহ্যিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও ভুলে যাওয়া উচিত নয় মুস্তফার মৃত্যুতে তার একটি নিষ্ক্রিয় কিন্তু শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। খোদেজার মৃত্যুর রহস্যটি জানতে চাইলে তার "কি করে বলি ? আমি তখন বাড়ি ছিলাম না"[২৫] উত্তরই মুস্তফাকে বেশি শক্তিহীন করে দেয়।

সবশেষে বলা যেতে পারে যে *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসটির আখ্যান বর্ণনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দু'জন কথক 'আমি' ও তবারক ভুইঞার মাধ্যমে করেছেন, যদিও দুজন কথকের মধ্যেই পর্যাবৃত্তে উপন্যাসিককে আবিষ্কার করা সম্ভব।। তবে ঔপন্যাসিক-বহির্ভূত তাদের আলাদা আলাদা সত্তা যথেষ্ট দৃঢ় সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

### *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*

কথক প্রশ্নে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিতব্য দ্বিতীয় উপন্যাসটির নাম *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*। সৈয়দ শামসুল হক রচিত এ উপন্যাসটি প্রথমে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং পরে দুই খণ্ডে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। আরও পরবর্তীতে অনেক যোগ বিয়োগের পর পূর্ণাঙ্গভাবে ১৯৯৮-এ এটি অখণ্ডভাবে প্রকাশিত হয়। অখণ্ড সংস্করণটিতে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, গ্রন্থটির রচনা শুরু হয় ১৯৭৯-তে এবং দীর্ঘ বিশ বছর পর ১৯৯৮-এর ১০ জানুয়ারি এটি রচনা শেষ হয়। প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠার এ উপন্যাসটিও অন্যান্য সকল কারণ বাদ দিয়েও শুধু এর বিবরণধর্মিতার জন্য বাংলাদেশের উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে গৃহীত হতে পারে। সর্বজ্ঞ লেখকের বর্ণনার ভেতরে এ উপন্যাসটিতে সৈয়দ শামসুল হক কথক হিসেবে উপন্যাসটির প্রধান সকল চরিত্রকে অবলম্বন করেছেন। এছাড়াও এতে রয়েছে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও ডায়েরি। এ উপন্যাসটির আর একটি বিশিষ্টতা এই যে, এতে লেখক উপন্যাসের ঘটনাকালীন সময় থেকে বারবার ভবিষ্যতের সময়ে চলে গেছেন এবং পাঠককে উদ্দেশ্য করে বিবৃতি দিয়েছেন। সম্ভবত ভবিষ্যতকে উপন্যাসের অতীত সময়কালের সাথে সম্পৃক্ততার ব্যাপারটি আগেভাগেই নির্দেশ করার জন্য উপন্যাসটির শুরুতে T S Eliot থেকে এমন একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যা আমাদের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় উদ্ধার করা যেতে



www.pathagar.com

পারে। উদ্ধৃতাংশের প্রথম তিন লাইন হলো: "Time present and time past/Are both perhaps present in time future/And time future contained is time past."

*বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ* মুক্তিযুদ্ধ আশ্রিত একটি উপন্যাস, যদিও একে যথার্থভাবে মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত একটি উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করতে সমালোচকেরা দ্বিধা করবেন। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র মহিউদ্দিন। তিয়াত্তরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এ উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদেই আমাদের সামনে স্পষ্ট করা হয় এর আখ্যানের স্থান ও কাল। প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখক প্রথম পুরুষে আমাদেরকে নিয়ে গেছেন জলেশ্বরীতে যেখানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহিউদ্দিন বৃষ্টির অপেক্ষায়। ঔপন্যাসিক মহিউদ্দিনকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এভাবে,

> আমার এখন দ্রুতপায়ে পৌঁছে যাই বাংলাদেশের দূর উত্তরে,...এখন আমরা সেই উত্তরে যাই, উত্তরের প্রাচীন একটি জনপদে যাই, জলেশ্বরীতে যাই, জলেশ্বরীর একটি গ্রামে যাই—যেতে হবে আমাদের সন্তর্পণে, এখন এ যুদ্ধের কাল, যেতে হবে আমাদের টহলবার মিলিটারির দৃষ্টি এড়িয়ে, এখন ও গণহত্যার কাল; গ্রামটির নাম বকচর; লোকশূন্য এখন এ গ্রাম ; এখানেই গোপন ডেরা স্থাপন করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল জলেশ্বরী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে ; এবং আমরা প্রবেশ করি প্রাচীন একটি কিংবদন্তীর ভেতরে—এবং আমরা প্রত্যক্ষ করি নতুন একটি কিংবদন্তীর জন্ম।[২৬]

বাংলাদেশের একটি অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে মহিউদ্দিনের এই অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধের কাহিনীর ভেতর দিয়ে সৈয়দ শামসুল হক মহিউদ্দিনের কিংবদন্তী সৃষ্টিকারী পরিবার এবং তাসহ সে অঞ্চলের অতীতকে নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। এ সকল নির্মাণে এক সময় স্পষ্ট হয় মহিউদ্দিন জলেশ্বরীর এমন এক পরিবারের সন্তান যাদের পূর্বপুরুষ শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিন ষোলশ এক সালের দিকে রংপুরে আসেন। সম্রাট আকবরের পরিবারের এক শিক্ষক রাজধানী পরিত্যাগ করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এক বিশাল কাফেলার নেতৃত্ব দেন। *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এর কাহিনী সেই কুতুবউদ্দিন শাহ থেকে শুরু করে মহিউদ্দিন পর্যন্ত বিস্তৃত। কুতুবউদ্দিন ও তার সমসাময়িককালের কাহিনীতে রয়েছে দেশীয় হিন্দুদের পরাজিত করে ইসলামের জয়গানের কথা। পরবর্তীকালের কাহিনীতে মহিউদ্দিনের বাবা-চাচারা উপস্থিত যাদের ভেতর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানদের উত্থান-পরিক্রমণ লিপিবদ্ধ। একটি দীর্ঘ বিবরণ ও তার পুনর্বিবরণের ভেতর দিয়ে এ পরিক্রমণ ঘটলেও তা কিন্তু বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধে মহিউদ্দিনের অংশগ্রহণেসহ মহিউদ্দিন-ফুলকি প্রেমবিষয়ক গল্প-কাঠামোর ভেতরেই স্থাপিত।

উপন্যাসটিতে সর্বজ্ঞ লেখক এবং অন্যান্য কথকদের প্রসঙ্গে বলা যায় প্রথম বারো পরিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রায় বাহাত্তর পৃষ্ঠায় সর্বজ্ঞ লেখক কাহিনীর বুনন চালিয়েছেন এবং তের পরিচ্ছেদে এসে প্রথম লক্ষ করা যায় বক্তার ভিন্নতা। এবারের বক্তা মহিউদ্দিন নিজে। প্রায় বারো পৃষ্ঠা ধরে মহিউদ্দিন তার বড় বাবা সৈয়দ কুতুবউদ্দিন সম্পর্কে বলে যায় 'যার কথা



www.pathagar.com

সর্বজ্ঞ, লেখকের অংশে আগেই বলা হয়েছিল। খেয়াল করা যেতে পারে যে, কুতুবউদ্দিনের কাহিনী পল্লবিত ও প্রসারিতভাবে আরও পাওয়া যায় সৈয়দ আবদুস সুলতানের বয়ানে (পরিচ্ছেদ ২৩, ২৪, ও ২৭)। যেমনভাবে মহিউদ্দিন ৩০, ৩১, ৩৭ ও ৪১ পরিচ্ছেদে নিজের জবানীতে তার ও ফুলকির কথাও বলেছে। ৪৩ পরিচ্ছেদের বক্তাও মহিউদ্দিন যেখানে তার বিবরণ মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত। তেমনি সৈয়দ আবদুস সুলতানও তার পরিবারের পূর্বকথাসহ সমসাময়িককে উপস্থাপন করেছে নিজের জবানীতে (পরিচ্ছেদ ৫৬, ৫৭ ও ৭০)। ফুলকিকে নিয়ে তার ভাবনা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর চিন্তা ও এতে তার অবস্থান ইত্যাকার সকল বিষয় তার দৃষ্টিভঙ্গিতে এ সকল অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসটিতে আরও যারা কথক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে বশীর (পরিচ্ছেদ ১৭), ফুলকি (পরিচ্ছেদ ৫৫) এবং সৈয়দ আবদুস সোবহান (পরিচ্ছেদ ৬৩-র অংশ বিশেষ)। সন্দেহ নেই এতগুলো বিচিত্র চরিত্রকে কথকের ভূমিকায় উপস্থিত করে সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের উপন্যাসে একটি অচিন্তিতপূর্ব অধ্যায়ের সূচনা করেছেন।

লেখক-কথক এবং অন্যান্য চরিত্র-কথকের এসব বিবরণের ভেতরে অথবা বাইরে রয়েছে কথন-শৈলী নিয়ে ঔপন্যাসিকের আরও নিরীক্ষা। লেখক অনেক সময়ই নিজেকেও সম্পৃক্ত করে ফেলেছেন পাঠকের সাথে। ২৬ পরিচ্ছেদের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধ শুরুকালীন সময়ের বর্ণনা "এখন আর আমরা এখানে দাঁড়াব না, এখন আর আমরা এখানে সংসার করব না, এখন আর আমরা এখানে বীজ বপন করব না। আমরা দৌড়ে পালাব। আমরা ফেলে যাব। আমরা এই ঘর ছেড়ে যাব"[২৭] এমনই একটি উদহারণ। এছাড়া 'কোন কোন বাক্য উচ্চারণের জন্যে তা আমাদের অপেক্ষা করতে হয়..."[২৮] "আমরাও একদিন এ বাড়িতে আসব...",[২৯] "মোমেনার কথা আমরা ভুলে যাব..."[৩০] প্রভৃতি বর্ণনাকে এমন উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বর্ণনাকারীর এ ভঙ্গির আরও অভিনবত্ব *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এ পরিলক্ষিত হয় অন্য আর একটি পরিচ্ছেদে। ১৩ পরিচ্ছেদে মহিউদ্দিনের জবানীতে যখন তার বড় বাবা শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের অতীত বর্ণিত হয় তখন তা শ্রুতি ও কল্পনা উভয়কেই আশ্রয় করে এগিয়ে চলে। সে বিবরণে মহিউদ্দিন যে বিশেষ ভঙ্গিটি ব্যবহার করে তা হলো : 'আমি দেখতে পাই', 'আমি এটাও ভাবতে পারি', 'আমি কানে শুনতে পাই', 'আমি ভাবতে চাই', 'আমি কল্পনা করতে পারি', 'আমি ধরে নিই' প্রভৃতি যা তার বর্ণনায় যুক্ত করে বিশেষ অভিনবত্ব। অন্য আরও একটি অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায় জালালউদ্দিন বিষয়ক সর্বজ্ঞ লেখকের বিবরণে। পুনঃপুনঃ 'আমরা এখন শুনতে পাব' (পৃ. ৪২০), 'উপকথায় বলা হবে' (পৃ. ৪২১) বা 'আবার কারো কারো ধারণা', 'অনেকে তো বলে', 'আবার অনেকে বলে' (সবকটি পৃ. ৪২৮) প্রবাদপ্রতিম জালালউদ্দিনকে লোককথার ভঙ্গিমা দান করেছে। এছাড়াও কুতুবউদ্দিনের অলৌকিক কর্মকাণ্ড নিয়ে লেখকের নিম্নোক্ত বক্তব্য অলৌকিক বৈকি :

> জলেশ্বরীর মানুষেরা এ প্রশ্ন করে না, এবং তারা করবে না; তারা যা শুনেছে তা বিশ্বাস করেছে ও করবে; বিশ্বাসের কণ্ঠেই এ কাহিনী পরবর্তী বংশের কাছে তারা বলে গেছে ও যাবে। বংশের



www.pathagar.com

পর বংশে এই দৃশ্য কল্পনার অতঃপর তারা প্রত্যক্ষ করেছে ও করবে যে ... তারা প্রত্যক্ষ করেছে ও তারা প্রত্যক্ষ করবে যে... সেই মাজার ঘিরেই গড়ে উঠেছে আজকের জলেশ্বরী এবং তারা বিশ্বাস করবে এই জলেশ্বরীকে রক্ষা করবে মুক্তিযুদ্ধ নয় হযরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের পবিত্র মাজার।[৩১]

এবার আসা যাক উপন্যাসটিতে সংবাদপত্রের ব্যবহার প্রসঙ্গে। অনুমান করা যায় ঔপন্যাসিক আগে থেকেই সচেতন ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিশাল ঘটনাকে মাত্র একজন বা অল্পকয়েকজনের বর্ণনাতেও বিশ্বাসযোগ্য ও প্রশস্ত করে তোলা সম্ভব নয়। তাই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন খবরের কাগজের। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাক্রম দেশের এবং বিদেশের পত্রিকাগুলো থেকে তিনি কাহিনীতে সংযোজন করেছেন। সাথে সাথে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেসব থেকেও তিনি উদ্ধার করেছেন গ্রন্থে যা *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এ মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক প্রেক্ষিত নির্মাণে সাহায্য করেছে অনেকখানি। ২৬ পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি প্রথম ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরুকালীন সময়ে পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচারের সংবাদ নিয়ে ঘানা থেকে প্রকাশিত *দ্য প্যালাভার* পত্রিকার উপসম্পাদকীয়, ব্রিটেনের *সানডে টেলিগ্রাফ*-এর সংবাদ, অস্ট্রেলিয়ার *দ্য সানডে অস্ট্রেলিয়ান* পত্রিকার সম্পাদকীয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *দ্য ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ*-এর মন্তব্য, একই দেশের সাপ্তাহিক *টাইম* পত্রিকার সংবাদ ইত্যাদিকে মূল কাহিনীর সাথে সংশ্লেষ করা হয়েছে। সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহারের এমন অন্যান্য উদাহরণ হলো : করাচী থেকে প্রকাশিত *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সাংবাদিক অ্যানথনি ম্যাসকারেনহাসের বিবরণ (পৃ. ২৬১), *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর সংবাদ (পৃ. ৩৬৪), এবং ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনা কর্তৃক 'শিখা চিরন্তন' প্রজ্বলন নিয়ে প্রকাশিত সংবাদ (পৃ. ৪৯৪) ইত্যাদি। এদের শেষটি উপন্যাসের সময়কাল থেকে এগিয়ে ভবিষ্যতের একটি সংবাদ নিয়ে। এমন আরও একটি উদাহরণ হলো ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি *দৈনিক পূর্বদেশ*-এর সংবাদ যেখানে বলা হয়েছে 'আল বদরের হেড কোয়ার্টারে পাওয়া গেল এক বস্তা চোখ। এ দেশের মানুষের চোখ। আল বদরের খুনিরা তাদের হত্যা করে চোখ তুলে তুলে বস্তা বোঝাই করে রেখেছিল।'[৩২]

*বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এ ঔপন্যাসিক ডায়েরির ব্যবহারও ঘটিয়েছেন। সে-ডায়েরির রচয়িতা মহিউদ্দিনের ইংরেজি-শিক্ষিত বাবা সৈয়দ জালালউদ্দিন। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন চতুর্পাশকে যখন জালালউদ্দিন সহ্য করতে পারছিল না তখন একদিন সকলের অলক্ষে সে গৃহত্যাগ করে। জালালউদ্দিনের অতীতসহ তার পরবর্তী কর্মকাণ্ড আমরা জানতে পারি একটি অসম্পূর্ণ ডায়েরি পড়ে। ডায়েরিটি কুচবিহার থেকে তার প্রেমিকা কুমুদিনী পাঠিয়েছিল তার স্ত্রী শামাফি বেগমের কাছে। সে-ডায়েরিতে যেমন ধর্মীয় সংস্কার থেকে তার উত্তরণের পরিচয় রয়েছে তেমনি ভারতবর্ষ তথা বঙ্গীয় একালার ধর্মান্ধ রাজনীতির বিকাশ, এদেশীয় মুসলমানের বাঙালি হওয়াসহ অন্যান্য কথাও আছে।

সবশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এর প্রধান ঘটনাসমূহের অধিকাংশই পুনর্বিবরণের ভেতর দিয়ে উপস্থাপিত। বিশেষ করে শাহ্ সৈয়দ কুতুবউদ্দিন



www.pathagar.com

এবং জালালউদ্দিনের কাহিনী পুনর্বিবরণেই পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। স্বয়ং লেখক তাঁর সর্বজ্ঞতা দিয়ে সেগুলোকে উপস্থাপিত করতে না করতেই কুশীলবদের অন্য কেউ আবার সম্পর্কিত বিষয়টি বর্ণনায় নিয়েজিত হয়। আর এভাবেই বিবরণ ও পুনর্বিবরণের ভেতর দিয়ে পাঠক ক্রমে ক্রমে নিজস্ব ও নতুন একটি বিবরণ নির্মাণ করতে থাকেন।

উপন্যাসটিতে আর একটি ব্যাপার কয়েকবার ঘটেছে যেটি বিংশ শতাব্দীতে রচিত উপন্যাসে সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। এতে উপন্যাসিক প্রায়শই পাঠকের সাথে সরাসরি একটি যোগসূত্র নির্মাণ করেন নিজের লেখক অস্তিত্ব ঘোষণার ভেতর দিয়ে। "আমরা ঔপন্যাসিক নই, কিন্তু কল্পনা করতে বাধা কি?..." (পৃ. ৪৪৯) বা "বর্তমান লেখক আশা করেন না..." (পৃ. ৪৯১) প্রভৃতি তেমনই কিছু উদারহণ। যেমন লেখক কোনো রকম রাখ-ঢাক ছাড়াই তাঁর অস্তিত্বের চেতনা দিয়ে কিছু কিছু ঘটনাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন উপন্যাসে। চন্দ্রনাথের ভিটেয় যাবার পথে মরা গাছটি নিয়ে প্রচলিত লোককথা "এই গাছের গুঁড়িতেও কেউ কুড়োল মেরে গলায় রক্ত উঠে মারা গিয়েছিল" নিয়ে লেখকের স্পষ্ট ব্যাখ্যা "লোকটি কুড়োল মারবার মতো কঠিন পেশীচালনার ধাক্কা সহ্য করতে পারেনি, হয়ত ছিল তার যক্ষ্মা, গলা দিয়ে রক্ত উঠেছে, কিন্তু লোকেরা মনে করেছে সে আঘাত কোন দেব কিম্বা অপদেবের স্থানে, তাই তার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে।"[৩৩] তাঁর এ স্বচ্ছ দৃষ্টি তিনি উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র মহিউদ্দিনেও আরোপ করেন। পাঁজরের ভেতর অবিরাম 'আল্লাহ, আল্লাহ' ধ্বনি যা বংশের পূর্বপুরুষ শাহ সেয়দ কুতুবউদ্দিনের মুখ থেকে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত তা নিয়ে শিশুকালে যে বিমোহিত হলেও পরবর্তীতে যে বিশ্লেষণ করে তা হলো "আসলে সে রাতে তার বাবাই ঠোঁট চেপে কণ্ঠের ভেতরে আল্লাহ নাম উচ্চারণ করেছিলেন, আর সেটাই সে হৃৎপিণ্ডের স্বর বলে ধরে নিয়েছিল, সম্ভবত তার বাবাও সচেতন ছিলেন না যে, কিভাবে তিনি উচ্চারণটি সৃষ্টি করেছেন।"[৩৪]

*বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এ মহিউদ্দিনের ভেতর দিয়েই একটি কিংবদন্তীতে প্রবেশ করতে থাকেন লেখক এবং সাথে সাথে মহিউদ্দিনকে নিয়েও তিনি একটি কিংবদন্তী নির্মাণ করতে করতে পরিভ্রমণ শুরু করেন ভবিষ্যতে। বৃষ্টির জন্য মহিউদ্দিনের গেরিলা দলের অপেক্ষা করার কথা বলতে বলতে ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের ইতিহাসকে মুঠোয় নিয়েছেন, বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা এবং সে-প্রসঙ্গেই বলেছেন "তিনি শেষ করে যেতে পারবেন না তাঁর আত্মজীবনী রচনা, তার আগেই তিনি নিহত হবেন।"[৩৫] ভবিষ্যতে পরিভ্রমণের এ ব্যাপারটি *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*-এ বহুবার ঘটেছে। কখনও কখনও লেখক উপস্থিত হয়েছেন গ্রন্থ প্রকাশের বর্তমানকাল পর্যন্তও। ঘটনার সময়কাল থেকে ভবিষ্যতের কালে এমনভাবে উল্লম্ফন বোধ করি বাংলা উপন্যাসের ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি।

ভবিষ্যৎ পরিক্রমণের এ ব্যাপারটি বহুবার বহুভাবে ঘটেছে। সেটা ঘটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই পৃষ্ঠা ১০-এ এবং ভবিষ্যৎ



www.pathagar.com

ইঙ্গিতের মতো ক্ষণস্থায়ী আর একটি ঘটে পৃষ্ঠা ১২-তে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এগারো দিন আগে এগারো দিন পরের কথা বলা হয়েছে। পৃষ্ঠা ১০-এর ঐ একই প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎ বিবৃত হয় পৃষ্ঠা ৪৮-এ যেখানে রয়েছে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে হত্যার কথা। ৭৬-৭৭, ২৫৪-২৫৫, ২৬০, ২৮০, ৩৩৩-৩৩৫, ৩৫৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠাগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কিত ঘটনায় লেখক পরিক্রমা করেছেন। তবে এদের মধ্যে পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৫ আমাদেরকে মর্মন্তুদ একটি অবলোকন ঘটায়। মহিউদ্দিনের চাচা আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আবদুস সুলতানের সাথে যুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালে মহিউদ্দিন ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যায়। এবং সে-বিবরণেই এক সময় ঢুকে পড়ে পঁচাত্তর পরবর্তী বর্ণনা। ঔপন্যাসিকের কৌশল উপলব্ধির জন্য আমরা সে-বর্ণনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করছি :

> আমরাও একদিন এ বাড়িতে আসব। আমারও একদিন এ বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়াব, কিন্তু এক ভিন্ন সময়ে ভিন্ন এক সমুদ্রের পারে।... আমরা বাঁ পাশের সরু ঢাকা বারান্দার গিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাব সার সার ছবি—নিহতদের ছবি, বঙ্গজননীর বুকে শোকার্ত মালার মত ছবিগুলো—যাঁরা উনিশ শ' পঁচাত্তরের পনোরোই আগস্ট ভোর রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নিহত হয়েছিলেন।... আমাদের কোন ফিসফিস করে কেউ বলবে, 'ওই সিঁড়ি।'— তৎক্ষণাৎ আমরা ঘুরে দাঁড়াব, যেন বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, চোখ পড়বে প্রথমেই দেয়ালে শাহাবুদ্দিনের আঁকা বিশাল তৈলচিত্রে—ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রক্তাক্ত দীর্ঘ দেহ নিয়ে বাংলার ইতিহাস রূপে আমাদেরই অন্তর্গত সকল পতনকে ধারণ করে অবিরাম পতনোন্মুখী।[৩৬]

৩৩৩-৩৩৫ পৃষ্ঠায় যেভাবে ভবিষ্যতকে তুলে আনা হয়েছে তার মধ্যেও রয়েছে অভিনবত্ব। যুদ্ধ প্রস্তুতিকালীন সময়ে মহিউদ্দিনের লুকিয়ে রাখা ডিনামাইটে যে কৃষক মারা গিয়েছিল তার মেয়ে মোমেনা রাজাকার ধ্বংসে মহিউদ্দিনের অভিযানে ছিল সক্রিয়। এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় মোমেনাকে। সেই মোমেনার প্রসঙ্গ আসতে আসতেই ঔপন্যাসিক তাই এক সময় বলেন,

> মোমেনার কথা আমরা ভুলে যাব, যেমন আমরা ভুলে যাব একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেক বীর বালিকা ও নারীদের। ...একজন নীলিমা ইব্রাহিমের রচনায় আমরা পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে ধর্ষিতা নারীদের বিরবণ পাব মর্মস্পর্শী ভাষায়, টেলিভিশনে গায়ক-অভিনেত্রী শম্পা রেজার চিত্রণে আমরা একজন বীরাঙ্গণার কথা মূর্ত হয়ে উঠতে দেখব...আমরা মুক্তিযুদ্ধের এক বীরযোদ্ধা তারামন বিবিকে বহু বৎসর পরে আবিষ্কার করব। আমরা কাকন বিবিকেও খুঁজে পাব।
>
> ...আমরা অনুতাপ করব, কে সেতারা বেগমকে দেশত্যাগ করেই বিদেশে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে হলো?...
>
> ...স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের পঞ্চদশ-খণ্ড সেখানে মাত্র একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতি!...
>
> ...আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে কাকন বিবির ফটো দেখব পত্রিকায়।... এভাবেই ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধের সমসাময়িককালের সাথে পরবর্তী প্রায় ত্রিশটি বছরের সময়কে সম্পৃক্ত করেন তাঁর উপন্যাসে যা *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*কে একটি ভিন্ন মাত্রা দেয়।



www.pathagar.com

মহিউদ্দিনের ইংরেজি শিক্ষিত বাবা সৈয়দ জালালউদ্দিনের ডায়েরি থেকে এক সময় আমরা জানতে পারি আবুল মনসুর আহমদের কথা যিনি 'হুজুর কেব্‌লা' লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আবুল মনসুর আহমদের দৃঢ় অবস্থান প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লেখক সেই ভবিষ্যতে চলে যান যেখানে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল ইসলামী রাষ্ট্রকল্পনার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং বঙ্গবন্ধুর নামে বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী জিয়াউর রহমান রাজাকারদের পুনর্বাসনে ব্যস্ত (পৃ. ৪৫৯)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভবিষ্যতের এ সকল পরিক্রমণের একমাত্র কথক উপন্যাসিক নিজে। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় নত সে ঔপন্যাসিকের নিজের অবস্থানও উপন্যাসে অস্পষ্ট নয়। আর তাই আবুল মনসুর আহমদ নিয়ে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> বাংলার পীর ও হুজুরদের কীর্তিকলাপ নিয়ে তিনি 'কেব্‌লা হুজুর' নামে যে অবিস্মরণীয় গল্প লেখেন, আজ সে গল্প স্বাধীন এই বাংলাদেশে কেউ লিখলে তাঁর প্রাণ সংশয় ঘটত;...বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার সরকারের আমলে যদি আবুল মনসুর আহমদ বেঁচে থাকতেন এবং এই গল্পটি লেখার কথা ভাবতেন, তবে তাঁর কলমের কালি শুকিয়ে যেত জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসীদের ভয়ে; অথবা আমাদের অনেক সাহসী লেখকের মতো তিনিও লিখতেন, যে কোন সম্পাদকই তা ছাপতে ভয় পেতেন এবং জানাতেন—আহ্, কী দুঃখের কথা, আপনার লেখাটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি।[৩৭]

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলো ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধকালীন বর্তমান থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালীন ভবিষ্যতে লেখকের গমনাগমনের আরও উদাহরণ রয়েছে যা উপন্যাসটিকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালের দেশ ও জাতির ব্যর্থতার উপন্যাস হিসেবেও উপস্থিত করেছে।

## উপসংহার

কথক প্রশ্নটি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্মকাল থেকেই সমান গুরুত্বে বিবেচিত। প্রথম থেকেই এ ক্ষেত্রে বিবিধ নিরীক্ষাও লক্ষণীয়। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্যরা সে-নিরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। তবে কথক প্রশ্নের জটিলতার কারণে উপন্যাসের কাহিনীতে প্রবেশে পাঠক বাধাগ্রস্ত হয়েছেন এমন উপন্যাসের নাম করতে সর্বপ্রথমেই আসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো*র কথা। আর, যদি একটি উপন্যাসে বহু পদ্ধতির কথকের সুশৃঙ্খলা বিন্যাস অনুসন্ধান করতে হয় তবে সর্বাগ্রে যে নামটি বিবেচনার যোগ্য তা হলো সৈয়দ শামসুল হকের *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*। এ গ্রন্থ দু'টি বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যাসের সার্বিক সফলতার নিরীখেও ভবিষ্যতে নতুন নতুন আলোচনার উৎস হবে এমনটি সহজেই আশা করা যায়।

## তথ্যনির্দেশ

১. Seymour Chatman, 'Discourse : Nattated Stories', *Essentials of the Theory of Fiction*. ed. Michael Hoffman and Patrick Murphy. (London: 1988), p. 367



www.pathagar.com

২. তত্ত্বগতভাবে কথক সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচিত হতে শুরু করে আমেরিকার ঔপন্যাসিক Henry James (১৮৪৩-১৯১৬)-এর উপন্যাসগুলোর ভূমিকাকে যেগুলো পরবর্তীকালে *The Art of Novel* (১৯৩৪) এবং *The Future of the Novel* (১৯৫৬) শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে Norman Friedman-এর 'Point of View in Fiction: The Development of a Critical Concept' প্রবন্ধে Editiorial Omniscience, Neutral Omniscience, Meltipliple Selective Omniscience, Selective Omniscience প্রভৃতি বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচিত হয়। কথক বিষয়ের আর একজন প্রধান আলোচক হলেন Wayne Booth। তাঁর *The Rhetoric of Fiction* গ্রন্থের "Distance and 'Point-of-View' : An Essay in Classification" প্রবন্ধটিতে Dramatised Narrator, Undramatised Narrator, Implied Author প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোকিত হয়েছে। কথক বিষয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে খ্যাতিমান অন্যান্যরা হচ্ছেন Percy Lubbock, Mitchell A. Leaska Tzvetan Todorov প্রমুখ।

৩. *Bloomsbury Guides to English Literature : The Novel*, ed. Andrew Michael Roberts, (London : 1993), p. 241

৪. William Henry Hudson, *An Introduction to the Study of Literature*, (New Delhi : 9th Indian Edition 1979) p. 143

৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য* (সম্পা: আলোক রায়), (কলিকাতা : পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৯৯৩, পৃ. ১১৫

৬. শহীদুল জহির, *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*, (ঢাকা : ১৯৯৫)

৭. William Henry Hudson, ibid

৮. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি*, (কলিকাতা : ১৯৮২), পৃ. ১২২

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

১০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ *কাঁদো নদী কাঁদো, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী*, সম্পা: সৈয়দ আকরম হোসেন, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩), পৃ. ২১৮

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

১২. শিরীন আখতার ,'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর উপন্যাস', *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ২৩৬

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

১৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-২৫৪

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-২৮৪

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-২৮৭

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৫

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯-৩৩৫

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০-৩৪৭

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩



www.pathagar.com

২৪. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *'কাঁদো নদী কাঁদো* প্রসঙ্গে একটি অসম্পূর্ণ উপলব্ধি', *দিবারাত্রির কাব্য*, সম্পা, আফিফ ফুয়াদ, (২৪ পরগনা, পশ্চিম বাংলা) অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ২৬১
২৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫
২৬. সৈয়দ শামসুল হক, *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*, (ঢাকা : ১৯৯৮), পৃ. ১৩
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
২৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৩৫
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮

*বাংলা একাডেমী পত্রিকা* এপ্রিল-জুন ২০০০ (৪৪ বর্ষ: ১ সংখ্যা)-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# লোকনাথ ভট্টাচার্য ও তাঁর উপন্যাস

লোকনাথ ভট্টাচার্য ২০০১ সালের ২৫ মার্চ কায়রোতে সড়ক দুর্ঘনায় নিহত হয়েছেন এ সংবাদটি বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে ক্ষুদ্রতম কলেবরে হলেও ছাপা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু বড় সংবাদ হিসাবে গ্রাহ্য না হলেও বিশেষ দোষের হতো না, যেহেতু বাংলা সাহিত্যের যে সকল লেখকের মোটেই পাঠক জোটে নি, তাঁদের মধ্যে লোকনাথ ভট্টাচার্য অন্যতম। কমলকুমার মজুমদার প্রমুখ তাঁদের জটিল ভাষারীতির কারণে পাঠকপ্রিয়তা না পেলেও কিছু পাঠকের কাছে তাঁদের নাম বেশ পরিচিতি পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু লোকনাথ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে তাও ঘটে নি। যদিও ভাষারীতির এ জটিলতা লোকনাথে নেই। যা তাঁকে পাঠে পাঠকের প্রতিবন্ধকতা, তা হলো উপস্থাপনা রীতির অভিনবত্ব যা অধিকাংশ বাংলাভাষী পাঠকের কাছে অদৃষ্টপূর্ব। এ ছাড়াও হয়ত নিজের লেখার প্রকাশনা নিয়ে তাঁর খানিকটা সংকোচ ছিল; তদুপরি প্রকাশিত রচনার মূল্যায়নে বলা যায় কোন মহলই বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে নি। ১৯৭৬ থেকে শুরু করে ফরাসি ভাষায় তাঁর প্রায় বিশটি গ্রন্থ অনূদিত হলেও এবং সব মিলিয়ে প্রায় ২৫টি গ্রন্থের প্রণেতা হয়েও তিনি আদৃত হন নি বাংলাভাষী পাঠকের কাছে। যদিও ফরাসি ভাষী পাঠকের কাছাকাছি তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন অনেক আগেই। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সরকার কর্তৃক 'অফিসার দেন আর্টস এ্যাট দেম লেটার্স' সম্মানে ভূষিত হওয়া ছাড়াও মৃত্যু পূর্বকালীন কায়রো ভ্রমণ প্রসঙ্গটিও একটি অবশ্য উল্লেখ্য বিষয়। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন ফরাসি সরকার কর্তৃক এক কবি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েই, যা তাঁর লেখক সত্তারই স্বীকৃতি বৈকি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য একাধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার এবং অনুবাদক। ঔপন্যাসিক অভিধাটি আলাদা করে উল্লেখ করতে চাই এ জন্য যে, এক্ষেত্রেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অভিনবত্ব ও শিল্পসাফল্য তিনি প্রদর্শন করেছিলেন। যদিও র‍্যাঁবো, মলিয়ের, দেকার্ত, আঁরি মিশো বা সার্ত্রের অনুবাদক হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ মনোযোগের।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে লোকনাথ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। ১৯৪৫-এ আই এ পাস করে ভর্তি হন শান্তিনিকেতনে। ১৯৫০ থেকে ফরাসি ভাষা শিক্ষা শুরু করে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পেয়ে যান ফরাসি সরকারের বৃত্তি। গবেষণার মূল বিষয় ছিল ভাঙ্গা সংস্কৃতে লিখিত ও প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত এক বৌদ্ধ ডাকিনী তন্ত্রের পুঁথির ফরাসি অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসমেত উপস্থাপন। সাথে আরও একটি যে গৌণ বিষয় ছিল, তা হলো র‍্যাঁবো ও পল এলুয়ারের



www.pathagar.com

কাব্যে আমি'র রূপ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা। মূল বিষয়টিতে তাঁর নাকি খুব আগ্রহ ছিল না। বরং ঝোঁক ছিল অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক গবেষণায়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পান ডক্টরেট ডিগ্রি। ইতোমধ্যে সমসাময়িকদের মতো মার্কসবাদী দর্শনেও প্রভাবিত হন। এ সময়ই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ফরাসি নাগরিক ফ্রাঁস মতেরুর সঙ্গে। ততদিনে র‍্যাঁবোর অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে গেছে ১৯৫৪ তে। ১৯৬৬ সালে প্রকাশ করেন প্রথম উপন্যাস *ভোর*, যদিও রচনাকালের বিচারে সেটি তাঁর তৃতীয় উপন্যাস। একই বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *যত দ্বার তত অরণ্য*। ১৯৬৭ তে প্রকাশিত হয় *দুয়েকটি ঘর দুয়েকটি স্বর* যেটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। পরবর্তীকালে প্রকাশিত উপন্যাসগুলো হলো : *বাবুঘাটের কুমারী মাছ* (১৯৭২), *থিয়েটার আরম্ভ সাড়ে সাতটায়* (১৯৮৩), *অশ্বমেধ* (১৯৯৭) এবং *গঙ্গাবতরণ* (১৯৯৮)। সাতের দশকের শেষ দিকে *তিমির তরাই-এ পক্ষাঘাত* নামে যে উপন্যাসটি তিনি লিখেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকা *চতুরঙ্গ*-এ সেটিরই বীজ পরিবর্তিত কাঠামোর উপস্থাপন হলো *গঙ্গাবতরণ*। একই সঙ্গে উল্লেখের প্রয়োজন যে, শেষ দু'টি উপন্যাস বাংলায় প্রকাশের অনেক আগেই ফরাসি ভাষায় ফ্রাঁস মতেরু (ভট্টাচার্য) কর্তৃক অনূদিত হয়ে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৯১-এর লেখা *গঙ্গাবতরণ* ১৯৯৩ সালে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হলে প্যারিস থেকে প্রকাশিত *ইনডিকেশন্স* পত্রিকায় এর সপ্রশংসা আলোচনা করা হয়। এ ছাড়াও লোকনাথ ভট্টাচার্যের আরও একটি উপন্যাস রয়েছে। ১৯৯৯-এর কলকাতা থেকে প্রকাশিত *এবং মুশায়েরা* পত্রিকার (সম্পাদক: সুবল সামন্ত) লোকনাথ ভট্টাচার্য বিশেষ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর ক্ষুদ্র একটি উপন্যাস *করেছ একি সন্ন্যাসী*। ১৯৮৬'র মে-জুন মাসে রচিত মাত্র ৮০ পৃষ্ঠার এ উপন্যাসটিও তাঁর একটি অনন্য সৃষ্টি বলে সমালোচকরা মনে করেন।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করার আগে উপন্যাস বিষয়ে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত ভাবনা উদ্ধার করতে চাই। সেটি হলো—

> বাস্তবধর্মিতায় আমার আগ্রহ কম, বিশ্বাস কম বিশেষত বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের চিত্রাঙ্কন আমার ক্ষমতার বাইরে, আগ্রহের সম্পূর্ণ বাইরে। আমার আছে পথ, আমার আছে রাত্রি এবং সেই পথ ধরো সারা রাত বেয়ে চলা, ভোরে কোথাও পৌছানো, হয়ত কোনখানেই পৌছানো নয়—মাঝখানে আকাশ ও অতিক্রম করে চলা বনের ফিসফাস, সত্তার দুঃসহ দুঃখ, যন্ত্রণা, স্বপ্ন, অভিশাপ এবং মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু।

একটি রাত ধরে ভোরের উদ্দেশে পথ চলার কাহিনী হিসাবে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর *ভোর, থিয়েটার আরম্ভ সাড়ে সাতটায়, গঙ্গাবতরণ* উপন্যাসকে।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যে প্রসঙ্গটি বার বার উচ্চারিত হয়, তা হলো ফরাসি উপন্যাস বিষয় 'নোভা রোমান' বা নব উপন্যাস আন্দোলন। ১৯৫০-এর দিকে উপন্যাসের কাঠামোগত অভিনবত্বের প্রত্যাশায় ফ্রান্সে গড়ে ওঠা এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ক্লোদ সিঁম ও নাতালি সারৎ। প্রথানুযায়ী কোন আখ্যান না থাকাই এ ধরনের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাথে সাথে অন্য আরও যে চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য 'নোভা রোমান' ধারণ করেছিল তা হলো শিল্প শুধুমাত্র দেখাবে, ব্যাখ্যা



www.pathagar.com

করবে না। লোকনাথ নিজেই ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে এ সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ 'বস্তুপ্রেমিক ফরাসি 'নব উপন্যাস" রচনা করেন। সে প্রবন্ধে আরও যে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে তিনি বিশেষ গুরুত্বের বলে মত দিয়েছেন, সেগুলো হলো (১) নব উপন্যাসের নায়ক ও অন্যান্য চরিত্র নামহীন, আসলে তাদের চরিত্রের অস্তিত্ব নেই, (২) চরিত্রদের অবিচ্ছিন্ন গতিভঙ্গি এবং (৩) আত্মজিজ্ঞাসা ও বস্তুজগতের আত্মোপলব্ধির জন্য রহস্যের ভিতর দিয়ে অগ্রসরণ।

'লোকনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাস' প্রবন্ধে বিশিষ্ট সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লোকনাথের নিজের উপন্যাসেই এসব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিকে বিশ্লেষণ করেছেন সুন্দরভাবে। আলোচনার এক পর্যায়ে তাই তিনি বলেছিলেন, 'বাস্তবতা নির্ভর কাহিনীতে তাঁর আগ্রহ নেই... সমকালীনতা ও বাস্তবতা দুটোকেই তিনি বর্জন করেছেনে...। তাঁর উপন্যাসে বাস্তব চরিত্রেরও কোন অস্তিত্ব নেই।... ঝোঁক বরং সর্বনামের প্রতি- 'আমি', 'সে', 'তারা', 'ওরা' ফিরে ফিরে আসে।'

লোকনাথ নিজে সমালোচকের এ ভাবনার বিপ্রতীপে অবস্থান নিলেও (বীতশোক ভট্টাচার্যকে দেয়া সাক্ষাতকার, *এবং মুশায়েরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯২) বিস্তৃত বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত এ মানুষটির উপন্যাসগুলোতেও ফরাসি নব উপন্যাসের আন্দোলনের প্রভাব পরোক্ষ হলেও প্রোথিত। যদি শুধুমাত্র শেষ দু'টি উপন্যাস *অশ্বমেধ* ও *গঙ্গাবতরণ*-এর আলোকেও বিবেচনা করা যায় তা হলেও উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করা অসম্ভব নয়। দুটিই পরিভ্রণের কথা—বাহিরীক নয়, যেন মনুষ্যমনের গভীরতম জগতে পরিভ্রমণ। উপরি কাঠামোতে যদিও সেখানে ভ্রমণ শেষে এক গন্তব্যের কথা বলা আছে। প্রায় শূন্য কাহিনী কাঠামোয় সে ভ্রমণ পরিব্যাপ্ত। *ভোর* বা *থিয়েটার আরম্ভ সাড়ে সাতটায়*-এও তেমন ভ্রমণেরই চিত্রণ পাওয়া যায়, যদিও শেষে রচিত উপন্যাস দু'টিতে তা অধিকতর নতুন মাত্র গ্রহণ করেছে। সে যাত্রায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিরা করা? *অশ্বমেধ* শুরু হয়েছে 'তুমি যা খুশি বল, বলবে?' দিয়ে এবং তৃতীয় বাক্যটিতে রয়েছে 'আমায় শুধু অধিকার দাও চুপটি মেরে তোমার পাশে পড়ে থাকার, তোমাকে দেখাব।' এভাবেই সর্বনামগুলো চরিত্র হয়ে যায়, 'আমি বা 'তুমি'র পরিচয়টা মূখ্য থাকে না। যদিও *গঙ্গাতরণ*ও সর্বনামের উপন্যাস, সেখানে চরিত্রগুলো নিজ নামেও উপস্থিত। 'আমাদের পরিচয় দেয়া দরকার, জানি। এখুনি সেটা দিচ্ছি,হাতে অবশ্য সময় বেশি নেই। সময় কারুরই নেই, না আমাদের, না আপনাদের, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদেরই শুধু নয়, আমাকেও, বিশ্বাস করুন,... বলে যে কাহিনী শুরু সেটাতে একটু পরেই 'আমি' লোকটির পরিচয় হলো 'আমি হলাম লোকনাথ, পদবি ভট্টাচার্য'। 'আমি' বাদে অন্য সর্বনামগুলো আস্তে আস্তে যেসব নামে আবির্ভত হয় সেগুলো হলো বৃন্দাবন, সমীরণ, সুনন্দা, ধ্রুব প্রভৃতি এবং *গঙ্গাবতরণ* আরও বিশিষ্ট্য এ জন্য যে, এতে উক্ত চরিত্রগুলো (প্রশ্ন যদিও থেকেই যায় যে তারা প্রচলিত অর্থে চরিত্র কিনা) দীর্ঘ আলাপের ভেতর দিয়ে উপন্যাসটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে দূর লক্ষ্য হিসাবে প্রতীয়মান অস্তিত্বের সঙ্কট বা জীবন জিজ্ঞাসা। সেই সাথেই *অশ্বমেধ* এবং *গঙ্গাবতরণ*-এ লোকনাথের ভারত-ঐতিহ্য



www.pathagar.com

বিশেষভাবে প্রকটিত যা তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোর তুলনায় এ দু'টিকে বিশিষ্ট্যতাও দান করেছে।

ফরাসি নব উপন্যাসের ছাপ লোকনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে লক্ষিত হলেও এ কথা আমাদেরকে স্বীকার করতেই হয়, তিনি দেশীয় প্রেক্ষাপটে দেশীয় দর্শনেই তাঁর উপন্যাসকে নির্মাণ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাভাষী সমসাময়িক সৎ লেখকদের অন্যতম, যেহেতু তিনি জনপ্রিয়তার বা অন্য কোন মোহ দ্বারা তাড়িত নন। তাঁর ছিল একটিই অনুপ্রেরণা, আর তা হলো শিল্প নির্মাণ।

দৈনিক *জনকণ্ঠ* সাময়িকীতে ১৩ জুলাই ২০০১-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# সুলেখা সান্যালের কথাসাহিত্য

সাহিত্যিক ও রাজনীতিক সুলেখা সান্যাল (১৯২৮-১৯৬২) আজ বিস্মৃতপ্রায় একটি নাম। অথচ চল্লিশের দশকের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মানুষদের মুখে মুখে প্রচারিত। ফরিদপুর জেলার বর্ধিষ্ণু এক গ্রাম কোঁড়কদির মেয়ে এই সুমহান লেখিকা। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করলেও তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টা উপেক্ষণীয় নয়। কোঁড়কদি গ্রামে অবস্থান করে কৈশোরকালেই তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন যেমনভাবে পরবর্তীতে কোলকাতাতে চলে যাওয়ার পরও তাঁর সে কার্যক্রম হ্রাস পায় নি। সুলেখা সান্যালের উপন্যাস *নবাঙ্কুর* (১৩৬২)-এ তৎকালীন বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও তাতে বেড়ে ওঠা এক মেয়ের কাহিনী মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণিত। আত্মজৈবনিক *নবাঙ্কুর* ছাড়াও ১৯৬৪ সালে মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *দেওয়াল পদ্ম*। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *নবাঙ্কুর* (২য় খণ্ড), *হৃদয়ের রং* এবং *মুকুরের মুখ*।[১] তাঁর রচিত ত্রিশটি গল্পের সবগুলোই বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের ফসল যেগুলোতে চরিত্ররাও সুলেখার নিজের ব্যথা-বেদনায় অংশীদারী। তাঁর নাম বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনার গ্রন্থগুলোতে অনুপস্থিত থাকা হয়ত আমাদের মননের দরিদ্র্যকেই প্রকাশ করে।

১৯২৮ সালের ১৫ জুন সুলেখার জন্ম হয়। চট্টগ্রামে মাসির বাড়িতে কেটেছিল তাঁর শৈশব। সাত বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করলেও ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামে বোমা বিস্ফোরণের পর নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৪-এ প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৬ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই এ পাস করে কোলকাতায় গিয়ে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট-এ ভর্তি হন বি এ পড়ার জন্য। ১৯৪৮ সালে সুলেখা তাঁর পছন্দের এক রাজনৈতিক সহকর্মীকে বিয়ে করেন। তাঁদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তরুণ স্যান্যাল লিখেছেন :

> অবন্তী সান্যাল মহাশয়রা তিন ভাই, দুই বোন। অবন্তী সান্যাল সবথেকে বড়, তার পরে অজিত সান্যাল যিনি একসময় বুলবুল চৌধুরীর নৃত্য সংস্থায় যুক্ত হয়ে বিদেশ ঘুরে এসেছেন এবং ছোট সুজিত সান্যাল বর্ধমান রাজ কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। আর দুই বোনের মধ্যে বড় ছিলেন সুলেখা সান্যাল এবং ছোট বোন সুজাতা। এই সুজাতা পরবর্তীকালে আমার সহপাঠী শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহিত হয়।[২]

একটি বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে গ্রেফতার বরণের কারণে যথাসময়ে বি এ পরীক্ষা দিতে পারেন নি। জেল থেকে পরীক্ষা দিয়ে তিনি পরে বি এ পাস করেন। ১৯৫৭ সালে



www.pathagar.com

তাঁর শরীরে লিউকোমিয়া ধরা পরলে চিকিৎসার জন্য মস্কো পর্যন্তও গিয়েছিলেন। ফিরে আসেন হতাশ হয়ে। এবং তারপরে থেকে সুলেখার নিরত প্রচেষ্টা সাহিত্য—সাহিত্যের ভেতরে নিজের মন্থিত যন্ত্রণার লিপি দিয়েই তিনি একটি অবলম্বন পেতে চেয়েছিলেন। ১৯৬২ সালের ৪ ডিসেম্বর সুলেখা স্যান্যাল মারা যান।

উপন্যাসের মত ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও সুলেখা সান্যাল সমান মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে তাঁর একমাত্র ছোটগল্প সংকলন *সিঁদুরে মেঘ* প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলোর মধ্যে শিরোনামের গল্পটি ছাড়াও রয়েছে 'জীবনায়ন' 'জন্মাষ্টমী' 'ফল্গু' 'গাজন সন্ন্যাসী' 'ছোটমাসি' 'খেলনা'। এগুলো ব্যতিরেকেও তাঁর আরও তেইশটি গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৪০৭ বঙ্গাব্দে তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়) সুলেখা রচিত ১৮ টি গল্পের একটি সংকলন *সুলেখা সান্যালের গল্পসংগ্রহ* নামে প্রকাশ করেন।

*নবাঙ্কুর* সুলেখা সান্যালের ছাব্বিশ বছর বয়সের ফসল। পরবর্তীকালে উপন্যাসটির দু'টি সংস্করণও বাজারে এসেছিল এবং সুলেখা সান্যালের ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক দুভাগ্যের মতই বাংলা উপন্যাসের পাঠকের দুর্ভাগ্য এই যে উপন্যাসটির উল্লেখ এতদ্‌সংক্রান্ত কোন আলোচনা-ইতিহাস গ্রন্থে স্থান পায় নি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *পরিকথা* লিট্‌ল ম্যাগাজিনের (সম্পাদনা : দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়) মে ২০০০ সংখ্যা 'বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস' বিষয়ে যে বত্রিশটি উপন্যাসের আলোচনা হয়েছে তাতে *নবাঙ্কুর*-এর অন্তর্ভুক্তির কারণেই অনেক সমালোচক নড়েচড়ে বসেন। ফেব্রুয়ারি ২০০১-এ শ্যামলী গুপ্তের সম্পাদনায় *শতবর্ষের কৃতী বঙ্গনারী*তে সুলেখা সান্যালের নাম অন্তর্ভুক্তি আরও একটি অগ্রসরণ। তবে একই বছরে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ *Nabankur: The Seedling's Tale* এবং সে ইংরেজি সংস্করণের উপর আলোচনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে নারীবাদী উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থটির অবস্থান কোথায়। অন-লাইনে www 2. cddc.vt. edu/mtm/Six. htm বা www. meghdutam. com/crittemp.php? name = crit 1. htm বা /www.hinduonnet.com/thehindu/1r/2002/06/02/stories/20 02060200290400. htm পাঠ করেই হয়তো *নবাঙ্কুর*-এর মূল্যায়ন আমাদের জানতে হবে।

*নবাঙ্কুর* একজন নারীর হয়ে ওঠার কথা। একজন কেন্দ্রিয় চরিত্রের হয়ে ওঠার যে কাহিনী ইংরেজি সাহিত্যে *The Way of All Flesh* (Samuel Butler: 1902), *Sons and Lovers* (D.H. Lawrence : 1913) বা *A Portrait of the Artist as a Young Man* (James Joyce : 1916) প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাসে ধৃত যা 'Bildungsroman' বলে প্রচলিত; যে ধারা বাংলাভাষায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) এবং *অপরাজিত* (১৯৩১) ছাড়া একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হুমায়ুন আজাদের (১৯৪৮-২০০৪) *সব কিছু ভেঙ্গে পড়ে* (১৯৯৫) এবং উপর্যুক্ত সবকটি উপন্যাসেই যা একজন পুরুষের হয়ে ওঠা



www.pathagar.com

সেসবেরই বিপরীতে *নবাঙ্কুর* একজন নারীর হয়ে ওঠা— যে ধারার সাম্প্রতিক সংযোজন তসলিমা নাসরিনের (জন্ম ১৯৬২) *আমার মেয়েবেলা* (১৯৯৯)।

ভারতের *দি হিন্দু* পত্রিকা উপন্যাসটির ইংরেজি সংস্করণের আলোচনা করতে যেয়ে লিখেছে :

> Cast in the mould of a feminist bildungsroman, Sanyal traces the tale of Chhobi (literally, "picture"), a gusty and hardy little girl who grows up to defy the conventions of a patriarchal family order in Bengal during the last, frantic decades of India's anti-colonial struggle. Born and educated in Bangladesh in her early life, Sanyal herself received her political education from her brother and his friends who were involved in revolutionary terrorist activities against the British, and her sympathies are clearly identified in Chhobi's tomboyish enthusiasm for the undercover work the young men around her risk their lives for in their patriotic fervor. Sanyal had been a member of the Communist party in her college days in Calcutta (where she came after partition), and this, her first novel, is imbued with her fledgling political views about freedom, space and choice. Somewhere along the way—perhaps almost unconsciously for the author, and certainly not consciously for her protagonist, these ideas that hung like dewdrops in the nationalist air outside entered Chhobi's very being, condensed into dreams of personal freedom, and crystallised into rebellion, of the sort that we would label today as feminist. As with all causes Chhobi in the single-minded pursuit of her's, struggles and bleeds, of course, but emerges hopeful. She is a significant signifier in an arid landscape of female oppression as she finally boards the train that will take her from her village to Calcutta, a sequence in which one may identify all the landmark tropes for modernity, advancement, and the quest for personal freedom denied to young rural women of her time. This "picture"—the final freeze, as it were—blushes with hope and promise, both romantic and political, aspiring toward emancipation at multiple levels of living and being, espying fulfillment. [৩]

*নবাঙ্কুর*-এর কেন্দ্রিয় চরিত্র ছবি—ছবির কৈশেরের প্রারম্ভিক সময় থেকে যৌবনের দ্বারে পৌছানোর সময়কাল উপন্যাসটিতে বিধৃত। ছবির পূর্বপুরুষ নীলকুঠির মালিক আর



www.pathagar.com

বর্তমান পুরুষ সেই লুপ্ত ঐতিহ্যের ধারক নিম্নমধ্যবিত্ত একটি পরিবার। স্বদেশী আন্দোলনের কালে যখন ছবি আট-নয় বছরের মেয়ে তখনই তার বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ—ঠাকুরদাদার কথা প্রত্যাখান কেননা ঠাকুরদাদা অন্যায়ভাবে এক গরীব জেলেকে চটি দিয়ে প্রহার করেছে। পাঠশালার ছবির তখনকারই স্বপ্ন অনেক লেখাপড়া করবে আর সাহসী হবে যখন কিনা তার সমবয়সী পাঠশালার মেয়েরা বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়। অন্য মেয়েরা যখন নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছবি তখন বাড়ির ছেলেদের মত করেই সব কিছু পেতে চায়। ছবির এই যে পড়াশোনার আগ্রহ, অধিকারগত চেতনা সেখানে কি কারো প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল? —অপ্রকাশিতভাবে তার মা মমতার চৈতন্য ছবিতে প্রবাহিত এটি অনস্বীকার্য।

এরপর গ্রামের ছবি চলে গেল শহরে বড় পিসিমা সুকুমারীর সাথে। মা-মেয়ে পরস্পরকে ছেড়ে থাকার বেদনা স্বীকার করে নেয় শুধুমাত্র একটি কারণেই তা হলো পিসিমার ওখানে সে স্কুলে পড়বে, পাস করবে, কলেজে পড়বে আর বড় হবে অধীরকাকার মতো। শৈশবে স্বদেশী অধীরকাকা ছিল ছবির স্বপ্নের মানুষ, আরও বড় হয়ে তিনিই ছবির দীক্ষাগুরু—অনুপ্রেরক। শহরে যাওয়ার আগেই কিন্তু ছবি বুঝে গিয়েছিল সমাজে নারীর অবস্থান—কালো বিচ্ছিরি বিন্তিপিসির বিয়ে না হওয়ার যন্ত্রণা, রায়বাড়ির বাঁধা পুরোহিত ভট্টাচায্যি ঠাকুরের ভাগ্নি পিতা-মাতাহীন মায়াদির কষ্ট, অধীরকাকার বোন শ্বশুরবাড়ি ফেরত লতু পিসিমা শ্বশুরবাড়ি ফেরত সব কিছু মিলেমিশে ছবিকে এসব কিছুর বাইরে যাওয়ারই চেতনায় পৌছেছে। ছবির লৈঙ্গিক এই বিদ্রোহের মাটিতে পলি জমিয়েছে শহরে অবস্থানকালে তার রাজনৈতিক বোধ। ইংরেজ তাড়াতে সারা বাংলা জুড়ে যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে ততদিনে তাতে তো অংশীদার ছবিদের দিদিমনি সুধাদিও। সে আলোতে ছবিও ক্রমাগত উদ্‌ভাসিত। তার সাথে যুক্ত হয়েছে ভিন্ন কত অনুষঙ্গ যা ক্রমাগতই ছবিকে আরও বেশি অভিজ্ঞ করে তোলে। গরিব নিলু-পিলুদের দুঃসহ জীবনাত্রা, খ্রিস্টান অসীম-মিনুর মায়ের উৎকণ্ঠা, ঘুটে কুড়ানী মেয়ে মুসলমান পরীবানুর ক্লাসে ফাস্ট হওয়া সত্ত্বে না করা ইত্যাকার সব ব্যাপারগুলো ক্রমশ নতুন নতুন মানস-চেতনায় ছবিকে নিয়ে যেতে থাকে। তারপরও ছবির জীবন 'রূপকথার গল্প নয়, সত্যি সত্যি গল্প' যে প্রেক্ষাপটেই ছবির একদিন আবিষ্কার 'সে বড় হয়েছে'; তার কৈশোর আচ্ছন্ন করে রেখেছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

এরই মাঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল—বোমা পড়ার আতঙ্কে শহরবাসী সবই শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করলো, যারা পালানো না তারা মিলিটারী এসে মেয়ে ধরে নিয়ে যাবে এই ভয়ে পালাতে বাধ্য হলো। তেমনি এক সময়ে যখন মাত্র দু'বছর পর ছবির ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ছবিও ফিরতে বাধ্য হলো তার নিজ গ্রামে। যেয়ে দেখল তার স্বপ্নের অধীরকাকা স্বদেশী করার দায়ে পাঁচ বছর জেল খাটার পর কৃষক সমিতি করতে গিয়ে যক্ষ্মায় আক্রান্ত। সেই প্রিয় মানুষটিই তো ছবিকে বলে, 'মরবার আগে অন্তত একটা মেয়েকে দেখে যেতে পারি, যে ভয় পায় না মুখ থুবড়ে পড়ে না যন্ত্রণায়'। হ্যাঁ ছবি সেই



www.pathagar.com

মেয়েই হয়েছে যে ভয় পায় নি, মুখ থুবড়েও পড়ে নি। আর তাই আবার ছবির পড়াশোনা শুরু স্কুল শিক্ষক সুখদাকাকার কাছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রামবাংলার ঘরে হানা দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ: সানুনাসিক স্বরে চতুর্দিকে চিৎকার 'চাড্ডি দেও গো, ফেন দেও মা'। সে সবের মোকাবেলায় অন্যসব ছেলেদের সাথে 'কখন দিশেহারার মতো বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে ছবি'। পরিবার ও সমাজ থেকে দু'টি ব্যাপারেই এসেছে প্রবল বিরোধ পড়াশোনা আর সমাজ-কল্যাণ দু'টোই তো শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য। কেননা 'জ্ঞান হবার পর থেকে সে শুনেছে সে ছেলে নয়, মানুষও নয়—সে মেয়ে। মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই, হাসতে নেই, পড়তে নেই। আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই।' ইন্টারনেটে Women on Women শিরোনামের এক লেখায় তাই বলা হয়েছে :

> The novel notes a number of points in her life when Chobi worries her mother because, even as a young girl, Chobi refused sexual difference, asking for the same share of food the boys get, refusing to cry when beaten for such audacity, expecting not to be inferior to anyone. Sanyal makes sure we don't see Chobi as a female man by marking her share of "maternal" traits (she is, of example, her little brother Pradip's great comforter). Sanyal also keeps the women of the house (grandmother, aunt, mother) ambivalent about Chobi, sometimes responding almost viciously to her failure to practice compliance and deference, sometimes more proud of her than of the sons sometimes tenderly agonizes over the possible dire consequences of her unconventionality, sometimes defensive or protective of her. Chobi's sister Sefu weeps enough over having to replace Chobi in the proposed marriage, but lacks the strength to turn her tears into Chobi's refusal. I take this balancing act by Sanyal as a way of posing Chobi and her family's women on the very edge of a tidal shift that was beginning to bring more and more Indian women some unfamiliar alternatives—India gages—to the prison-like gender roles one often finds in fiction. [8]

ছবি কিন্তু মেয়ে হয়ে থাকে নি, এমনকি ছেলেও হয় নি বরং বলা যায় মানুষ হয়েছে। মানুষের স্বাধীন চিত্ততার জয়গান গেয়েছে সকল প্রতিরোধের মুখেও। আর তাই পাত্রপক্ষ দেখতে এলে তীব্র প্রতিবাদে সে-আয়োজন নস্যাৎ করে সে। বেত্রাঘাত খেয়ে, গৃহবন্দী থেকেও সে একনিষ্ঠ থেকেছে তার ভালবাসার কাছে। 'ভালবাসাই আসল। সেখানে জাত নেই, ধর্ম নেই, কুমারী-বিধবার প্রশ্ন নেই'—অধীরকাকার এ বাণী ছবির প্রধান পাথেয়।



www.pathagar.com

ঔপন্যাসিক সুলেখা সান্যালে কৃতিত্ব বর্ধিত হয় যখন পাঠক আবিষ্কার করেন ছবির এই মানুষ হয়ে ওঠার কাহিনী লেখিকা স্থাপন করেছেন একটি রাজনৈতিক ঐতিহাসিক চেতনা সমৃদ্ধ সময়ে। স্বদেশী আন্দোলনে সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং তেভাগা আন্দোলনের মতো ঘটনাসমূহ *নবাঙ্কুর* এ ঝিলিক দিয়ে ওঠে বারবার এবং পাঠক-চৈতন্যে লেখিকার রাজনৈতিকবোধ ক্রমাগত আছড়ে পড়তে থাকে। *নবাঙ্কুর*-এর আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য বলেছেন :

> উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্যও পাঠকের চোখে পড়ে। নায়িকা ছবির বয়সের বিভিন্ন পর্বে ক্রমাগত তার দেখার চোখ পাল্টায়। সূচনা পর্বে যখন সে বেশ ছোট, তখন সে কল্পনার জগতে, রূপকথার জগতে বাস করে। সব কিছুতেই বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছে হয়।... এই সব সরলতা ছবিকে প্রথম থেকেই স্বাভাবিক করে রাখে। পাশাপাশি তার চোখ-কান সব সময়ই খোলা। সিদ্ধান্তে পৌছানোর বয়স তখনও তার হয়নি, কিন্তু সেই বয়সেই অনেক ব্যাপারে তার মনে খটকা লাগে। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রধান লক্ষণ হল নারীদের পরস্পরের প্রতি মমতা এবং সহানুভূতি। ছবির ক্ষেত্রে তাঁর সূচনা নিজের মাকে দিয়ে। শহরের শিক্ষিত পারিবারের মেয়ে গ্রামীণ জমিদারদের কঠোর রক্ষণশীল অন্তঃপুরে এসে সমস্ত নিজস্বতা হারিয়েছেন। অনেক বলা-কওয়ার পর মেয়েকে তিনি মাঝে মাঝে কবিতা শোনানোর সাহস দেখাতেন, কিন্তু গান জানা সত্ত্বে গাইবার সাহস দেখাতে পারেননি। ছবির তখনই জানা হয়ে যায়, বউদের নাকি গান গাইতে নেই।[৫]

বঙ্গীয় অঞ্চলে নারীবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়াও (১৮৮০-১৯৩২) ছিলেন ঔপন্যাসিক। বিদ্রোহী অনেক কর্মকাণ্ডের সাথে, নারীবাদী প্রবন্ধ-নিবন্ধের সাথে তার উপন্যাস প্রচেষ্টা *পদ্মরাগ* (১৯২৪) স্মরণীয়। মধ্যবর্তীকালে আমরা আরও যেসব সাহিত্যিক পেয়েছি তাঁদের মধ্যে শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪) বিশেষ মনোযোগ এজন্য দাবি করতে পারেন যে তাঁর উপন্যাসে নারীর বিদ্রোহ না থাকলেও অন্তত নারী নির্যাতন সুচিহ্নিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর উপন্যাস *জন্ম-অপরাধী* উল্লেখযোগ্য। তবে মানুষ হওয়ার চেতনায় নারীর বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ বোধকরি সুলেখা সান্যালের *নবাঙ্কুর* উপন্যাসেই লক্ষিত হয়। তসলিমা নাসরিনের *আমার মেয়েবেলা* বা আকিমুন রহামানের *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছিতে* (১৯৯৯) নারী তার ব্যক্তিগত যৌন অভিজ্ঞতায়ও চিত্রিত; অর্ধশতাব্দী পূর্বে রচিত *নবাঙ্কুর*-এর সুলেখা সান্যাল সে চিত্রণ এড়িয়ে গেলেও তাঁর ছবির বিদ্রোহ একালের যে কোন বাঙালিকে উৎসুক করবে সন্দেহ নাই।

বিষয়গত প্রশ্নে *নবাঙ্কুর*-এর প্রাধান্য অনস্বীকার্য যদিও সংহতি বিবেচনায় *দেওয়াল পদ্ম* অনেকের কাছেই বেশি মর্যাদার দাবিদার। *দেওয়াল-পদ্ম* অসীমা-সঞ্জয়ের কথা। শুরুতে প্রায় শত্রুভাবাপন্ন এমন দুজন মানুষকে সুলেখা সান্যাল তাঁর উপন্যাসে কাছাকাছি এনেছেন সুকৌশলে, পাঠকের মনে যাতে কোন দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি না করে। না হলে মননের প্রশ্নে এ দুজন মানুষের নৈকট্য এমন অবশ্যম্ভাবী হবেই বা কেন। অথচ বিস্ময়ের যে সঞ্জয় হল অসীমার মৃত ছোট বোন অণিমার স্বামী।



www.pathagar.com

শুরুতে গোয়েন্দা-কাহিনীর ছাপ যেন। মধ্যপ্রদেশে হাসপাতালের ডাক্তার অসীমা তার মার পত্রে অনুরোধ পেল বাড়ি ফেরার পথে মৃত অণিমার শিশু সন্তান দুটিকে দেখে যাওয়ার। অণিমার বাবা-মা-দাদারা সবাই এমন বিশ্বাস স্থির যে অণিমার শ্বশুর বাড়ির মানুষেরা তাকে হত্যা করেছে বা সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। তাদের ভাবনা দৃঢ়তর হয়েছে কেননা দাদারা ওদের বাড়িতে গেলে যথেষ্ট সমাদর পায় নি। এ সব প্রেক্ষিতেই অসীমাকে বৃদ্ধা মাতার অনুরোধ : পারলে যেন সে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে যায়, না নিতে পারলে অসীমার কাছ থেকে তো ওদের সম্পর্কে কিছু জানা-শোনা যাবে।

এমন একটি আবর্তের ভেতের *দেওয়াল-পদ্ম*-র কাহিনী শুরু। এবং অসীমার সে বাড়িতে পৌঁছানো পর্যন্ত অণিমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনের রূঢ়তাই বেশি স্পষ্ট। যদিও ক্রমে পর্দা সড়তে থাকলে বোঝা যায় সে-পরিবারটি আসলে মাটি-ঘেঁষা— মাটির সাথে জীবন-যাপনই তাদর নিমিত্ত যা পরিবারটির সবকটি মানুষকে যুগপত সরলতা এবং ঔদার্য দিয়েছে। পারিবারিক এ পরিচয়টি সঞ্জয়ের মা-বাবা-ছোটভাই বিজয় সবার ভেতর দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। এবং সামগ্রিক এ প্রতিবেশ অসীমার নিজের দুয়ারটি খুলতে ভূমিকা রাখে ভীষণ—উন্মোচিত হয় অশোকের সাথে তার ব্যর্থতার কথা যার পরিণতিতে পঁয়ত্রিশ বছরেও সিঁদুরবিহীন অসীমা।

অসীমা-অশোক ডাক্তারী পড়ার কাল থেকেই বন্ধু। পড়া শেষ হতেই অশোককে ওর বাবা পাঠিয়ে দিল বিলেত—অসীমা রয়ে গেল দেশে। বছর পার হতেই ও নিজে জাহাজে চাপল। বিলেতে নেমে আবিষ্কার করল অন্যমনস্ক এক অশোককে। ফ্লাটে যেয়ে পেল ওর গার্লফ্রেন্ড লরাকে। আর এভাবেই শেষ হয়ে গেল অসীমা-অশোক সম্পর্ক। কষ্ট করে ফিরে যখন এল, অণিমার ততদিনে বিয়ে হয়ে গেছে। অসীমার এ গল্পের ভেতর সুলেখা সান্যালের আত্মজৈবনিক উপাদান হয়তো কেউ কেউ খুঁজবেন, তবে উপন্যাসটিতে এ আখ্যানের গুরুত্ব অনেক। অসীমার এ কাহিনী তার ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধকে যেমন সমুন্নত করেছে, তেমনি সঞ্জয়-অণিমার কাহিনী উন্মোচনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

অসীমার বোন অণিমা ছিল ভারি সুন্দর। কম লেখাপড়া জানা, একটু অহঙ্কারী, একটু একটু ঝগড়াটে আর স্বার্থপর। 'অণিমা তার রূপের দাম পেয়েছিল'। সঞ্জয়ের বাবা তাকে দেখেই পছন্দ করে, তারপর সঞ্জয়ের সাথে বিয়ে হয় ওর। ভালবাসা হল, দুটি সন্তানও হল, কিন্তু যা হল না তা হল সঞ্জয়দের মানসিকতার সাথে একাত্মতা। তার ধারণা ওরা অণিমাকে ঠকিয়েছে— পাঁচশো বিঘে জমির ফার্মে ডায়নামো বসিয়ে ইলেকট্রিসিটি আনবে, ট্রাকটর চালাবে ইত্যাদি বলে। আর এভাবেই ক্রমশঃ অণিমার মন ভাঙতে থাকত দ্রুত। তেমনি এক সময় পূর্ববঙ্গের কলেজ বন্ধু সমীর ওদের বাড়ি। সমীর এখন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ করছে। এত বেশি ঘনিষ্ট হল সে যে আসাটা ঘটল বার কয়েক। তারপর সবশেষে একবার অণিমা-সঞ্জয় দুজনে মিলে সমীরকে সাথে নিয়ে বেড়াতে গেল শহরে। একদিন সমীর অণিমা বাইরে যেয়ে আর ফিরে এল না। উদ্‌ভ্রান্ত সঞ্জয় ফিরে এল



www.pathagar.com

নিজ গাঁয়ে। কৃষাণী মা গভীর মমতায় আঁকড়ে ধরলেন ছেলেকে। ক্রমে ক্রমে নিজ সন্তান টুকু-সোনার প্রিয় বাবা হয়ে নিজেকে যোগ্যতর করে তুলল সঞ্জয়। মানুষ জানল ও বাড়ির বৌ অণিমা আত্মহত্যা করেছে।

উপন্যাস শেষ হয়েছে প্রতীকী এক ব্যঞ্জনা দিয়ে। প্রথম দিন বিকেলেই সঞ্জয় অসীমাকে নিয়ে গিয়েছিল গ্রামের প্রাচীন মন্দিরটিতে যার গায়ে হয়েছে দেওয়াল পদ্ম। বিদায়কালে দেখা গেল সঞ্জয় অসীমার জন্য নিয়ে এসেছে ঐ পদ্মের এক শিকর-সুতো। যদিও লোকে বলে এ পদ্ম নাকি যেখানে সেখানে হয় না তবু সঞ্জয়ের ইচ্ছা অসীমা চেষ্টা করে দেখুক। কিন্তু বাসটা ছাড়লে দেখা গেল শেকড়টা হারিয়ে গেছে, আলগা একটু মাটি মাত্র রয়ে গেছে অসীমার হাতে। যে শিকড় অণিমা হারিয়ে গেছে, সেই শেকড়ের মাটি সঞ্জয় বা তার পরিবারকে আঁকড়ে থাকার যে কোন অর্থই হয় না লেখিকা হয়তো তেমনটিই বোঝাতে চেয়েছেন। *দেওয়াল-পদ্ম*-র প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> সঞ্জয় সেই যে শেকড়, দেওয়াল পদ্মের শেকড় হাতে দেয় অসীমার—ঝড়ের পর অন্ধকারে সঞ্জয় আর নটবর নিয়ে এসেছে। সব জায়গায় এ ফুল হয় না দেখাই যাক না পরীক্ষা করে। অসীমা কান্নাকে সামলায়। কিন্তু শেকড়টাই কই আসনে কেবল আর মাটিটুকু। মাটিটা বোধহয় শেকড়ের সঙ্গেই মেশেনি। মাটিটা অসীমা হাতে তুলে নিল, তারপর বাইরে ফেলে দিল—ও ফুল তো যেখানে-সেখানে ফোটে না। আঙুলের মাটির দাগটা লেগেই রইল, তারপর সেটাও মিলিয়ে গেল। আমাদের তো ঐ মাটিকে শেকড়ের সঙ্গে লাগাতেই হবে—নচেৎ মরবে গ্রাম, বাঁচবে না শহরতলী, শহর। অসীমা বাসের চলন্ত গতিতে ফিরছে—এ কি আগেকার অসীমা![৬]

দেওয়াল-পথ নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে উপন্যাসটির আত্মজৈবনিক উপাদান বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করতে চাই। অসীমা-অশোক উপাখ্যানের সাথে সুলেখা সান্যালের ব্যক্তিজীবনের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ১৯৪৮ সালে বিশ বছর বয়সে সুলেখা বিয়ে করেছিলেন রাজনৈতিক সহকর্মী, বড়দার বন্ধু চিত্ত বিশ্বাসকে। কলকাতায় সংসার গড়েছিলেন তাঁরা, সন্তানও হয়েছিল; যদিও ভূমিষ্ট হয়েছিল মৃত সন্তান। অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণেই তারা তাঁদের বাসার বাইরের অংশটা ভাড়া দিয়েছিলেন *পরিচয়* পত্রিকার অফিসের জন্য। তখন পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন বাংলা সাহিত্যের আর একজন শক্তিমান কিন্তু বিস্মৃত কথাকার ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯৯৬)।

চিত্তবাবুর সাথে জীবন মেলাতে সুলেখা বোধ হয় বিপন্ন বোধ করছিলেন যা একসময় বৌদ্ধিকভাবে কাছাকাছি ননী ভৌমিকের দিকে সুলেখাকে *ঠেলে* দেয়। গল্পগ্রন্থ *ধানকানা* (১৯৫৩) এবং উপন্যাস *ধুলোমাটি* (১৯৫৬) খ্যাত ননী ভৌমিক মস্কোর প্রগতি প্রকাশনে অনুবাদকের চাকরি নিয়ে চলে যান ১৯৫৫ সালে। একই বছর চিত্ত বাবুর সাথে সুলেখা সান্যালের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৫৭ তে তাঁর শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়লে ১৯৫৮-র জুনে সুলেখা মস্কো যান চিকিৎসার জন্য। সেখানে ননী ভৌমিক তাঁকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে যান এবং পরে ননী ভৌমিকের ফ্লাটে রূপবতী কারমেলার সাক্ষাৎ ঘটে। এ সবের পরিণতিতেই আহত সুলেখা দেশে ফিরে আসেন ১৯৫৯-এর মার্চে।



www.pathagar.com

মাত্র দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন অকাল প্রয়াত এই লেখিকা। অথচ দুটিতেই তাঁর দার্ঢ্য সুস্পষ্ট। ব্যক্তিজীবনের উপাদানকে উপন্যাসের প্লট করতে সংকোচ করেন নি তিনি। রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততার কারণেই সুলেখা সান্যালের কথাসাহিত্য গভীর জীবনবোধের শিল্পিত পরিচায়ক হতে পেরেছে। পূর্বসূরি বা সমসাময়িক অধিকাংশ মহিলা কথাকারদের মত তাঁর রচনা ঘরকন্যার বিবরণে পরিণত হয় নি।

এবার আসছি সুলেখা সান্যালের ছোটগল্প প্রসঙ্গে। একমাত্র সংকলন *সিঁদূরে মেঘ* এ অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো ছাড়াও তাঁর যে সব গল্পের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলো হলো : 'অন্তরায়', 'কীট', 'সংঘাত', 'বিবর্তন', 'ছেলেটা', 'একটি মামুটি গল্প', 'উলুখড়', 'কিশোরী', 'পরস্পর', 'খোলাচিঠি', 'শকথেরাপী'। এছাড়া পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর অন্যান্য গল্পগুলো মধ্যে রয়েছে : 'পঙ্কতিলক', 'মামণি', 'লঘুমেঘ', 'পাষণ্ড', 'প্রতীক', 'যে গল্পের শেষ নেই', 'শেষ সন্ধ্যা', 'ঘেণ্না', 'লজ্জাহর', 'ফাটল', 'রূপ', 'ভাঙাঘরের কাব্য' ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালে তাঁর 'সিঁদূরে মেঘ', গল্পটির চলচ্চিত্রায়ণ হয়। তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তব ঘনিষ্ঠতা। প্রতিটি গল্পেই জীবনের সন্নিষ্ট চিত্রকে সুলেখা ভাষা দিতে চেয়েছেন। চল্লিশ পঞ্চাশের যে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময় তা সুলেখার গল্পাবলীতে মূর্ত। সুজাতা সান্যালের ভাবনা :

> সুলেখা সান্যালের চোটগল্পগুলিকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্ব 'সিঁদূরে মেঘ' এবং অন্যান্য গল্প যেগুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছে দাঙ্গা, দেশবাগ ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সৃষ্টি। দ্বিতীয় পর্বে আমরা রাখতে পারি তাঁর ব্যক্তিগতজীবনের একান্ত যন্ত্রণাদগ্ধ কাহিনীর প্রতিচ্ছবির গল্পগুলি। তৃতীয় পর্বে একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র, যা লেখিকার বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা প্রকাশ করে।[৭]

তাঁর অনেক গল্পের মূল প্রতিপাদ্য দেশবিভাগ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ধর্ম ভিত্তিতে যে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশের জন্ম হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকেও এমন লাখ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বী চলে যান ভারতে। রাজনীতির কারণে হঠাৎ করে এমন নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষ বারবারই কঠিন বাস্তবতায় সুলেখার গল্পে উপস্থিত। নিজের ব্যক্তি জীবনে আরও বহু জনের মত সুলেখা সান্যাল নিজেও যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা তাঁর এক বিরাট সংখ্যক গল্পের প্রধান উপজীব্য।

'ফল্গু', 'জন্মাষ্টমী', 'গাজন-সন্ন্যাসী' গল্পগুলো দেশ বিভাগ নিয়ে রচিত সুলেখার প্রধান রচনা। 'অন্তরায়' ও 'বিবর্তন' যার বিষয়বস্তুও একই— নির্মম দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন। মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা বাঙালির জীবনে এ ঘটনার অভিঘাত ছিল সুদূর প্রসারী। 'ফল্গু' তে তাই দেখা যায় মহেশ্বরীকে যে কিনা অবিনাশের পিসিমা। কোলকাতা থেকে বেড়াতে আসা অবিনাশের স্ত্রী বরুনা যখন মহেশ্বরীর কাছে কোলকাতা চলে যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলে তখন তার এক কথা 'ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়ে এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় গিয়েছিলাম—আর চৌদ্দ বছরে মেয়ে কেলে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছিলাম এ বাড়িতে— এই আমার জীবনের জায়গা বদল। কোথায় যাব! এখানকার মাটি আঁকড়ে থাকবো শেষ



www.pathagar.com

দিন পর্যন্ত।' অসহায় বৃদ্ধার মর্মবিদায়ক ও গভীর এ অভিপ্রায় 'ফল্গু'কে সজীবতা দিয়েছে। অথচ এ পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমান নৈকট্যের ব্যাপারটিও লেখিকার দৃষ্টি এড়ায় নি। মতি যে মুসলমান তাই ও চৌধুরী বাড়িতে প্রবেশযোগ্য নয়। সে-মতিকে অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে আসে বরুনা। বরুনা সকল জাতের মানুষ নিয়ে পিকনিক করে, গল্প করে, একসাথে খায়। বরুনার সকল কর্মকাণ্ড বুড়ির কাছে উপস্থিত 'জাত বিচার না—হিন্দু মুসলমান না, দেশ ভাগাভাগি না' এই গভীর সত্য নিয়ে। 'জন্মাষ্টমী' এবং 'গাজন-সন্ন্যাসী' উভয়েই ভারত নামের দেশটিতে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু হিন্দুদের নিয়ে রচিত। 'গাজন-সন্ন্যাসীর'র পশুপতি তো তেভাগার বিক্ষত সৈনিক। ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এ গল্পের পশুপতি যখন জেলে যায় তখন তার বাবা কাশীনাথই পুত্রবধু ও নাতিকে নিয়ে হয়েছিল দেশান্তরী। দেশছাড়া ঘরছাড়া এ মানুষগুলো সম্পর্কে কাশীনাথের বিবরণ 'সাতশোজন মানুষ আইছিলাম আমরা, তার পঞ্চাশ পঞ্চান্নজন মরিছে গরমে, পঞ্চাশ-ষাটজন মরিছে আমাশায়। জমি যেতি দেছে গরমেন্ট যে, সে তো জমি না পাথর। জল নাই এ দেশে, ফসল তুমি ফলাবা কেমন করে। একখান করে মাটির খুপরি, তারে দুই ভাগ করে দু'টো পরিবার থাকতি হবি।' এই যে নির্মমতা তাতেই এক সময় এসে হাজির হয় পশুপতি। সে আবার মানুষ খ্যাপাবে এমন আশঙ্কা তার স্ত্রী মানদা প্রকাশ করলে পশুপতির ক্ষুব্ধ ও মর্মন্তুদ উত্তর 'আদালত আমাগারে ছাড়েৎ দেছে কোন প্রমাণ না পায়ে, নিজের দ্যাশের থে শত্রুতা করে বার করে দেছে। তুইও কি তাড়ায়ে দিতি চাস আমারে'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিধ্বস্ত কোলকাতার চিত্রও প্রাণস্পর্শীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সুলেখা সান্যালের কয়েকটি গল্পে। 'সিঁদূরে মেঘ' এ বিষয়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রধান গল্পগুলোর অন্যতম। অনন্ত এবং মালতীর দাম্পত্য জীবনকে নিয়ে গড়া এ গল্পে সে সময় কালের সর্বস্বশূন্য কলকাতাবাসীর চিত্রই ফুটে উঠেছে। অনন্ত বা মালতী কেউই একটি সুখী দাম্পত্যে পৌঁছতে পারে না তাদের অ-প্রকাশিত অতীতের জন্য—যদিও তারা জানে না তাদের পরস্পরের এ অতীত। দুঃসময়ের কালে মালতীকেও যে এক সাহেবের অফিসে চাকরি নিতে হয়েছিল তা নিয়ে মালতীর অনুশোচনার শেষ নেই। পেটের দাবির কাছে নিরুপায় মালতীকে সে সময় আরও অনেক মধ্যবিত্ত মেয়ের মতই ত্যাগ করতে হয়েছে সকল সম্ভ্রম, অন্যদিকে অনন্তও তো বোঝে নি নিজের স্ত্রীকেই তুলে দিতে হবে সাহেবদের হাতে যার পরিণতিতেই স্ত্রী ললিতা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওরা দুজনেই তো এমন সময়ের সন্তান যখন হাসপাতাল উঠে গিয়ে মিলিটারী ব্যারাক হয়েছে সৈন্যদের সাথে ঘুরে বেড়ানো মেয়েরা তখন ছেঁড়া জুতোর মত পরিত্যক্ত। আর তাই তো শেষে স্বামীর ভাবনা 'আমরা দুজনেই ঘরপোড়া গোরু, তাই তো সিঁদুরে মেঘ দেখে মুখ শুকোয়'।

দুঃসহ অর্থনীতির এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুলেখার অন্যান্য গল্পগুলো হলো : 'জীবনায়ন', 'খেলনা', 'বিবর্তন', প্রভৃতি। মধ্যবিত্তের সামাজিক অবস্থার এ করুণ চিত্র সুলেখা সান্যালের এক জীবন্ত সৃষ্টি। সে এক এমন সময় যখন সীমা-আনন্দ তাদের



www.pathagar.com

সম্ভাব্য সন্তানের আগমনের সংবাদে কি খেয়ে বাঁচবে এই চিন্তাতে এম আর পর্যন্ত ভেবে ফেলে (জীবনায়ন), অথবা সামান্য অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই বলে নমিতা আর প্রবীর পরস্পরকে ভালবাসার পরও দাম্পত্যে পৌছাতে পারল না (খেলনা), অথবা অভয় তার অসুস্থ স্ত্রী কনিকার জন্য আলো-বাতাস ভরা একটা বাসা ভাড়া নেয় যার ভাড়া তার নিজ আয়ের সমান এবং সেখানে খাওয়ার জন্য আর কোন টাকা উদ্বৃত্ত নেই (বিবর্তন)।

সুলেখা সান্যালের গল্প নিয়ে বর্তমান আলোচনাটি শেষ করতে চাই তাঁর 'উলুখড়' দিয়ে। ১৯৬৭তে পত্রিকায় প্রকাশিত এ গল্পটি এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তাঁর সকল গল্পের মধ্যে দীর্ঘতম—সাধারণ বইয়ের পৃষ্ঠায় সাইত্রিশ পৃষ্ঠা। কথক ব্রজেন এ গল্পের প্রধান চরিত্র না হলেও তারও রয়েছে এক বিশেষ গুরুত্ব। প্রধান যারা চরিত্র তারা হলো দেবাশিস্ আর অনুপমা। শশাঙ্কর স্ত্রী অনুপমা আর দেবাশিস্ কলেজ পড়াকালে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো দেবাশিস্ বিলেত থেকে ফিরতেই অনুপমার সাথে তার বিয়ে হবে। আর সেই আশ্বাসমতই শশাঙ্কের সংসার ছেড়ে স্বপ্নের জগতে পা ফেললো অনুপমা। তার এই কাজের জন্য তার পরিবার তাকে করলো ত্যাগ। অনুপমা হয়ে পড়লো একাকী, নিঃসঙ্গ। চাকরীও গেল তার। হতাশ ক্লান্ত অনুপমা আক্রান্ত হলো জটিল রোগে। কিন্তু প্রত্যাশা দেবাশিস্ তাকে নিয়ে যাবে বিলেতে, রোগ মুক্তি ঘটবে তার। কিন্তু তার সে প্রত্যাশার পূরণ ঘটে নি। কেননা দেবাশিস্ তো ইতোমধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অন্য এক মেম মেয়েকে নিয়ে। রোগ শোকের চূড়ান্ত পর্যায়ে অনুপমা অন্ধ হয়ে যায় পুরোপুরি। কিন্তু তার মৃত্যুর পূর্বে দেবাশিস্ আসার ব্যাপারে তার প্রত্যাশার মিথ্যা পূরণ ব্রজেন ঘটিয়েছিল। বিদেশ ফেরত একজনকে দেবাশিস্ হিসাবে উপস্থাপন করেছিল অনুপমার সামনে। 'উলুখড়' মানুষের মিথ্যে ও সত্যি ভালবাসার গল্প। সুলেখা সান্যালের ব্যক্তিগত জীবনে স্পর্শও 'উলুঘড়' গল্পে দুর্লক্ষ্য নয়।

সবশেষে সুলেখা সান্যালের শেষ জীবন নিয়ে তাঁর অনুজা সুজাতা সান্যালের (চট্টোপাধ্যায়) বক্তব্য উদ্ধার করছি। তিনি লিখেছেন :

> ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি যেন জীবনকে ছেনে ছেনে নতুন নতুন মূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। জীবনের কাছ থেকে পাওয়া তিক্ততা, বিশ্বাসহীনতা, নিঃসঙ্গতা তাঁকে ঠেলে দিয়েছে অদ্ভুত এক নৈর্ব্যক্তিক শূন্যতাবোধের মধ্যে...। এই সময় আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পাই। নারীজীবনে ব্যর্থতা, সবকিছু পাবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও না পাবার যন্ত্রণা, অবসিত যৌবনের হতাশা, রোগের দুঃসহ ক্লেশ— সবকিছু রেখে গেছেন তাঁর এই সময়ের লেখার মধ্যে।

গভীর পাঠে স্পষ্ট হয় নারী কথাসাহিত্যিক হিসেবে সুলেখা বেছে নিয়েছিলেন একটি ভিন্ন জগত। সমসাময়িক পুরুষ কথাকারদের তুলনাতেও তাঁর কলম অগ্রণী ছিল এমনটি বললে ভুল বলা হয় না।



www.pathagar.com

তথ্যসূত্র :


১. সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়) রচিত বড়দিদি সুলেখা সান্যালের জীবনী, *সুলেখা সান্যালের গল্পসংগ্রহ*, তারুণ্য প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

২. তরুণ সান্যাল, 'জীবনের চেয়ে বড় যে জীবন,' *কথারূপ*, সম্পা. গৌতম অধিকারী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১০

৩. www. hinduonnet. com/themindu/1r/2002/06/02

৪. www. 2.cddc. vt. edu/mtm/six.htm

৫. বিশ্ববন্দু ভট্টাচার্য, 'নবাঙ্কুর : নিজের হয়ে ওঠার উপন্যাস,' *কথারূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

৬. পার্থপ্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেওয়াল-পদ্ম : দ্বিমাত্রিক সংলাপ,' *কথারূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৭. সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়), 'বিষাদিত আনন্দ,' *কথারূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

৮. সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়) রচিত বড়দিদি সুলেখা সান্যালের জীবনী, প্রাগুক্ত



প্রবন্ধটির প্রথম খসড়া 'বিস্মৃত নারীবাদী উপন্যাস *নবাঙ্কুর*' প্রকাশিত হয় দৈনিক *সংবাদ* সাময়িকীতে ১৫ জুন ২০০৪।





www.pathagar.com

# আহমদ ছফার *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী*

> 'আমার কোন ধন-সম্পদ নেই। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আমার কিছুই নেই। যে সজীব বন্ধন একজন মানুষকে নানা কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে রাখে, আমার ভাগ্য এমন ফর্সা যে সেসব কিছুই আমার জোটে নি। অতীত দিনের অর্জন বলতে আমার জীবনে যেসব নারী এসেছিলো, যারা আমাকে কাঁদিয়েছে, হাসিয়েছে, দাগা দিয়েছে, যারা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, সেই দুঃখ-সুখের স্মৃতি চক্রটুকুই শুধু আমার একমাত্র অর্জন।' (পৃ. ১১)।

আর সে অর্জনের শব্দরূপই আমহদ ছফার উপন্যাস *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী*। সাহিত্য মানেই জীবনের উপলব্ধির প্রকাশ। লেখকের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং অনুভব সাহিত্যের প্রধান আধেয়। আর তাই যে কোনো সাহিত্য কর্মকেই আত্মজৈবনিক আখ্যা দেয়া চলে। যদিও সেগুলোর কোনো কোনোটিতে অনেক বেশি করে ব্যক্তি লেখককে মূর্ত দেখা যায়। রুশ ঔপন্যাসিক লিয়েফ তলস্তোয়ের *রিজারেকশান*-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র নিখলাইদভ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরার* গোরা লেখক-চরিত্রের চরিত্রায়ণ কিনা অথবা জেমস জয়েসের *পোর্ট্রেট অব অ্যান আর্টিস্ট আজ এ ইয়ং ম্যান*-এ ব্যক্তি-জয়েস কতখানি উদ্ভাসিত সে প্রশ্নতো উঠতেই পারে। তবে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে বোধ হয় লেখকের ব্যক্তিগত 'হয়ে ওঠা'র গুরুত্ব অনেক বেশি। সে প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত* বা ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের *ডেভিড কপারফিল্ড*-এর কথা পাঠকের মনে আসবে নিশ্চয়ই। অথচ লেখকের শুধুমাত্র প্রেমজ-সত্তার বিকাশ ও বিবর্তন নিয়ে আহমদ ছফার এ নির্মাণ। দু'খণ্ডে সমাপ্তব্য এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড এটি, যাতে উঠে এসেছে উপন্যাসের বক্তা জাহিদ হাসান যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক-ছাত্র ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনে দু'জন ভিন্ন চরিত্রের নারীর অবস্থিতি বিষয়ক ঘটনাবলী। দুরদানা ও শামারোখ ছাড়াও উপন্যাসের আরও একজন শক্তিমান নারী চরিত্র উপস্থিত যার নাম সোহিনী, যে-সোহিনী সম্পর্কে জাহিদের বক্তব্য 'তুমি আমার কাছে অর্ধেক আনন্দ, অর্ধেক বেদনা। অর্ধেক কষ্ট, অর্ধেক কষ্ট, অর্ধেক সুখ, অর্ধেক নারী, অর্ধে ঈশ্বরী।' সেই সোহিনীর কাছে জাহিদ ব্যক্তি জীবনে সেসব নারীদের সম্পর্কে লিখে জানাচ্ছেন যারা তার মনের মধ্যে প্রেমের উপলব্ধি ঘটিয়েছে, তাঁকে অমতৃলোকের যাত্রী করেছে। উপন্যাসের শুরুর প্রথম সাত পৃষ্ঠা মত সেই সোহিনীকে নিয়ে লেখা; যদিও অনুমান করা যায় উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ডে নিশ্চয়ই আমরা জাহিদ সোহিনী কাহিনীর বয়ান পাব। *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী* বলে জাহিদ শুধুমাত্র সোহিনীকে সম্ভাষণ জানালেও আমাদের বুঝতে বাকি



www.pathagar.com

থাকে না জাহিদের জীবনের সেসব রমণীদের সকলেরই তাঁর কাছে অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী মিলে একটা পূর্ণরূপ।

জাহিদের গল্পের প্রথম সে-নারীর নাম দুরদানা। একাত্তর সালে কোলকাতায় স্মৃতিকণা চৌধুরীর কাছ থেকে জাহিদ তার সম্পর্কে জানতে পারেন। শার্ট-প্যান্ট পরিহিতা, ধূমপায়ী, সাইকেল-চালক দুরদানার সাথে জাহিদের পরিচয় ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে যেখানে জাহিদ থাকতেন সেখানে দুরদানার প্রথম আগমনেই বাঁধে গোলমাল। মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ থাকায় দারোয়ান হাফিজ তাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। পরে দুরদানা ছুরি দেখিয়ে ঝট্‌কা টানে দারোয়ানকে ফেলে দিয়ে হলে ঢোকে। প্রথমত মহিলা তারপর এরকম দুর্দান্ত স্বভাবের কোনো নারীর সাথে মেলামেশার ব্যাপারটি জাহিদের অনেক প্রিয় শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকই শুধু নন তার বন্ধু–বান্ধবরাও মেনে নিতে পারেন নি। অথচ যতই দিন যাচ্ছিল জাহিদ তত বেশি করেই দুরদানার 'প্রাণশক্তির সব অঙ্কুরণ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। দুরদানার বাহিরিক পোশাক এবং আচরণ নিয়ে চারপাশের লোকজনের কটূক্তি এবং উষ্মা জাহিদকে দুরদানার সঙ্গ থেকে সরিয়ে নিতে পারে নি। দুরদানার জন্য জাহিদকে এমনকি শারীরিক নিরাপত্তাগত সমস্যাতেও পড়তে হয়েছে। তাছাড়া আরও একটা সমস্যা ছিল। দুরদানার ভাই ইউনুস জোয়ারদার চরমপন্থী রাজনীতি করতেন। সেই সুবাদেও অনেকেই জাহিদকে ইউনুসের দলের সাথে সম্পৃক্ত বলে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করে। সরকারি দলের খড়গ মাথায় ছিল ইউনুসের; সেই খড়গের খানিকটা ইউনুসের বোনের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে জাহিদেরও প্রাপ্য হয়ে ওঠে। পাগলা জগলুল, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, দুরদানার বন্ধু কল্পনা আখতার লুলু প্রমুখ বহুজনের রোষের মধ্যেও জাহিদ দুরদানাকে ত্যাগ করেন নি। দুরদানার সাইকেলের পেছনে চড়ার জন্যে দুষ্ট যুবকরা তাকে পিটিয়েছে, রাস্তায় উলঙ্গ করেছে। খানেখানানের কাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে তাকে আক্রমণের শিকার পর্যন্ত হতে হয়েছে; যদিও সেদিন সুকৌশলে তারা বাড়ির পেছন দিককার দড়জা খুলে পালিয়ে এলাকার মাস্তানদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। আর সেদিনকারও ঘটনার ফলেই *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী* উপন্যাসের পাঠক সবচেয়ে মোহনীয়, প্রীতিকর দৃশ্যটি পাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। মাত্র এক পৃষ্ঠার এ বর্ণনাতে বৃষ্টির সে রাতে দুরদানাকে নিয়ে জাহিদ রওনা দেয়। নির্জন পারিপার্শ্বের এ সময়ে এ দু'জন মানুষ শারীরিকভাবে অনেকখানি কাছাকাছি চলে আসেন। তারা পরস্পরকে চুম্বন করেন। জাহিদ হাত রাখেন দুরদানার স্তনে। এ ঘটনার কাব্যিক বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে যে কোনো পাঠকের দীর্ঘদিন মনে থাকবে। যদিও সে সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে যা জাহিদ ও দুরদানাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। রিকশাতে দুরদদানা জানায় তার পিরিয়ড শুরু হয়েছে। এতে জাহিদের ভাবনা হয়, '... অ-মেয়েমানুষ দুরদানা এতোদিন আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। তার মেয়েমানুষী পরিচয় বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভেতরে ভেতরে একরকম শংকিত হয়ে উঠলাম একে নিয়ে আমি কী করবো? একে তো



www.pathagar.com

কোনোদিন ভালবাসাতে পারবো না' (পৃ. ৮)। তারপর রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাদির কারণে এক সময় দুরদানা আত্মগোপন করে। জাহিদের ভাষায়, 'মহাকালের খাঁড়ার আঘাতে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।'

*অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরীর* জাহিদের জীবনের দ্বিতীয় রমণী শামারোখ। দুরদানার কাহিনীর—চল্লিশ পৃষ্ঠা, যদিও বরং ছত্রিশ পৃষ্ঠাই আসলে–তুলনায় শামারোখের কাহিনী বিস্তার অনেক—একশ' পৃষ্ঠা ছাড়িয়েছে। শামারোখ কাহিনীর নারী নক্ষত্র আগাপাশতলা এতে ঢুকেছে বলেই এর আপাত পরিধি এত বেড়েছে। কেননা, দুরদানাও তো জাহিদের জীবনে কম নয়। হয়তো বেশিই—কেননা, শামারোখ সম্পর্কে এত সুউচ্চ অভিমত জাহিদ সরাসরি ব্যক্ত না করলেও দুরদানা প্রসঙ্গে সোহিনীকে লেখা জাহিদের বক্তব্য থেকে আমরা পাই, '... দুরদানার কাছে আমার ঋণের পরিমাণ সামান্য নয়। তার স্পর্শেই আমি ইতিহাসের মধ্যে জেগে উঠতে পেরেছি। ... এই যে আমি তোমার অভিমুখে যাচ্ছি দুরদানা হচ্ছে তার প্রথম মাইলফলক।' আর শ্যামরোখ? জাহিদের ভাষায়, '...নীতিবাগীশেরা শামারোখের জীবনের অতীত বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করে নানান দাগে দাগী হিসেবে তাকে চিহ্নিত করবে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি যখন তাকে প্রথম দেখি, আমার মনে হয়েছিলো, সৃষ্টির প্রথম নারীর সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান হয়েছি। এই অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করিয়ে নিতে পারে। তার একটি কটাক্ষে আমি মানবসমাজের বিধিবিধান লংঘন করতে পারি। তার নির্দেশে সমস্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে ঈশ্বরের অভিশাপ মস্তকে ধারণ করতে পারি' (পৃ. ৪৩)। আর এভাবেই শামারোখের কাহিনীর ভেতর পাঠকের অগ্রসরণ শুরু হয়।

জাহিদ শামারোখকে চিনতে না; কিন্তু শামারোখের উপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শুধুমাত্র সে সুন্দরী বলেই, একটা অবিচার করতে যাচ্ছে এটা সে বুঝতে পারে এবং দৃঢ়সংকল্প হয় তা প্রতিরোধের।

স্কলারশিপের টাকা যার জীবননির্বাহের একমাত্র উপায় সেই জাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঘা বাঘা অধ্যাপকদের ক্ষেপানোর পরিণতি জেনেও পিছপা হন নি তার কাজ থেকে। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সে কাজে তিনি সফলও হন। কিন্তু ততদিনে ব্যক্তিগত এক সম্পর্ক নির্মাণ হয়ে গেছে শামারোখ এবং জাহিদের মধ্যে। জাহিদের দার্ঢ্যতায় শামারোখ হয়ে পড়েছে তার প্রতি আকৃষ্ট, আর শামারোখের কাব্যপ্রতিভা, তার অপার সৌন্দর্য জাহিদকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে নিবিড় নীলিমায়। অথচ সেই শামারোখের শেষ দিককার আচরণ কত কূট, কত অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল যা জাহিদের সৌন্দর্যবোধকে, ভালবাসার স্মৃতিকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত। তবে একটা জিনিস মানতেই হয় *অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী* উপন্যাসের শুরুটা তত ভাল লাগে না। মনে হয় কপট একটা প্লট নির্মাণের চেষ্টা চলছে। সোহিনীর নাম নিয়ে এত কথার যৌক্তিকতাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কথক-জাহিদের সাথে কি সোহিনীর বর্তমানে গভীর প্রেম সম্পর্ক বিরাজমান? তা স্পষ্ট না হওয়ায় খুঁতখুঁতে ভাবটি পাঠকের কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে দুরদানা বিষয়ক



www.pathagar.com

কাহিনীর শুরু পঞ্চম লাইনে বলা হলো 'আজ থেকে তিরিশ বছর আগে'—তাহলে তো ঘটনার সময়কাল ১৯৬৫ সালের কাছাকাছি হয়। দুরদানার বয়স তখন কি 'উনিশ' ছিল নাকি মুক্তিযুদ্ধ-উত্তরকালে যখন জাহিদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে তখন। তাছাড়া দুরদানা কাহিনীর শেষে এসে একচল্লিশ পৃষ্ঠায় ইউনুস জোয়ারদারের হত্যাকাণ্ডের সাথে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ না করলেই বোধহয় ভাল হতো। যেমনভাবে শামারোখের কাহিনীর শেষ পর্যায়ে শাহরিয়ারের ঘটনা অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এসে ঢুকে পড়েছে।

দৈনিক *বাংলাবাজার পত্রিকা*-র সাময়িকীতে ৫ এপ্রিল ১৯৯৬-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# *জার্নি টু দি ইস্ট :*
# একটি বাংলাদেশী ইংরেজি উপন্যাস

গত কয়েক দশক ধরে দক্ষিণ এশিয় লেখকদের ইংরেজি উপন্যাসের সংখ্যা যথেষ্ট প্রতুল হলেও সেখানে বাংলাদেশী লেখকদের উপস্থিতি খুবই নগন্য। খুব সামান্য যে কটি নাম পরিচিতি পেয়েছে তার মধ্যে S. M. Ali-র *Rainbow over Padma* বা Farhana Haque Rahman-এর *The Eye of the Heart* দুটি ভালো উদাহরণ হলেও হৈ চৈ ফেলেনি; যদিও Monika Ali-র উপন্যাসটি সাড়া জাগিয়েছিল প্রকাশ পাওয়ার আগেই। পাশ্চাত্য মেডিয়ার এই আশীর্বাদ বিজন শর্মার (জন্ম ১৯৪৯) ভাগ্যে জোটে নি; তাঁর উপন্যাসটি কানাডা থেকে প্রকাশিত হওয়ার পরও। ২০০১ সালে ট্রাফোর্ড থেকে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির নাম *Journey to the East.*

Online সংস্করণে বিজন শর্মার উপন্যাসটির দৈর্ঘ্য ১৬৯ পৃষ্ঠা। মাঝারি কলেবরের এ উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু পশ্চিমা সভ্যতার বয়াবহ ধ্বংস এবং পূর্বদেশীয় সভ্যতার চিরকালীনতা। ঔপন্যাসিক তাঁর পছন্দের এই বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন মার্কিন সমাজ ও পারিবারিক অবস্থার বর্তমান ও অনুমিত ভবিষ্যতের পেক্ষাপটে। আর তা করতে যেয়ে লেখক তাঁর গল্পের সময়কালকে স্থাপন করেছেন উনত্রিংশ শতাব্দীতে। ভবিষ্যৎ সময়ে গল্পের কাঠামো স্থাপন বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনী ভিত্তিক উপন্যাসের একটি চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য হলেও সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমনটি দুর্লক্ষ। এবং সে বিবেচনাতেও *Journey to the East* উল্লেখ পাবার যোগ্য।

উপন্যাসটিরে মূল চরিত্র গ্লোরিয়া। প্রায় সমমাত্রার আরও যে একটি চরিত্র এতে উপাস্থিত সে হলো থমাস। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র গল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হলেও তারা আলাদাভাবে উল্লেখ্য নয়। গ্লোরিয়া উপন্যাসের বক্তা। উত্তম পুরুষে বর্ণিত গ্লোরিয়ার গল্পের প্রথম লাইনেই আছে 'Around six in the eveneng Mr. Thomas came.' এভাবে দুটি চরিত্রই কাহিনীর প্রথম থেকেই উপস্থিত যারা একটি চমকপ্রদায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ—থমাস বাবা হতে চায় এবং তার বাবার মা হিসাবে সে যে রমনীকে নির্বাচন করেছে সে হলো গ্লোবিয়া সুলিভান; তাদের দুজনের দৈহিক সম্পর্ক থেকে যে শিশুর আবির্ভাব তার DNA টেস্ট সম্পন্ন হলে যদি তা থমাসের সাথে মেলে তবে গ্লোরিয়া পাবে চুক্তি অনুযায়ী টাকা।



www.pathagar.com

হ্যাঁ, বিজন শর্মা তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে যে সমাজ কাঠামোতে স্থাপন করেছেন সেখানে কোন শিশুর কেউ বাবা-মা হয় না। শিশুরা শিশুরা পরস্পরের ভাই-বোনও হয় না। এই যে সম্পর্কহীনতা এটিই বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ রূপ— ঔপন্যাসিক তেমনভাবেই আমাদেরকে দেখিয়েছেন। সম্পর্কহীন সে সমাজের একজন গ্লোরিয়া যে সমাজ ব্যবস্থার এই রূপায়নে দুঃখী। 'I am a natural born child, I belong to no one and no one belong to me'(৩৪)—ভাবনাটি যে-গ্লোরিয়ার সে তার সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থার কারণেই অর্থের বিনিময়ে সন্তান ধারণ করে এবং সে সন্তানের জন্য তার কোন প্রীতি নেই। কেননার গ্লোরিয়ার সমাজে পূর্ণ বয়স্ক সকল নারীই মোটামুটি তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত— কর্মদাতা কোম্পানিগুলোর কৃপায় তারা নিজ ক্যাটাগরি অনুযায়ী কার্ড বহন করে যেমন M (Motherhood), F (Free lance) এবং A (Available on Payment) আর ঘটনাক্রমটি এমনই যে M হলো সবচেয়ে সম্মান ও অর্থ প্রাপ্তির চাকরি।

তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষ শতাব্দীগুলোর মানুষ হলেও গ্লোরিয়ার যে ভিন্নতা সেটি হচ্ছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা— সন্তান স্বামী পাওয়ার সে আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করেই বিজন শর্মার উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে। গ্লোবিয়ার আকাঙ্ক্ষা পল্লবিত হয় থমাসের সাথে তার যোগাযোগের কারণে। থমাস প্রথমে আসে গ্লোরিয়ার সাথে দৈহিক সম্পর্ক করতে পরবর্তীতে আসে তার নবজাতককে দেখতে। আর এভাবেই গল্পের গতি বাড়ে গ্লোরিয়া-থমাস সংলাপ শুরু হয়— যে সংলাপ থেকে থেকে মার্কিন ব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ করে চলে। আলোক ফেলে পূর্বদেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় যা থমাসের পাঠের অন্তর্ভুক্ত সে সংলাপে উঠে আসে মর্মভেদী সব প্রশ্ন: If such is the reality then what is the point of living in this world? What great purpose would my exixtence serve in this world? What new experience do I still expect to have in the future years? Why should I live any more? এতো সব প্রশ্নের শেষে ওরা দুজন যখন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন সেটি সফলতায় রূপ পায় না যেহেতু 'বিবাহ' বিষয়টি সে-সমাজের জন্য প্রাচীন একটি পদ্ধতি এবং আইন রক্ষাকারী সংস্থার লোকজন এসে তাদের সে পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি উপায়হীন গ্লোরিয়া এবং থমাস পাড়ি জমাচ্ছে জাহাজে— যে জাহাজের গন্তব্য পূর্বদেশীয় একটি বন্দর। শেষ দৃশ্যের পূর্বদেশের এ জয়গাথা ছাড়াও সারা উপন্যাস জুড়েই বারে বারেই থমাস-গ্লোরিয়া আলোচনায় ফিরে ফিরে এসেছে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির তুলনামূলক চিত্র-পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সাথে উপস্থাপিত সে তুলনায় বিজন শর্মার গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রকাশিত।

*Jouney to the East* এর লেখক বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। আর্কিটেক্ট বিজন শর্মার জন্ম বাংলাদেশের ভোলা জেলাতে। দীর্ঘদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত এ লেখক বাংলাদেশে ততটা পরিচিতি পান নি। তিনি প্রথম যে উপন্যাসটি প্রকাশ করেছেন সেটি বাংলা ভাষায় রচিত। ২০০০ সালে প্রকাশিত *মল্লিকা, আমার চন্দ্রমল্লিকা* শিরোনামের সে-উপন্যাসটি পরিচিতি না পেলেও এর অভিনবত্বের জন্য পাঠকের



www.pathagar.com

মনোযোগ দাবি করতে পারে। ইতিমধ্যে ২০০২ সালে কানাডার একই প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে তাঁর দ্বিতীয় ইংরেজি উপন্যাস *Drumline Migration*। কানাডা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ থেকে বিজন শর্মার জন্য আরও যে সব উপন্যাস প্রকাশের অপেক্ষার আছে তা হলো: *Maruhito Power Plant, WTA (Pvt) Co. Ltd, The Virgin Mother* এবং *The Streams of Baas Strait.*

*Journey to the East* বা *মল্লিকা, আমার চন্দ্রমল্লিকা*-র মত বিজন শর্মার সব উপন্যাসই সভ্যতা-সংস্কৃতি ও-ইতিহাসকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। গল্পের প্লটের ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে তিনি অনুন্ধান করে চলেন মানব জাতির অতীত ও বর্তমানের এই সব ইস্যুগুলোকে। বিজন শর্মার উপন্যাস পাঠের এটি একটি অতিরিক্ত পাওয়া যে পাঠক সহজেই তাঁর উপন্যাসে লাভ করেন এ সকল জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তুল্য ও প্রতিতুল্য চিত্র। *Journey to the East* যেমন পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, তেমনি *মল্লিকা, আমার চন্দ্রমল্লিকা* আমেরিকা ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রবাসী ব্রিটিশদের ধনলোভে অবক্ষয়িত হওয়ার কথা। ধনলোভ অর্থাৎ সোনার খনির অনুসন্ধান কিভাবে সেই সব আমেরিকান নাগরিকদেরকে পরিবার প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন করা শুরু করেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে এবং শেষ পর্যন্ত এ সবের ফলশ্রুতিতে আমেরিকান পরিবারগুলো কেমন করে ভাঙতে শুরু করলো তা বিজন শর্মা তাঁর *মল্লিকা আমার চন্দ্রমল্লিকাতে* উপস্থাপন করেছেন ইন্টারনেট ও ইমেলের মাধ্যমে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র স্থপতি মিলন এবং আমেরিকান অধ্যাপক উইলিয়াম শ্লেটারের মেল যোগাযোগের ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে ঐতিহাসিক এ তথ্যটি উন্মোচিত।

একথা সত্য বিজন শর্মার *মল্লিকা, আমার চন্দ্রমল্লিকার* গল্প কাঠামোটি কারো কারো কাছে দুর্বল মনে হবে, তবে সে ত্রুটি থেকে *Journey to the East* মুক্ত। আবার ইংরেজি উপন্যাসটিতে লেখকের যে দুর্বলতা পাঠকের চোখে পড়ে তা হলো দীর্ঘ আলোচনা যা অনেক সময়ই কথাসাহিত্য পাঠের অবস্থান থেকে পাঠককে দূরে ঠেলে দেয়।

বিজন শর্মার ইংরেজি উপন্যাসে সহ-লেখক হিসেবে, আরও যে একটি নাম আসে সেটি হলো MaryAnn যাঁর প্রকৃত নাম মীরা রাণী শর্মা যিনি প্রকৃতপক্ষে বিজন শর্মার বোন। কানাডা প্রবাসী প্যাথোলজিস্ট মীরা তাঁর ভাইয়ের গ্রন্থ প্রকাশ সংক্রান্ত সকল দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকেন বলেই বিজন শর্মা MaryAnn এর নাম তাঁর উপন্যাসের প্রচ্ছদে সর্বদা ব্যবহার করেন।

সাবকনিটনেন্টাল ইংরেজি সাহিত্যে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি বিজন শর্মার উপস্থিতির কারণেই অস্বীকার করা যায়। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রেক্ষাপটেও তিনি উপন্যাস লিখছেন। বহুবর্ণিল ও বিচিত্রধর্মী তাঁর ইংরেজি উপন্যাসগুলোর প্রকাশ বাংলাদেশের ইংরেজি উপন্যাসে একটি নতুন ধারা তৈরি করবে এমন প্রত্যাশা বর্তমান আলোচকের মত তাঁর যে কোন পাঠকই করবেন।



www.pathagar.com

# আমাদের সাহিত্যের ইংরেজি উপস্থাপন

বিশাল আকারের *Bankimchandra: Essays in Perspective* গ্রন্থটি (সাহিত্য আকাদেমী, নয়াদিল্লী ১৯৯৪) যাদের দেখার সৌভাগ্য হয় নি তারা বিশ্বাস করতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এমন ঢাউশ একটি ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। অথবা একই আকারের তিন খণ্ডের রবীন্দ্রনাথের নিজের ইংরেজি লেখার সংকলনগুলোও ঐতিহাসিক এক নিদর্শন বৈকি। কৃষ্ণ কৃপালিনীর *Rabindrandth Tagore : A Biography*, কৃষ্ণা দত্ত ও এন্ড্রু রবিনসনের *Robindranath Tagore : The Myriad-Minded Man* বা ক্লিনটন বি সীলির জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা *A Poet Apart* কেও এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। ক্লাসিক সে সব বইয়ের বাইরেও সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিম বাংলা তথা ভারত থেকে বেরুচ্ছে বাংলা সাহিত্যের উপর বা অনুবাদে গাদা গাদা ইংরেজি গ্রন্থ। কলেবরের প্রশ্নে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *সেই সময়*, *পূর্বপশ্চিম* এবং *প্রথম আলো*-র ইংরেজি অনুবাদ নিশ্চয়ই আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। মহাশ্বেতা দেবীর বিরাট সংখ্যক উপন্যাসসহ সমকালের প্রধান সাহিত্যিকদের আরও আরও বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারেও লভ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, অদ্বৈত মল্লবর্মন, সত্যজিৎ রায় প্রমুখের পর এ সব লেখকদের বইয়ের ইংরেজিকরণ বাংলা সাহিত্যের জন্য আশা জাগানিয়া এক সংবাদ। যদিও দুর্ভাগ্যের এই যে বাংলাদেশে আমরা এ কাজটির সম্ভবতম অংশটিও করতে নারাজ যার পরিণতি বিশ্বায়নের বর্তমানকালে আমাদের জন্য হবে মহা দুর্ভাগ্যের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান পীঠস্থান বাংলা একাডেমী তার সৃষ্টিকাল থেকে বছরে গড়ে একটি করে ইংরেজি গ্রন্থও প্রকাশ করেছে কিনা সন্দেহ। গত এক দশক ধরে পৃথিবী জুড়ে বিশ্বায়নের যে ডামাডোল তাতেও সে শ্লথ গতির বিশেষ কিছু হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে নি। তবে ঘটানো যে সম্ভব তা ধারণা করা যায় অধ্যাপক আমানুল্লাহ আহমেদের অনুবাদ গ্রন্থ *Warp and Woof* (মূল *টানাপোড়েন* : সেলিনা হোসেন) পড়লে। এমন সাবলীল অনুবাদের যোগ্য ব্যক্তিদেরকে আগ্রহী করা প্রয়োজন দেশিয় সাহিত্যকে ইংরেজিতে উপস্থাপনে। স্বাধীনতা উত্তরকালে লোকসাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ বাদে বাংলা একাডেমী ইংরেজি গ্রন্থের তালিকাটি তো এমনই দাঁড়াবে: মুনির চৌধুরীর *Three Plays* (১৯৭২), আনোয়ার পাশার *Rifles, Bread and Women* (১৯৭৬),



www.pathagar.com

আলাউদ্দিন আল আজাদের *Portrait Number Twenty Three* (১৯৭৮), *Three Plays by Sayeed Ahmed* (১৯৭৯), *14 Young Poets of Bangladesh* (১৯৮১), *Selected Poems of Al Mahmud* (১৯৮১), *Four Poets from Bangladesh* (১৯৮৪), *An Anthology of Contemporary Short Stories of Bagladesh* (১৯৮৪), *Selected Poems of Hasan Hafizur Rahman* (১৯৮৫), *Selected Poems of Sanaul Huq* (১৯৮৫), *Selected Stories of Shaukat Osman* (১৯৮৫), *The Aborted Island* (১৯৮৫), *The king and the serpent* (১৯৮৫), *Flaming Flowers* (১৯৮৬), *A Choice of Contempory Verse from Bangladesh* (১৯৮৬), *Selected Poems of Abul Hussain* (১৯৮৬), *Selected Poems of Shamsur Rahman* (১৯৮৬), *The Shirk, the River and the Granades* (১৯৮৭), *Selected Poems of Abul Hasan* (১৯৯৩), *Draupadi* (১৯৯৮), *Different Spring* (১৯৯৯), *The Human Hole* (২০০১) প্রভৃতি। ২০০১ প্রকাশিত শহীদুল্লা কায়সারের দীর্ঘ উপন্যাস *সংশপ্তক*-এর ইংরেজি অনুবাদও আমাদেরকে সাহস যোগায়। হাতে গোনা এই কটি অনুবাদ কর্ম নিয়ে আমরা কিভাবে বিশ্বসভায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করবো!

বাংলা একাডেমীর বাইরে ইংরেজি ভাষায় আমাদের উপস্থাপনা কতখানি? ইংরেজি বইয়ের সফল ব্যবসায়ী ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড-এর তালিকায় আমাদের শিল্প সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থও যথেষ্ট নেই। ব্রাদার জেমসকৃত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও লালনের গানের একটি বই; নিয়াজ জামান সম্পাদিত/অনূদিত কিছু গ্রন্থ; ফকরুল আলমের অনুবাদে জীবনানন্দের কবিতা প্রভৃতিই তাঁদের সম্বল। তবে দুবছর ধরে ইউপি এল প্রকাশিত *Six Seaons Review* সাহিত্য পত্রিকাটির তিনটি সংখ্যা একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে চলেছে তা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। এর বাইরে আমাদের সাহিত্যের অনুবাদ কোথায়? নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত *Nazrul Institute Journal*-এর ৬টি সংখ্যা ছাড়াও নজরুল সাহিত্যের অনুবাদ গ্রন্থ মোট ৫ টি এবং নজরুল সাহিত্য নিয়ে মোট ৬টি গ্রন্থ। এসবের মধ্যে সাজেদ কামালের অনুবাদে *Kazi Nazrul Islam: Selected Works* (১৯৯৯) এবং মুহম্মদ নূরুল হুদার মৌলিক ইংরেজি গ্রন্থ *Nazrul's Aesthetics and Other Aspects* (২০০১) অন্যতম। অন্যান্য প্রকাশকদের মধ্যে পাঠক সমাবেশের কয়েকটি অনুবাদ প্রশংসার দাবিদার: আরজ আলী মাতব্বরের *The Quest for Truth*, আনিসুর রহমানের অনুবাদে Songs of *Tagore*, মাহবুবুল আলম আখন্দ অনুদিত আল মাহমুদের কবিতা *Beyond the Blue, Beneath the Bliss* অথবা সৈয়দ নাজিমুদ্দিন হাশিমকৃত শামসুর রাহমানের কবিতার অনুবাদ এমনই কয়েকটি উদাহরণ। এসবেরও বাইরে ইংরেজিতে লেখা সাহিত্য বিষয়ক



www.pathagar.com

বা অনুবাদগ্রন্থ রয়েছে তাদের মধ্যে সহজলভ্য হলো : *Songs of Lalon* (অনু: সমীর দাশগুপ্ত, সাহিত্য প্রকাশ), *Keep it up, Kilroy* (সৈয়দ শামসুল হক, বিদ্যাপ্রকাশ), হুমায়ূন আহমেদের *Ants and Other Stories* ও *1971* (দুটিই মাওলা ব্রাদার্স থেকে), *In Blissful Hell* ও *A Few Youngs in the Moon* (দুটিই সময় প্রকাশন থেকে), জাফর ইকবালের *Rashed, My Friend* (সময় প্রকাশন), *Selected Poems of Ahmed Rafique* (জিজ্ঞাসা), *The Field of the Embroidered Quilt* (পলাশ প্রকাশন) এবং সবেধন নীলমনি ইউরোপ থেকে প্রকাশিত শওকত ওসমানের *জননী*-র অনুবাদ।

দেশের শিল্প-সাহিত্য নিয়ে ইংরেজিতে লেখা বই বা অনুবাদ একেবারেই নেই এমন ভাবনা নিয়ে খুঁজতে গিয়ে উপরের তালিকাটি তৈরি হল যাকে নিশ্চয়ই 'শূন্য' বলে অভিধা দেয়া চলে না। ব্যক্তি উদ্যোগে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকেও কিছু বই বেরিয়েছে। তবে সমস্যা হলে সেসবের অধিকাংশই কোনক্রমেই পাঠকের লভ্য সীমানায় আসার মত বাজার ব্যবস্থা পায় নি। যে কারণে দেশি বা বিদেশি একজন পাঠক ইংরেজি ভাষায় রচিত আমাদের শিল্প-সাহিত্য-ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পান না।

অর্থাৎ শুধু বই অনুবাদ ও রচনার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেই হবে না ইংরেজিতে প্রকাশিত বইগুলো সংগ্রহের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এর জন্য দরকার কেন্দ্রিয় একটি উদ্যোগ। যাতে দেশে প্রকাশিত সকল শিল্প-সাহিত্য-ভাষা বিষয়ক বই সে ব্যবস্থায় গৃহীত হতে পারে। ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য বই সেখানে সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আজ জাতিগতভাবে আমাদের যে সমস্যা চলছে অর্থাৎ কোন বিদেশি সংস্থা বা ব্যক্তি যদি বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা এমনকি মাতৃভাষা দিবস নিয়েও কাজ করতে চান, জানতে চান তবে তা পান না সে সমস্যাটি এভাবে সামান্য হলেও দূর হবে। দেশে অন্তত একটি জায়গা থাকবে যেখানে বাংলাভাষী নন এমন কেউ সহজেই অন্তত আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিতে কিছু মাল-মশলা পাবেন।

তবে তার চেয়ে বেশি যেটি দরকার সেটি হলো সরকারি উদ্যোগে, প্রয়োজনে প্রোজেক্টের মাধ্যমে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ইংরেজি কিছু গ্রন্থ, তা অনুবাদ বা মৌলিক যাই হোক না কেন, রচনার ব্যবস্থা করা। দেশের ইংরেজি জানা প্রধান পণ্ডিত ও লেখকদের সে প্রকল্পের শীর্ষস্থানে রেখে একগাদা প্রবীন ও তরুণ কর্মীকে, যারা ইংরেজি ভাষায় পড়েন, লেখেন এবং অনুবাদ করেন, তাঁদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত এবং নিয়োজিত করা যেতে পারে। প্রয়োজনে তেমন একটি প্রকল্প বাংলা একাডেমী থেকেও পরিচালিত হতে অসুবিধা নেই যেহেতু বাংলা একাডেমী 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' তা 'তরুণ লেখক' প্রকল্পের মত কাজ ইতিমধ্যে পরিচালনার অভিজ্ঞতা রাখেন।

প্রকল্পের প্রশ্ন এজন্যেই ওঠে যে প্রচলিত নিয়মে শতকরা ১০/১২/১৫ ভাগ রয়ালটি প্রদানের মাধ্যমে এমন একটি কাজ হওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত *Warp and Woof* শিরোনামের অনুবাদটির কথা



www.pathagar.com

বলবো। সে অনুবাদটি করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আমানুল্লাহ আহমেদ। বইয়ের গায়ের দামের সর্বোচ্চ ১৫% রয়ালটিও যদি প্রদান করা হয়ে থাকে এবং গ্রন্থটি যদি সর্বোচ্চ ১২৫০ কপিও ছাপা হয়ে থাকে তবে অনুবাদক পেয়েছেন পনের হাজার টাকা মত। সত্যিই তাঁর মত একজন পণ্ডিতের এমন অসামান্য একটি অনুবাদ কাজের মূল্যায়নে পনের হাজার টাকা—হাস্যকর বৈকি!

সে প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্যের সকল শাখার আলাদা আলাদা কোষগ্রন্থ লেখানো হোক, নজরুল সমগ্রসহ বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রধান রচনারগুলোর ইংরেজি অনুবাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হোক। দলমত নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে যদি এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা একটি কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌছাতে পারবো। মনে রাখতে হবে আমরা এতটাই অথর্ব যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুদ্দীন আবুল কালামের মত সাহিত্যিকদের ইংরেজি উপন্যাস বা আহমদ ছফার *Flowers, Plants and Birds* এর মত গ্রন্থকেও প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারি নি।



www.pathagar.com

# বাংলা সাহিত্যকোষ : একটি পর্যালোচনা

অধিকাংশ প্রধান ভাষায় সাহিত্যকোষ-জাতীয় গ্রন্থ থাকলেও বাংলা ভাষায় তেমন একটি গ্রন্থের অভাব দীর্ঘদিন ধরে বাংলাভাষী পাঠক অনুভব করেছেন। ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সাহিত্যকোষ: নাটক* এবং *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য*-এ ধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য' ১৯৯৩ সালে পরিবর্ধিতভাবে প্রকাশও পেয়েছিল। সে-গ্রন্থটি ছিল M. H. Abrams এর *Glossary of Literary Terms*- এর মত। যেখানে সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন ধারণাকে আলোচনা করা হয়েছিল। *Literary Terms*- এর প্রয় অনুদিত এবং সংক্ষেপিত আর একটি গ্রন্থ হলো বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত কবীর চৌধুরীর *সাহিত্যকোষ* (১৯৮৪)।

১৯৮৪ সালেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বীতশোক ভট্টাচার্য রচিত *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান*-এর প্রথম খণ্ড। সে গ্রন্থটিতে সাহিত্যবিষয়ক ধারণা ছাড়াও লেখক, গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ও স্থান, সাল প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেটি বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সে সেটিরও পরবর্তী খণ্ডগুলো আর প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

গত দুই দশকে বাংলা একাডেমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রয়োজনীয় আকরগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এগুলোর মধ্যে পূর্বোল্লিখিত সাহিত্যকোষ অন্তর্ভুক্ত। আর সম্প্রতি বাংলা একাডেমী সাহিত্যবিষয়ক এমন একটি গ্রন্থ অনেক দেরিতে হলেও দেশবাসীকে উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞভাজন হয়েছে। আগস্ট ২০০১-এ প্রকাশিত *বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যকোষ*-এর 'প্রসঙ্গ-কথা' পড়লে বোঝা যায় আমাদের ঋদ্ধ পূর্বসূরিরা এমন গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সেই ১৯৬৬ সালেই এর কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্তহীনতার ভেতর দিয়ে এর প্রথম অর্থাৎ স্বরবর্ণ অংশ যখন প্রকাশ পেল তখন চৌত্রিশটি বছর অতিক্রান্ত। ব্যাপারটি দুঃখের।

'প্রসঙ্গ-কথা'য় উল্লিখিত হয়েছে 'এ কোষগ্রন্থের ব্যাপ্তি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিককালের ২০০০ সাল পর্যন্ত। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যেসব লেখকের জন্ম তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থ ও উল্লেখযোগ্য রচনার পরিচিতি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্প্রতিকালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বাঙালির ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে তা-ও সংকলিত হয়েছে।' এরপর কোন কোন শ্রেণীর ভূক্তি এতে করা হয়েছে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিবরণটি এমন :



www.pathagar.com

১. বাঙালি কবি-সাহিত্যিক ও গীতিকারদের সংক্ষিপ্ত জীবনী;
২. বিশিষ্ট দেশি ও বিদেশি দার্শনিক, চিন্তাবিদ, শিল্প-সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ, ধর্মবেত্তা, রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যাঁদের জীবন ও কর্ম বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি;
৩. বাংলা ভাষায় প্রতিনিধিত্বশীল গ্রন্থ-কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, গবেষণা প্রবন্ধ, সমালোচনা, সংকলন-সম্পাদনা, শিশু-সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, রসরচনা, জীবন, স্মৃতিকথা, তিল্পকল্প, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি;
৪. বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রতিনিধিত্বশীল গ্রন্থের পরিচিতি;
৫. বাংলা ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকার সাহিত্যের রূপতত্ত্ব-রসতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্বের সংজ্ঞার্থ বর্ণনা এবং প্রধান প্রধান ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর পরিচিতি;
৬. বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাহিত্য, ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্ব; ধর্মীয় ও জাতীয় ঐতিহ্য ও পৌরাণিক চরিত্র; ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব; সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন; ভাষা আন্দোলন ও মুক্তযুদ্ধ; নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত; লোকসাহিত্য ও লোকতত্ত্ব; সাহিত্য-পত্রিকা ও সংবাদ ইত্যাদি পরিচিতি।

মনযোগী পাঠক লক্ষ করবেন উপর্যুক্ত তালিকাটিতে সাহিত্য সম্পর্কে কম প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিক, গীতিকারদের সাথে রাজনীতিবিদ, ধর্মবেত্তা, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রমুখকে অন্তর্ভুক্ত করে সেই সঙ্গে এমন বিদেশি ব্যক্তিত্বকে যদি অন্তর্ভুক্তর প্রশ্ন ওঠে তবে নির্বাচন যে সত্যি দুরূহ হয়ে পড়বে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তেমনভাবে ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্বকে ও এড়ানো যেত বলে মনে হয়। 'প্রসঙ্গ-কথা'য় দেয়া তালিকাতে বাংলা ব্যাকরণের কথা উল্লেখ থাকলেও সাহিত্যকোষের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা মানতে কষ্ট হয়।

কয়েকটি বিশেষ ভুক্তিও নজরে পড়েছে যেখানে একাধিক ভুক্তিকে একসাথে স্থাপন করা হয়েছে। একই অন্তর্ভুক্তিকে 'অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজ বিলাস, বিধবা বিবাহ ও যশোরের হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা, রত্ন পরীক্ষা' বা 'অন্তশীলা (১ম খণ্ড), আবর্ত (২য় খণ্ড), মোহনা (৩য় খণ্ড)' বা 'উন্নত জীবন, মহৎ জীবন, মানব জীবন' বা 'একদা (১৯৩৯), অন্যদিন (১৯৫০), আর একদিন (১৯৫১)' কে রাখা যৌক্তিক মনে হলেও মূল ভুক্তির পরবর্তী শিরোনামগুলো বর্ণক্রম অনুযায়ী স্থান পাওয়া উচিত ছিল, যেখানে বিবরণ অংশে 'দ্রষ্টব্য...' যথেষ্ট হত। একটি ভুক্তি রয়েছে 'ওমর খৈয়াম মেঘদূত গীত গোবিন্দ'। এমন উদ্ভট একটি ভুক্ত কেমন করে সম্ভব? কোন একজন অনুবাদক তিনটি কাব্যগ্রন্থকে এমন একটি শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বলে কি সে গ্রন্থের নামটি সাহিত্যকোষে অন্তর্ভুক্তি পেতে পারে!

বিদেশি লেখক নামের ভুক্তিতে কোথাও কোথাও প্রথম নাম কোথাও কোথাও পারিবারিক নাম অনুসারে স্থাপন করা হয়েছে। ওয়াশিংটন আরভিং যদি আরভিং ভুক্তিতে



www.pathagar.com

থাকেন, তবে আর্নেস্ট হোমিওয়ে, ইউজিন ও ' নীল, ইউলিয়ম জোনস্, উইলিয়ম ফকনার প্রমুখেরও তাঁদের পারিবারিক নামের বর্ণক্রমে অনুযায়ী ভুক্তিতে স্থান পাওয়া দরকার ছিল। আর যেহেতু আমেরিকা ইউরোপের প্রচলন অনুযায়ী পারিবারিক নামই অগ্রগণ্য, সেভাবে সে নামগুলোকে স্থাপন করা আবশ্যকও ছিল বৈকি। বিদেশি নাম বাংলার পাশাপাশি যেমন ইংরেজি বানানে দেয়ার দরকার ছিল তেমনি সে সকল লেখকের রচিত গ্রন্থের নাম শুধুমাত্র ইংরেজি হরফে দিলেই যথেষ্ট হত। গ্রন্থটিতে কোথাও কোথাও সেগুলোর উচ্চারণকে বাংলা হরফে দেয়া হয়েছ আবার কোথাও কোথাও বাংলা উচ্চারণের পাশে ইংরেজি বানানটি রাখা হয়েছে। কিছু কিছু ভুক্তি কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন তাঁদের অন্তর্ভুক্তির কারণ নিয়ে। 'এঙ্গেলস্-এর এ্যান্ডি (এ্যান্টি)-ডুরিং' 'এডগার এলান পো রচনাবলী' বা 'এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব' ভুক্তি হিসাবে স্থান পেলেও অন্তর্ভুক্ত হন নি এঙ্গেলস, এডগার এলান পো বা এ্যারিস্টটল। 'আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ স্মরণে' গ্রন্থটিও স্থান পেয়েছে যদিও স্মরণকৃত ব্যাক্তির স্থান লাভ ঘটে নি। এবং মজার বিষয় হল গ্রন্থের ভূক্তিতে প্রকৃতপক্ষে স্মরণকৃত ব্যক্তিকে নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

এবার আসি বাংলাভাষী লেখকদের অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে। *সাহিত্যকোষ*-এর বিভিন্ন লেখক ভুক্তিকে তুলনা করলে স্পষ্ট হয় এ বিষয়ক কোন নির্ধারিত নমুনা ভুক্তি রচয়িতাদেরকে দেওয়া হয় নি। ভাবতে বিস্ময় লাগে *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* এবং *বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান*-এর মত উন্নত দুটি আকরগ্রন্থ প্রকাশ করার পরও এতে সেগুলোর ভাষাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বৃদ্ধি করে গ্রন্থের কলেবর বাড়ানো হয়েছে মাত্র। অথচ উপযুক্ত ও নির্ধারিত নির্দেশনায় কাজ করলে আরও বহু ভুক্তিকে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যেত, একই কলেবরে। লেখকভুক্তিতে গ্রন্থনাম উল্লেখের ক্ষেত্রেও একটা নির্দিষ্টতা থাকার দরকার ছিল। কিছু কিছু গ্রন্থকে উর্ধ্বকমার ভেতরে রাখলেও অনেকগুলোকে আবার রাখা হয় নি। এবং হয়ত ভাল হত পুরো সাহিত্যকোষ জুড়ে সকল গ্রন্থনাম বাঁকা হরফে রাখলে।

গ্রন্থনামের ভুক্তি প্রসঙ্গে একথা নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন যে, যদি শুধুমাত্র বাংলাভাষায় রচিত এ যাবৎকালের সকল গ্রন্থের শুধু শিরোনামকে একটি তালিকায় আনা যায় তবে তার জন্য হাজার পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থও হ্রস্ব যেতে পারে। অর্থাৎ যদি *সাহিত্যকোষ*- এর জন্য গ্রন্থ নির্বাচন করতে হয় তবে অবশ্যই তার একটি মাপকাঠি নির্ধারণ প্রয়োজন। অথচ সাহিত্যকোষ-এর এমন প্রচুর গ্রন্থনাম ভুক্তি হিসাবে দেয়া হয়েছে যে গ্রন্থগুলো বা সেগুলোর লেখক কোন বিবেচনাতেই এমন একটি আকরগ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। আকরগ্রন্থে যে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের প্রকাশকের নাম, প্রকাশকের পূর্ণ ঠিকানা, পৃষ্ঠা, মূল্য বা সাইজও দেয়ার দরকার হতে পারে এমন অভিজ্ঞতা সকলের জন্য নিশ্চয়ই প্রথম। এ প্রসঙ্গে আমি পাঠককে'আমাদের একাত্তর' ভুক্তিটি পাঠ করতে অনুরোধ করব। এ কিশোর গল্প-গ্রন্থটির 'সাইজ $\frac{১}{১৬}$ ডবল ডিমাই' তা নিশ্চয়ই আপনার জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয় একটি তথ্য! ভুক্ত গ্রন্থের লেখকের নামের পাশে তাঁর জন্ম বা



www.pathagar.com

প্রয়োজনানুযায়ী জন্ম-মৃত্যু উভয় উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন ছিল, অথচ কোথাও কোথাও তা থাকলেও অধিকাংশ জায়গাতেই তা রাখা হয় নি। আবার 'আন্না কারেনিনা' বা 'আইভান হো' এর বিষয়বস্তু থেকে ভুক্তি দুটি প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের নাকি তাদের লেখকের তা বোঝা কষ্টকর।

পাঠ করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে হবে। আরজ আলী মাতুব্বর না থাকলে তাঁর 'অনুমান' ভুক্তি হওয়ার যোগ্যতা পায় কী করে! তেমনিভাবে অসীম রায়ও অনুপস্থিত। যদিও অসীম রচিত 'আমি হাঁটছি' বা 'একালের কথা' রয়েছে, কিন্তু তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস 'আবহমানকাল' নেই। নেই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত কবি বা ভার্জিনিয়া উলফের মত ঔপন্যাসিকের নাম। বাদ পড়েছেন এসকাইলাস, ওভিদ, আবু সায়ীদ আইয়ুব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এজরা পাউন্ড, অমরেন্দ্র ঘোষের মত বড় লেখক। আর বাদ পড়েছে গ্রন্থনামও। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দিরা', কাজী নজরুল ইসলামের 'আলেয়া', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান' ও 'উপনিবেশ' এবং মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'আজকালপরশুর গল্প'। দু'চারটি ছোটগল্পের নামও অন্তর্ভুক্তি পেয়েছে। ছোটগল্পের গ্রন্থনাম থাকলেও আলাদা আলাদাভাবে ছোটগল্পগুলোকে ভুক্তি দেয়া স্থান-প্রশ্নে কঠিন, এটি অনুমান করা যায়। আর সে কারণেই এ ব্যাপারে কোন মান রক্ষা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'আদরিণী' (যদিও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী'র মত মনজয় করা গল্প সে-সুযোগ পায় নি), হেমেন্দ্র কুমার রায়ের 'অভিশপ্ত', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' (যদিও সে-গল্পটি যে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেই 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প'-এর নাম অন্তর্ভুক্ত নয়) এমনই কয়েকটি উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভাগ্যে কিছুই প্রাপ্তি ঘটে নি। তাঁর 'একরাত্রি', 'আষাঢ়ে গল্প', 'অসম্ভব কথা', 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প', 'অনধিকার প্রবেশ', 'অতিথি', 'আপদ', 'অধ্যাপক', 'অপরিচিতা' কোনটিই স্থানলাভের যোগ্য হয় নি। যেমনভাবে পার পায় নি নজরুলের 'অতৃপ্ত কামনা' এবং 'অগ্নিগিরি'-ও।

আর অনবধারবশত প্রমাদ? বেশি ঘটেছে শামসুদ্দীন আবুল কালাম (দ্র. 'আলমনগরের উপকথা') ও আবুবকর সিদ্দিকের ভাগ্যে। দু'জনেরই ভুল নাতে গৃহীত। শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'দুই মহল'-এর রচয়িতা না হয়ে হয়েছেন 'বাইমহল'-এর লেখক, আর বেচারা আবুবকর সিদ্দিকের ভুক্তিতে উল্লিখিত তাঁর রচিত তেরটি গ্রন্থের নামের মধ্যে ন'টিই ভুলভাবে লিখিত। তবে সবচেয়ে হতভাগ্য বোধ হয় বর্তমান আলোচক। তিনশ টাকা দামের গ্রন্থটি কিনে উদ্দীপনা প্রশমনের পূর্বেই দেখা গেল এর পৃষ্ঠাক্রম '৯৭-এর পর যথাক্রমে ৬৮, ৬৫, ১০০, ১০১, ৭২, ৬৯, ১০৪, ১০৫, ৭৬, ৭৩, ১০৮, ১০৯, ৮০, ৭৭ ও ১১২। এটি কি শুধু বাঁধাইকারের ভুল? আমার মত সামান্য কলমচির জন্য সে-উত্তর পাওয়া যথেষ্ট পেরেশানির বৈকি!

ত্রৈমাসিক *নতুন দিগন্ত* (১ম বর্ষ য় সংখ্যা ; জানুয়ারি-মার্চ ২০০২)-এ প্রকাশিত।



www.pathagar.com

# ইন্টারনেট ও আমাদের সাহিত্যের দুরবস্থা

ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটি শুরু করা যেতে পারে। ফরাসি সাহিত্যিক বিশ্বখ্যাত মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২) আমার প্রিয় লেখকদের একজন হলেও ঘটনাক্রমটি এমন যে, তাঁর রচনা হাতে পাওয়ার বা তাঁকে নিয়ে রচিত সমালোচনা পাঠের বিশেষ সৌভাগ্য আমার খুব বেশি হয় নি। Germaine Bree রচিত *The World of Marcel Proust* (বোস্টন, ১৯৬৬) গ্রন্থটিই আমার একমাত্র সবেধন নীলমণি, যেটি আমি মাঝে মধ্যেই নাড়াচাড়া করি এবং তৃপ্তি হওয়ার প্রচষ্টা চালাই।

হঠাৎ করেই একদিন মনে হলো দেখি না ইন্টারনেটে প্রুস্ত Search করে। Google ইঞ্জিন দিয়ে Marcel Proust লিখে Enter-এর চাপ দিতেই শত শত link আমাকে উদ্বেলিত করে তোলে। প্রথমটি খুলতেই তাঁর ছবি, জীবনীমূলক তথ্য, আলোচনা ইত্যাদি যেন আমাকে পাগল করে দেয়। ১৯২২-২৭ সালের ভেতর প্রকাশিত প্রুস্ত রচিত ১৩ খণ্ডের বিশাল উপন্যাসটির (যেটি প্রথমে *Remembrance of Things Past* নামে ১৯১৩-'৩১ সালে Scott Moncrieff -এর অনুবাদে এবং পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে D J Enright-এর অনুবাদে *In Search of Lost Time* নামে প্রকাশিত হয়েছিল) অংশগুলোও কম্পিউটারের পর্দায় দেখতে পারায় আমার নিজেকে মনে হয়েছিল একজন অসম্ভব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

অন্য আর একটি অভিজ্ঞতা এমন : বন্ধুসূত্রে হঠাৎই জানলাম ইংরেজি দৈনিক *The Daily Star*-এর সাহিত্য বা ম্যাগাজিন পাতায় নাকি শশি থারুরের *Riot* (২০০১) উপন্যাসটি নিয়ে একটি আলোচনা বেরিয়েছিল। উদ্দীপক এমন তথ্যটিতে যখন আমি খুঁজে চলেছি পুরনো পত্রিকার ধূলোমাখা ঢিবি, তখনই Search Engine-এ Shashi Tharoor + Riot লিখে সার্চ দিতেই শশি থারুরের বহুল আলোচিত এ উপন্যাসটি নিয়ে যত তথ্য পেয়েছি, তা Print Out এর শ' পাঁচেক পৃষ্ঠা ছাড়াবে এবং সেখানে আলোচক-প্রতিবেদক-সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী রয়েছেন ভারতে থেকে সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত। সেগুলো ছাপা হয়েছিল দৈনিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকাতেও। বিভিন্ন entry গুলো খুলতে খুলতে বারবারই হতাশ হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, ফরাসি দেশের একজন পাঠক বা ভারতের একজন অবাঙালি পাঠক যদি বিশেষ কোন কারণে আগ্রহী হয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে বা আমাদের একজন বড় লেখক নিয়ে iternet-এ সার্চ করতেন, তাহলে তার প্রাপ্তি হতো সম্পূর্ণ উল্টো। Rabindranath Taogre



www.pathagar.com

বা Kazi Nazrul Islam লিখে search দিলেও প্রত্যাশিত পরিমাণে তথ্য পাওয়া যায় না। আর এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, বাংলা সাহিত্যের এ দু' মহান সাহিত্যিককে ছাড়া অন্যদের অবস্থা কেমন!

এমন পরিস্থিতি কি এজন্যই যে Shashi Tharoor ইংরেজিতে লেখেন? কিন্তু Proust তো ইংরেজি অনুবাদে। তবে অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের জায়গা হয় না কেন? এ প্রসঙ্গটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে ইংরেজি ভাষার বৈশ্বিক গুরুত্ব বিষয়ক দুটি তথ্য উপস্থাপন করতে চাই— অতীতে ফরাসি কলোনির অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৯৯৬ সালে আলজেরিয়ার বিদ্যালয়গুলোতে ফরাসির বদলে ইংরেজিকে প্রধান বিদেশি ভাষা হিসেবে পাঠ্য করা হয়েছে; একই বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে রুয়ান্ডায় সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে ইংরেজি।

ইংরেজি ভাষার পূর্বাপর দাস মানসিকতার আমরা এ তথ্য দু'টিকে বিশেষ আমল দিই না; কেননা, বিশ্বায়নের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা ম্যাকলুহান ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ *আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়াতে* গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রামের কথা বলেছিলেন, তারও আগে থেকেই তো আমরা ওই ভিলেজ মালিকদের দাস। মালিকের লেখা আমরা পড়ি, আগেও পড়েছি। আগে সময় লাগত হাতে পৌঁছতে এখন মাউসের দু'তিনটে ক্লিকই যথেষ্ট; কিন্তু মালিক কি আমারটা পড়ে? অনেক আগে কিন্তু পড়েছে আঠামো শতকে, আমাদের ভাষা শিখেই তাকে পড়তে হয়েছে, উইলিয়াম জোনস বা ম্যাক্স মুলার তো এমনই কয়েকটি নাম। আর এখন মালিক পড়ে যদি আমার সাহিত্য তার ভাষায় লেখা হয়। শুধু পড়ে না পুরস্কারও দেয়, যাতে করে তার ভাষায় আমরা উৎসাহিত হই, উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখি।

বিশ্বায়ন তো প্রকৃত সূত্রে আমাদেরকে শোষণেরই আর একটি উপায়। সবরকমে আমাদেরকে ওদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার নতুন কৌশল আর কি। যদিও তথ্য-প্রযুক্তির আলোকে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে, আমরা লাভবানও হয়েছি। আমার সামনে তাদের জ্ঞানভাণ্ডারটি অনেক সহজলভ্য করে রাখা হয়েছে। যদিও সেই তুলনায় আমার ভাণ্ডারটি খুবই ক্ষুদ্র। আর তাই তাদের তথ্য আমি জানতে বাধ্য; কিন্তু আমার তথ্য? অন্যদিকে ওরা কিন্তু কিছু মাগনা দেয়, লোভও দেখায়। পাঠক যখন এ লেখাটি পড়ছেন, ঠিক তখনি আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা ওয়েবসাইটে যুক্ত হলো যার কয়েক লাইন দেখতেই আগ্রহ জন্মায়, আর তার পরপরই দেখি ডলার চিহ্নটি জ্বলজ্বল করছে। এমনভাবে লিখেছে যে আমার ক্রেডিট কার্ডটি খরচ করাবেই; কিন্তু আমি সেটা কতটুকু করাতে পারি?

একজন অ-বাংলাভাষী যদি সবগুলো ওয়েবসাইট তন্ন তন্ন করে খোঁজেন, তা হলেও আমাদের দেশের সাহিত্য নিয়ে বেশি পৃষ্ঠার সন্ধান পান না। আমাদের প্রধান বাধা ইংরেজি। এছাড়া দেশের সাহিত্যকে ওয়েবের পাতায় তুলে দেয়ার মতো পৃষ্ঠা পোষকের অভাব রয়েছে। আমাদের প্রয়োজন এমন একটি উদ্যোক্তা-গোষ্ঠী, যাদের অর্থায়নে বাংলা



www.pathagar.com

সাহিত্যের তথ্য, ইতিহাস ও প্রধান রচনাভিত্তিক কয়েক হাজার পৃষ্ঠা আমরা ওয়েবসাইটে 'ফ্রি অফ কস্ট' রাখতে পারি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *Kazi Nazrul Islam Page* এর কথা।

নজরুল ও তাঁর লেখা নিয়ে সবচেয়ে বড় এ Pageটির নেপথ্যের ব্যক্তিটি বাঙালি হলেও প্রবাসী। nationonline ও তাদের লেখাগুলো উন্মুক্ত রেখেছে ব্যবহারকারীদের জন্য। দেশের অন্য একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক লেখাগুলো খুঁজতে গিয়ে আমার তো চোখ ছানাবড়া। যেটাই খুলি সেটাই ডলার চিহ্নিত। ৫ শ' শব্দের এক লেখা সেটাও নাকি ১ ডলার বেশি— হাসবো না কাঁদবো! কে পড়বে মাত্র ৫ শ' শব্দের সাধারণ ওই লেখাটি ডলার মূল্য দিয়ে! এবং আরও মজার তথ্য হলো, যে সকল লেখকের লেখাকে ডলার মূল্য দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে—তারা কেউই বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত হন নি। হয়ত browse করতে গিয়ে দেখেছেন নিজের লেখার শ্বাসরুদ্ধ অবস্থাটি। অথচ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো উপযুক্ত লেখাকে host করা হবে এমন প্রতিশ্রুতি নিয়ে যদি কোন উদ্যোক্তা এগিয়ে আসতেন, তাহলে অর্থপ্রাপ্তির আশ্বাস ছাড়াও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক অনেক ইংরেজি লেখা নিয়ে একটা বিরাট website গড়ে তোলা অসম্ভব হতো না। আমাদের সাহিত্যবাসীদের Online সাহিত্য চর্চার দু'রকমের সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে কাজ করে থাকেন তাদের খুব সামান্য অংশই ইংরেজিকে ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। ইংরেজিতে অনুবাদের পরিমাণও খুবই নগণ্য। অন্যদিকে যারা ইংরেজি ভাষাকে লিনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন, তাদেরও সামান্য অংশই Computer ও Internet প্রযুক্তি দুটির সঙ্গে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া সামগ্রিক ব্যাপারটির সঙ্গে সময় ও অর্থের যোগসূত্রতা খুব দৃঢ়। তাই যদি অর্থ যোগানদান পাওয়া যায় তাহলেই সম্ভব উপযুক্ত লোকের সম্পৃক্ততা— যারা তাদের সময় ও মেধাকে কাজে লাগাবেন ইংরেজি ভাষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উপস্থাপনের ব্যাপারে।

সীমিত পর্যায়ে বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে যেসব website আছে সেগুলো খুললে বোঝা যায় তাদের ক্ষমতা, দূরদর্শিতা ও মেধার অভাব কত। অথচ India-র মতো দেশেও website গুলোর পরিমাণগত ব্যাপারটি রীতিমতো বিস্ময়কর। আর আমার দেশের শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে অন্যরা তাদের website ভরবে কেন? লেখা পাঠালেই সাত-সত্যের প্রশ্ন, পঞ্চাশ ধরনের অর্ডার। ফরাসি দেশের একটি ইংরেজি ট্রান্সলেশনের website-এ কাজী নজরুলের পাঁচ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ পাঠিয়ে সে কি নাস্তানাবুদ অবস্থা বর্তমান লেখকের। গোটা দশেক ই-মেইল আদান-প্রদানের পর তারা সে অনুবাদটি host রাজি হলেন এ শর্তে যে, দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে নজরুলের গুরুত্ব নিয়ে একটি বিশ পৃষ্ঠার ভূমিকা প্রবন্ধ লিখে দিতে হবে। Parabaas@parabaas.com বাংলা সাহিত্য নিয়ে হলেও পরিচালিত হয় আমেরিকা থেকে। Contents দেখলেই বোঝা যায়, লেখা নির্বাচনে তাদের গন্ডি কী। Sulekha.com-তে লেখার ভিড় এত বেশি!



www.pathagar.com

তবে Live2read মোটামুটি উপযুক্ত লেখা পেলেই hosting করে। আমাদের দরকার এমন কিছু web নির্মাতা, যারা বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক ইংরেজি লেখা পেলেই (উপযুক্ততা সাপেক্ষে) তা host করবেন। আগ্রহী পাঠক ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, আমাদের সাহিত্য-আলোচকদের ওপর ইন্টারনেট জ্ঞানরাজ্যের প্রভাব কত কম! কোন আলোচনা বা গবেষণা প্রবন্ধের সূত্র হিসেবে একটি Online address ব্যবহৃত হয়েছে এমন উদাহরণ খুব বেশি একটা পাওয়া যাবে না।

আর এভাবেই সামগ্রিক অবস্থা হলো রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিছু থাকলেও নজরুল নিয়ে তারও কম আর শামসুর রাহমান বা এরকম প্রধান কয়েকজনের জন্য রয়েছে কয়েকটি করে পৃষ্ঠা। হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয়—তাঁর পাঠকদের অধিকাংশই তরুণ-তরুণী, যাদের ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ। সে কারণেই হুমায়ূন আহমেদ নিয়ে বড় প্রত্যাশা করে Search দিতেই সামান্য পরেই বোঝা গেল হুমায়ূন আহমেদ নিয়ে web page গুলোর প্রায় প্রতিটিই ১/২ পৃষ্ঠা পরই Under Construction জাতীয় লেখায় সমাপ্ত। আমাদের সাহিত্যের অবস্থা Online-এ এমন দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ায় ভিন্নদেশিরা আমাদের সাহিত্য নিয়ে পড়ার সুযোগ না পেলেও আমাদের কিন্তু ওদের লেখা পড়তেই হবে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে যে পড়া শুরু, তা থেকে তো সরে আসার কোন উপায় নেই। শুধুই মনে হয়, না পড়লেই তো পিছিয়ে যাবো।

তবে দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলো ইন্টারনেটের কারণে আমাদের উপকারের সুযোগ পেয়েছে। ওরা ইন্টারনেট থেকে কিনে বা না কিনে যেগুলো মূল ইংরেজি বা অনুবাদে ছাপে, তা দেশের সাধারণ পাঠক দৈনিক পত্রিকার মূল্যের মধ্যে পেয়ে যান। ১৯০১ সালে সালি প্রুদম সাহিত্যে প্রথম নোবেল প্রাপ্তির পর তাঁর বই ভারতবর্ষের পাঠককে পেতে কত না অপেক্ষা করতে হয়েছে আর ২০০১-এ নাইপলের বই না শুধু, নাইপলের নিজের ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বহু রচনা-আলোচনা পুরস্কার ঘোষণার দিনই একজন ব্রাউজ করে পেয়ে গেছেন। একজন সম্বিষ্ট পাঠকের এ এক বিরাট প্রাপ্তি।

ইতিহাস তো বলে ভাষায় আধিপত্য সর্বকালেই ক্ষমতার আধিপত্যের সঙ্গেই যুক্ত। ২ হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা হিসেবে গ্রিকের আধিপত্যের কারণ তো প্লেটো-এরিস্টটলের জ্ঞানচর্চা নয়; বরং তা ছিল আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী কর্তৃক দখল। সারা ইউরোপ জুড়ে ল্যাটিন ভাষার বিস্তার অথবা উত্তর ব্যাপকতার পেছনের কারণটিও কিন্তু একই সূত্রে গাঁথা। ব্রিটিশ ইংরেজির রমরমাও তো দখলদারির ভেতর দিয়েই আর আমেরিকান ইংরেজির দাপট তো মাত্র এক দশকের। নতুন শতকের কত দীর্ঘ সময় ধরে সে ভাষা সন্ত্রাসের মাধ্যম হবে, তা বোধ হয় অনুমানের সময় এখনও আসে নি।

ইংরেজি ভাষার বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত ডেভিড ক্রিস্টাল মজা করে একটা কথা বলেছিলেন, 'যদি বিল গেটস্ চায়নিজভাষী হতো'। চোখ বুঁজে একবার এমনটিও ভাবতে ইচ্ছে করে যদি বিল গেটস বাঙালি হতো! না ইংরেজিই বিল গেটসের ভাষা, আমাদেরকেও সে ভাষার



www.pathagar.com

অধীন হতে হবে— না হলেও কিছুতেই বিশ্বায়নের এ যুগে নিজের সাহিত্য উপস্থাপন করা যাচ্ছে না। যদিও কথা একটা থাকছেই, সেভাবেও যদি করা হয় তা হলে হবে অনুদিত; আমার ভাষার মৌলিক জিনিসটি নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল কাজে অনুবাদ ব্যাঘাত না ঘটালেও শিল্প-সাহিত্যে তো মূল ভাষাটিই চাই।

আর মৌলিক জিনিসটি ওয়েবের পাতায় দেখা যাবে তখনই, যখন ওয়েবের একটি ভাষা হবে বাংলা এবং বিশ্বগ্রামের বাসিন্দারা এমন একটি কারিগরি উচ্চমানে পৌঁছবে যেখানে ওয়েবের যে কোন ভাষার পাঠই ব্যবহারকারীদের নিজের ভাষায় অনুবাদিত আকারে উপস্থাপিত হবে মুহূর্তেই। হয়ত আমার ভাষার সাহিত্যের সে পর্যায়টি আসতে বিশ্বায়নের প্রথম শহীদ কার্লো গিউলিয়ানির মতো বহু বহু শহীদ রাস্তায় লুটোবে, যাদের ভাষা বাংলা।

সংযোজন :

অনলাইনে বাংলা তথা বাংলাদেশের সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্পর্কিত উপরের প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল ২০০২-এর মাঝামাঝি কোন সময়ে; যা দৈনিক *সংবাদ*-এর সাহিত্য সাময়িকীতে একই বছরের ৭ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। অনলাইনে বাংলাদেশের সাহিত্যের দারিদ্র্য বর্তমান লেখককে, ক্রম ক্রমে ক্রোধী করে তোলে তা দূরীকরণে যার ফসল www. bangladeshinovels.com—বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ে সুবিশাল এই ওয়েবসাইটটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ২ অক্টোবর ২০০৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা ছিলেন প্রধান অতিথি। আলোচক-অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ফকরুল আলম, বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথ্যবিজ্ঞানী মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক প্রাবন্ধিক ড. মাসুদুজ্জামান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন রাবেয়া খাতুন, আবুবকর সিদ্দিক, রিজিয়া রহমান, মুহম্মদ নূরুল হুদা, ইমদাদুল হক মিলন, মঈনুল আহসান সাবের প্রমুখ। এবার আসছি www.bangladeshinovels.com প্রসঙ্গে। বিষয় প্রশ্নেই এ অংশটি উত্তম পুরুষে রচিত হচ্ছে।]

১৯৯৮ সালের দিক থেকে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য নিয়ে আমি ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করি। একই সাথে ইংরেজি দৈনিকের ম্যাগাজিনগুলোতে সেগুলো প্রকাশিত হতে থাকে। এক সময় এমন ইচ্ছে জাগতে শুরু করে যে সে লেখাগুলোকে online-এ দেয়া যায় কিনা। শুরু হয় ওয়েবসাইট অনুসন্ধান। ক্রমে ক্রমে দু'চারটি সাহিত্য বিষয়ক সাইটে কিছু লেখা host করা গেলেও তার সংখ্যা ক্ষীণ এবং হতাশাব্যঞ্জক। এরই মাঝখানে ২০০৩ সালের শুরু দিকে ইচ্ছে জাগতে থাকে একটি ওয়েবসাইট করার যেখানে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য বিষয়ক আমার সকল ইংরেজি



www.pathagar.com

লেখাকে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। নিজের সব লেখাকে কীভাবে সাজানো সম্ভব তা নিয়েও চলতে থাকে পরিকল্পনা। শেষ পর্যন্ত লোক মেলে ওয়েব ডিজাইনেরও। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ধরে সাইট নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। অবশেষে দেশের বিশিষ্ট সব বুদ্ধিজীবী-লেখকদের উপস্থিতিতে www.bangladeshinovels.com এর উদ্বোধন হয়। ৩ ও ৪ অক্টোবর, ২০০৩ দেশের অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকা এ সংক্রান্ত দীর্ঘ সংবাদ ও ছবি প্রকাশ করে।

www.bangladeshinovels.com সাইটটির মূল প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের গত একশ বছরের প্রধান ঔপন্যাসিকদের নিয়ে বিস্তৃত ও অনুসন্ধানী আলোচনা। বাংলাদেশের উপন্যাসের সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে Introduction অংশে। এর পরেই রয়েছে Articles অংশটি। এতে দেশের বরেণ্য মোট বত্রিশ জন ঔপন্যাসিকের উপরে আলাদা আলাদা বত্রিশটি লিংক দেয়া হয়েছে। আলোচিত ঔপন্যাসিকরা হলেন : সত্যেন সেন, আবুজাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, রশীদ করীম, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু ইসহাক, শহীদুল্লা কায়সার, সৈয়দ শামসুল হক, রাবেয়া খাতুন, দিলারা হাসেম, শওকত আলী, আল মাহমুদ, আবুবকর সিদ্দিক, হাসনাত আবদুল হাই, রিজিয়া রহমান, রাহাত খান, মাহমুদুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আহমদ ছফা, হরিপদ দত্ত, হুমায়ুন আজাদ, সেলিনা হোসেন, হুমায়ূন আহমেদ, মুহাম্মদ নূরুল হুদা, মঞ্জু সরকার, শহীদুল জহীর, ইমদাদুল হক মিলন, মঈনুল আহসান সাবের, আকিমুন রহমান, নাসরীন জাহান, সালাম সালেহ উদ্‌দীন প্রমুখ। প্রতিটি পেইজে সংযুক্ত হয়েছে লেখকের ছবি।

এছাড়া Short Bios এবং Others শিরোনামের দুটি লিংক করা হয়েছে। Short Bios অংশে রয়েছে দেশের সকল ঔপন্যাসিকদের জন্মসাল (মৃতদের মৃত্যুসালসহ), গ্রন্থ তালিকা এবং প্রাপ্ত পুরস্কার। ইংরেজি বর্ণক্রম অনুযায়ী লেখক নামগুলোকে সাজানো হয়েছে। Others অংশে রয়েছে সেলিনা হোসেনের *টানাপোড়েন* উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা এবং বাংলাদেশের ইংরেজি ঔপন্যাসিক বিজন শর্মার *Journey to the East* (কানাডা থেকে প্রকাশিত) নিয়ে আলোচনা। শুরুর কালে সাইটটিতে আরও যে দুটি লিংক ছিল সেগুলো হয় 'About the Author' এবং 'Contact Me'।

পরবর্তীতে www.bangladeshinovels.com-এর ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। ২০০৪ সালের বইমেলায় প্রকাশিত সকল উপন্যাসের লেখকসহ নাম প্রকাশ করা হয়েছে। আর Excerpts অংশে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের কিছু উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের অংশ বিশেষ। যে সকল উপন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো : সত্যেন সেনের *আলবেরুনী*, শওকত ওসমানের *রাজা উপাখ্যান*, আবু রুশদের *স্থগিত দ্বীপ*, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু*, জহির রায়হানের *আরেক ফালগুন*, শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক*, আনোয়ার পাশার *রাইফেল রোটি আওরোত*, সৈয়দ শামসুল হকের



www.pathagar.com

*খেলারাম খেলে যা*, রাজিয়া খানের *দ্রৌপদী*, হুমায়ুন আজাদের *ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল*, সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড*, *টানাপোড়েন*, ও *ভালবাসা প্রীতিলতা*, হুমায়ূন আহমেদের *নন্দিত নরকে*, *তোমাদের জন্য ভালবাসা*, মুহম্মদ জাফর ইকবালের *আমার বন্ধু রাশেদ* এবং ইমদাদুল হক মিলনের *পরাধীনতা*।

ইংরেজি দৈনিক *The Daily Star*-এ বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে নির্মিত এই ওয়েব সাইট নিয়ে রচিত এক প্রবন্ধে Harun ur Rahsid লেখেন : Speakers unanimoisly opined that such endeavoures like Subrata's would help Bangladeshi literature reach the foreign readers and researchers (October 4, 2003)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন : 'প্রযুক্তি ও সাহিত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। প্রযুক্তিকে সাহিত্যের প্রচারে কাজে লাগিয়ে এই দ্বন্দ্ব দূর করা সম্ভব। সুব্রত কুমার দাস প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেছেন সাহিত্যের প্রয়োজনে।' (*ভোরের কাগজ*, ৪ অক্টোবর, ২০০৩)। ইংরেজি দৈনিক *The Bangladesh Observer*-এ দীর্ঘ এক আলোচনায় Shah Mostafa Khaled বলেন : 'Bangladeshinovels.com has opened the window of opportunity to the global readers and researchers benefiting them with the long last opportunity to study Bangladeshi literature' (*Observer Magazine*, November 14, 2003)। *The Daily Star* পত্রিকাটি ২০০৪-এর ১ জানুয়ারি প্রকাশিত নববর্ষ সংখ্যায় 'Publications that made the year'-এ ২০০৩-এর প্রধান তিনটি প্রকাশনার মধ্যে এই ওয়েব সাইটটির নাম অন্তর্ভুক্ত করে।

অনলাইনে কাজ করার সবচেয়ে বড় সুবিধা এটিকে প্রয়োজনমত খুব স্বল্পতম সময়েও পরিবর্ধন-পরিবর্তন করা যায়। আর তাই ও পুরো সাইটটির সকল তথ্যকে ইতিমধ্যে reference ও cross-reference হিসেবে linkকরা সম্ভব হয়েছে; হয়েছে প্রতি প্রবন্ধের শেষে সেই লেখক সম্পর্কিত অন্য সাইটের লিংক দেওয়াও। আর সেভাবে বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে নির্মিত এই ওয়েব সাইটটি বিদেশিদের কাছে আমাদের সাহিত্যের প্রধানতম উৎস হিসেবে পরিণত হয়েছে। ফলেই বাংলা ও বাংলাদেশের বা দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ এশিয় সাহিত্য বিষয়ক অধিকাংশ ওয়েব সাইটে www.bangladeshinovels.com-কে লিংক করা হয়েছে। Columbia University-র South Asian Studies-এর web page-এ বা যুক্তরাজ্য থেকে পরিচালিত SALIDAA (South Asian Diaspora Literature and Arts Archive)-এ এই ওয়েব সাইটটি লিংক পাওয়ায় বাংলাদেশের একজন সাহিত্য কর্মী হিসেবে আমি গর্ববোধ করি।

Bangladeshinovels.com অনলাইনে বাংলা বা বাংলাদেশের সাহিত্যের দারিদ্র্য সামান্য হলেও দূর করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ISBN ৭৮৪৮৫৫৭৪০-৭
9 789848 557402

www.pathagar.com